সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—সং ৮৭

কুরল্‌

প্রাচীন তামিল নীতি-গ্রন্থ

তিরুবল্লুবর্‌-রচিত প্রাচীন তামিল কাব্যের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এম্‌-এ, ডী-লিট্‌, এফ্‌-আর্‌-এ-এস্‌-বী

কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সংবলিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির, কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৪

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

—মূল্য—

পরিষদের সদস্য পক্ষে—১৸৹

সাধারণের পক্ষে—২॥৹

২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
গোবর্ধন প্রেস
হইতে শ্রীরসিকলাল পান কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় যতগুলি সাহিত্য আছে, সেগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের। তাহার পরেই, মৌলিকত্বে, মনোহারিত্বে, প্রসারে, বৈচিত্র্যে এবং বৈশিষ্ট্যে তামিল সাহিত্যের স্থান।

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল জুড়িয়া সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতের পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয়েই উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির সাহিত্য বহুশঃ সংস্কৃত সাহিত্যেরই আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের আধুনিক ভাষাসাহিত্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত নূতন সাহিত্যের উদ্ভব সত্ত্বেও, সংস্কৃত-ভাষায় সাহিত্য-রচনা এখনও লুপ্ত হয় নাই। ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, প্রাচীনতম কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে গ্রথিত, ও ইহার অন্যতম প্রতীক-স্বরূপ

বিদ্যমান—ইঁহা ভারতের প্রধান মৌলিক সাহিত্য। সংস্কৃত, গ্রীক ও চীনা—জগতে এই তিনটী মৌলিক সাহিত্য বিদ্যমান; অন্যগুলি প্রায়শঃ ইহাদের অনুকারী।

উত্তর-ভারতে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে সংস্কৃত সাহিত্য পুষ্টি ও প্রসার লাভ করিবার সহস্র বৎসর পরে, দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর তামিল জাতির মধ্যে স্বাধীনভাবে সাহিত্য-চেষ্টা দেখা যায়। আদি-যুগের তামিল সাহিত্যে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবর্ধমান প্রভাব প্রথম হইতেই তামিল সাহিত্যের উপরে আসিয়া পড়ায়, তামিল সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী কালে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। প্রথম যুগের তামিল-সাহিত্যে যেটুকু সংস্কৃত বা উত্তর-ভারতের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে, সেটুকুর দ্বারা ইহার মৌলিকত্ব নষ্ট হইতে পারে নাই; প্রথম যুগের তামিল সাহিত্য সেই প্রভাবটুকুকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, নিজ বৈশিষ্ট্যকেই বিচিত্রতামণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিশুদ্ধ তামিল সংস্কৃতির প্রকাশ-স্বরূপ আদি যুগের তামিল সাহিত্য, ভারতবর্ষের সাহিত্য-জগতে অন্যতর মৌলিক বস্তু।

কবি তিরুবল্লুবর্ (তিরু-ৱঠ্ঠুৱর্)-কর্তৃক রচিত 'কুরল্ (কুৱঠ্)' বা 'মুপ্পাল্', এই প্রথম যুগের তামিল-সাহিত্যের একটি মুখ্য গ্রন্থ। ইহা তামিল ভাষার

অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক, এবং উত্তর-ভারতের সংস্কৃতাদি আর্য-ভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতির সহিত দক্ষিণ-ভারতের বিশুদ্ধ দ্রাবিড়-তামিল সংস্কৃতির প্রথম সার্থক সংমিশ্রণের ফল-স্বরূপ। ইহাতে ভাষায়, ছন্দে, বর্ণন-ভঙ্গীতে এবং কোনও কোনও বিষয়ের প্রকটনে দ্রাবিড়-বৈশিষ্ট্য সুন্দর-ভাবে রক্ষিত আছে। লোকপ্রিয়তায় ইহা তামিল-ভাষার অদ্বিতীয় পুস্তক।

প্রস্তুত গ্রন্থ এই প্রাচীন, উপাদেয় এবং জনপ্রিয় তামিল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। মূল তামিল ভাষা হইতে অনূদিত না হইলেও, ইহার দ্বারা বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। ভারতের একটি গরিষ্ঠ ভাষার অমূল্য রত্ন-স্বরূপ এই পুস্তকের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়, বঙ্গ-ভাষী জনগণের মানসিক সংস্কৃতির প্রসার-কল্পে বিশেষ শ্রম স্বীকার পূর্বক, বাঙ্গালী পাঠকবর্গের সমক্ষে ইহা উপস্থাপিত করিয়াছেন—বঙ্গবাণীর চরণে এই অভিনব সুরভি ও বর্ণোজ্জ্বল পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া বঙ্গভাষা-সরস্বতীর শোভা বর্ধন করিয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের প্রসার-বিষয়ে যত্নবান্ প্রত্যেক বাঙ্গালী এইজন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিবেন।

কুরল্-গ্রন্থ এবং ইহার রচয়িতা, তথা প্রথম যুগের

তামিল-সাহিত্যের সময় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। এ সম্বন্ধে নলিনীবাবু তাঁহার ভূমিকায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত ভী. আর্. রামচন্দ্র দীক্ষিতর্ রচিত Studies in Tamil Literature and History (Luzac & Co., London, 1930), স্বর্গীয় পী. টী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর্ রচিত History of the Tamils (C. Coomaraswamy Naidu & Sons, Madras, 1929), শ্রীযুক্ত এম্. এস্. পূর্ণলিঙ্গম্ পিল্লৈ প্রণীত A Primer of Tamil Literature (Ananda Press, Madras, 1904), শ্রীযুক্ত এম্. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর্ প্রণীত Tamil Studies (Guardian Press, Madras, 1914) প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। এখানে সে সমস্ত আলোচনার পুনরবতারণা না করিয়া, মোটামুটি ভাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে কোনও সময়ে কুরল্-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিরু-বল্লুবর্-এর জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে পারে; কিন্তু প্রচলিত কুরল্-গ্রন্থ খুব সম্ভব অত প্রাচীন কালের বহি নহে—উহার ভাষা পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে।

ইহা অবিসংবাদিত যে তিরুবল্লুবর্ ও তাঁহার সমসাময়িক কতকগুলি কবির গ্রন্থে তামিল ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন

রক্ষিত আছে। এই সকল কবিকে তামিলের 'সঙ্গম্' যুগের 'কবি বলা হয়। সংস্কৃতের 'সংঘ' শব্দ, প্রাচীন তামিলে 'চঙ্‌কম্' রূপ ধারণ করে; এখন আধুনিক তামিলে প্রাচীন তামিলের বানান 'চঙ্‌কম্' বিদ্যমান, কিন্তু শব্দটীর উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে 'শঙ্গম্' বা 'সঙ্গম্'। তামিল ভাষায় এই 'শঙ্গম্' বা 'চঙ্‌কম্' অর্থাৎ 'সংঘ' শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, 'পণ্ডিত ও কবিদের পরিষৎ'। তামিলদের মধ্যে প্রচলিত পুরাণ-কথা অনুসারে, বহু প্রাচীন যুগে তামিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনটী 'সংঘ' বা পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। এই সব সংঘ সম্বন্ধে পুরাণ-সুলভ বহু অত্যুক্তিময় কাহিনী লিখিত আছে। স্বয়ং মহাদেব, কার্তিকেয় এবং অগস্ত্য মুনি—ইঁহারা প্রথম সংঘের কবিদের মধ্যে অন্যতম তিনজন ছিলেন। প্রথম দুইটী সংঘ যথাক্রমে প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর এবং তিন হাজার সাত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। শেষ সংঘটীরই ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয়, এবং এই সংঘ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দিকে বিদ্যমান ছিল। তামিল সাহিত্যের প্রাচীনতম কবিরা এই তৃতীয় সংঘেরই সদস্য ছিলেন, বা এই যুগের লোক ছিলেন। ইঁহাদের সমসাময়িক রাজাদের ঐতিহাসিকত্ব, সুতরাং ইঁহাদেরও ঐতিহাসিকত্ব, একরূপ প্রমাণিত। সুতরাং প্রথম দুই সংঘের কথা বাদ দিলে, মোটামুটি খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম

শতক হইতে তামিল সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

দুই হাজার বৎসর ধরিয়া তামিল সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। দুই হাজার বৎসরে উত্তর-ভারতের আর্য-ভাষার যেমন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে—প্রাচীন প্রাকৃত যেমন আধুনিক বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে,—তামিল ভাষারও তেমনি বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিশেষভাবে শিক্ষা না করিয়া যেমন বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রীয় বা পাঞ্জাবীর পক্ষে তাহার মাতৃভাষার প্রাচীন রূপ প্রাকৃতের অর্থগ্রহণ করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য, তেমনি আধুনিক তামিল-ভাষীর পক্ষে সংঘ-যুগের সুপ্রাচীন তামিল কাব্য পাঠ করিয়া বুঝা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। এখনকার প্রচলিত তামিল, প্রাচীন তামিল ভাষা হইতে একেবারে পৃথক্ একটী ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন তামিলকে তামিলভাষায় 'চেন্-তমির্ষ্' (আধুনিক উচ্চারণে 'শেন্দমির্ষ্') বলে, আধুনিক তমিলকে 'কোটুম্-তমির্ষ্' (বা 'কোডুন্দমির্ষ্') বলে। 'কুরল্' এই প্রাচীন তামিলে—'চেন্-তমির্ষ্'-এ —লিখিত।

তামিল ভাষার ইতিহাসকে মোটামুটি এই তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যায়—

[১] প্রাচীন-তামিল বা 'চেন্-তমির্ষ্'—সংঘ-যুগের

কবিদের রচনায় প্রাপ্ত ; ১ম হইতে ৫ম খ্রীষ্টীয় শতক পর্যন্ত। এই যুগের তামিলের ব্যাকরণ 'তোল্-কাপ্পিয়ম্'।

[২] মধ্য-তামিল—৫ম হইতে ১৪শ শতকের শেষ পর্যন্ত। 'বীরচোযিয়ম্' (একাদশ শতক) এবং 'নন্নূল্' (ত্রয়োদশ শতক) এই যুগের তামিলের ব্যাকরণ। মধ্য-তামিলকে আবার দুই যুগাংশে বিভক্ত করা যায়—(ক) প্রথম মধ্য-তামিল, ৫ম হইতে ১০ম শতক পর্যন্ত, এবং (খ) দ্বিতীয় মধ্য-তামিল, ১১শ হইতে ১৪শ শতক পর্যন্ত। (কেরলের মালয়লম্ ভাষা, মধ্য-তামিলের বিকারে পঞ্চদশ শতকে নিজ বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়, এবং তদনন্তর স্বতন্ত্র সাহিত্যিক পথ অনুসরণ করে।)

[৩] নব্য-তামিল—১৫শ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত। নব্য-তামিলে ১৭০০—১৯০০ এই দুই শত বৎসর ধরিয়া ইহার দ্বিতীয় যুগাংশ।

প্রাচীন-তামিল যুগে তামিল বর্ণমালার উদ্ভব হয়, এবং তামিল বর্ণ-বিন্যাস-রীতি স্থিরীকৃত হইয়া যায়। এই বানানের রীতি এখনও পর্যন্ত তামিলে চলিতেছে। তখনকার যুগের তামিল উচ্চারণ, তামিল শব্দের প্রচলিত বানানে রক্ষিত আছে ; এখন উচ্চারণ বদলাইয়াছে, কিন্তু বানান আছে সেই ১৫০০ বা ১৮০০ বৎসর পূর্বেকার তামিল উচ্চারণকে অবলম্বন করিয়া। সংস্কৃত বা

তুলনায়, ধ্বনি-বিষয়ে প্রাচীন তামিল নিতান্ত অসম্পূর্ণ বা দরিদ্র ছিল। তাই প্রাচীন তামিলের জন্য গঠিত তামিল বর্ণমালাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। নিম্নে এই বর্ণমালার বাঙ্গালা রূপ দেওয়া যাইতেছে—[১] স্বরবর্ণ—অ, আ ; ই, ঈ ; হ্রস্ব এ, দীর্ঘ এে ; হ্রস্ব ও, দীর্ঘ ওো ; ঐ, ঔ।

[২] ব্যঞ্জনবর্ণ—ক, ঙ ; চ, ঞ ; ট, ণ ; ত, ন ; প, ম ; য়, র, ল, ৱ ; র্ষ ; ঌ, ৼ, ন ; ঃ।

হ্রস্ব এ এবং ও বাঙ্গলা অক্ষরে কেবল এ ও দ্বারা লিখিত হইতে পারে, এবং দীর্ঘ এ ও-কে এই দুই বর্ণ দুইবার লিখিয়া বাঙ্গলায় প্রকাশিত করা যাইতে পারে; যেমন, হ্রস্বধ্বনি—পেরিয়, পোয়্ ; দীর্ঘধ্বনি—তেেচম্ (=দেশ), আরোোক্কিয়ম্ (=আরোগ্য)।

প্রাচীন ও মধ্য তামিলে পঞ্চ বর্গের স্পর্শ ধ্বনি কয়টীর মধ্যে মাত্র প্রথমটী ছিল—অঘোষ অল্পপ্রাণ ক, চ, ট, ত, প মাত্র; প্রাচীন তামিলেরও পূর্বাবস্থায়, বর্গের তৃতীয় ধ্বনি-গুলিও ছিল (ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ গ, জ, ড, দ, ব) ; কিন্তু অনুমান হয়, প্রাচীন-তামিল যুগে—খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যে—ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলি অঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আদি দ্রাবিড় ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনি (খ, ছ, ঠ, থ, ফ ; ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) ছিল কিনা জানা যায় না; থাকিলেও, সেগুলি প্রাচীন-

তামিলের পূর্বাবস্থাতেই অল্পপ্রাণ হইয়া যায়, এবং পরে এই অল্পপ্রাণ ঘোষ হইতে অঘোষ পর্য্যায়ে নীত হয়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—আদি-দ্রাবিড় রূপ ***দ্রমির্ষ** (র্ষ ধ্বনি সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে—পৃঃ ৮৵৹); উহা হইতে সংস্কৃত **দ্রমিড, দ্রমিল, দ্রবিড**; আদি-দ্রাবিড ***দ্রমির্ষ** হইতে, প্রাচীন তামিলের প্রাগ্-অবস্থায় ***দমির্ষ**, এই ***দমির্ষ** হইতে সিংহলী ও পালি **দমিল**, গ্রীক *Damir- (*Damirike = ***দমির্ষকম্**, অর্থাৎ 'তামিল-দেশ'); এবং ***দমির্ষ** পরিবর্তিত হইয়া প্রাচীন-তামিলে **তমির্ষ**-রূপ ধারণ করে, Tamizh বা Tamil, যাহা আমরা বাঙ্গালায় **তামিল** রূপে লিখিয়া থাকি। —আদি-দ্রাবিড় ***ঘুত্র**, ***ঘোত্র**, ইহা হইতে সংস্কৃত **ঘোট, ঘোটক**, প্রাকৃত **ঘোড, ঘোডঅ**, আধুনিক আর্যভাষাগুলিতে **ঘোড়, ঘোড়া**; ***ঘুত্র**- হইতে ***গুত্র, *গুতির**, পরে প্রাচীন-তামিলে **কুতিরৈ**, কানাড়ী ভাষায় **কুদুরে**, তেলুগুতে **গুর্র**। এইরূপে আদি-দ্রাবিড়ের ঘোষবৎ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি, প্রাচীন-তামিলে সর্বত্র অঘোষ অল্পপ্রাণে পর্যবসিত হয়। আর্য-ভাষা

---

* সংস্কৃত এবং প্রাচীন-তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার তুলনা-মূলক ধ্বনি-বিচার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এস্. অনবরত-বিনায়কম্ পিল্লৈ রচিত উপাদেয় পুস্তক The Sanskrit Element in the Vocabularies of the Dravidian Languages (University of Madras Dravidic Studies, III, 1919) দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে শব্দ প্রাচীন তামিলে আসিলে, সেইসব শব্দের অন্তর্গত ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিরও সেই অবস্থা ঘটিত ; যথা—সংস্কৃত **মুখ, উদ্বেগ, গণেশ, রাজা, কথা, নাথ, গদা, রাধা, দৃষ্টান্ত, স্বয়ম্ভু** =প্রাচীন-তামিল **মুকম্, উত্তুৱেকম্, কণেচন্, অরচন্, কতৈ, নাতন্, কতৈ, ইরাতৈ, তিরুট্-টান্তম্, চয়ম্পু,** ইত্যাদি।

সংস্কৃতের **শ, ষ, স**-এর অনুরূপ ধ্বনি প্রাচীন-তামিলে ছিল না,—এই উষ্ম ধ্বনিগুলি **চ, ত, য়, ট** প্রভৃতির দ্বারা প্রাচীন-তামিলে প্রদর্শিত হইত। প্রাচীন-তামিলে **হ**-এর ধ্বনি ছিল না। পরবর্তী কালে, নব্য-তামিল যুগে, তামিল ভাষায় ঘোষবৎ **গ, জ, ড, দ, ব**-এর ধ্বনি, শব্দের মধ্যে (আদিতে নহে) একক অবস্থিত **ক, চ, ট, ত, প**-এর বিকারে উদ্ভূত হয় ; এবং উপস্থিত কালের কথিত তামিলে আবার এই নব-সৃষ্ট, শব্দাভ্যন্তরস্থিত **গ, দ, ব**-এর spirant বা উষ্ম উচ্চারণও আসিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ **গ** স্থানে আরবী-ফারসীর ঘ.য়্ন্ অক্ষরের ধ্বনি বা ক্বচিৎ **হ**-এর ধ্বনি ; **দ** স্থানে ইংরেজী this, then, that-এর th-এর ধ্বনি ; এবং **ব** স্থানে ওষ্ঠ্য v-এর ধ্বনি)। এই সব কারণে, প্রাচীন-তামিল অনুযায়ী তামিল বানানে, আর আধুনিক-তামিল উচ্চারণে, এক বিরাট্ অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তামিলে তাই **গণপতি**-কে লেখে **কণপতি,** এখন উচ্চারণ

করে **ক-ণ-ব-দি** বা ka-*n*a-va-thi (this, that-এর উষ্ম দ)। ইংরেজী শিক্ষিত তামিলগণ সেই জন্য অনেক সময়ে th-দ্বারা **ত** ও উষ্ম **দ** এই উভয়বিধ ধ্বনি প্রকাশ করেন ঃ Thamotharan = তামোদরন্ = দামোদর। আধুনিক তামিলে **চ**-এর উচ্চারণ **শ** বা **স**-রূপেও শোনা যায়। সংঘ-যুগের প্রাচীন-তামিল নাম বা শব্দ, রোমান বা ভারতের অন্য প্রদেশের লিপিতে লিখিতে গেলে, আজকাল পণ্ডিতগণ মূল তামিল বর্ণবিন্যাসের অক্ষরান্তরীকরণ মাত্র করিতে অনুমোদন করেন—আধুনিক উচ্চারণ ধরিয়া লিখিবার প্রয়াস, প্রাচীন-তামিলের পক্ষে ঠিক হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নলিনীবাবুর ভূমিকাতে প্রদত্ত কতকগুলি নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ **ময়িলাপুর্** (মলয়াপুর নহে, পৃঃ ২), **এলেলে-চিঙ্কন্** (পৃঃ ৩), **উক্কিরপ্-পেরু-বযু্তি** (পৃঃ ৩, ৪, ৪২), **চিলপ্পতিকারম্, মণিমেকলৈ** (পৃঃ ৪), **উরৈয়ূর্, করিরিপ্-পটম্, কলিৎ-তোকৈ, ইন্ন-নর্পতু, নেটু-নল্-বাটৈ, কুরিঞ্চিপ্-পাট্টু, তিরু-মুরুকার্-রুপ্-পটৈ** (পৃঃ ৪১), ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাচীন-তামিলের উচ্চারণ অনুসারে গঠিত তামিল বানানকে, আধুনিক-তামিলের রকমারি উচ্চারণ ধরিয়া, রোমান লিপিতে এখন তামিল লেখকেরাই বিভিন্ন রূপে লিখেন; সেইজন্য তামিল ভাষায় প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাস-রীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তামিল ধ্বনিতত্ত্বের খোঁজ না লইয়া, ইংরেজী

হইতে বাঙ্গালায় তামিল শব্দের বর্ণান্তরীকরণ করিতে গেলে, অল্প-বিস্তর বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী। *

সংস্কৃত প্রমুখ আর্য-ভাষার কতকগুলি ধ্বনি যেমন তামিলে নাই, তামিলের তেমনি কতকগুলি স্বকীয় বিশিষ্ট ধ্বনি আছে। বাঙ্গলায় ইহাদের উপযোগী বর্ণ না থাকায়, আমি দেবনাগরী হইতে তিনটী বর্ণ ও একটী বাঙ্গালা সংযুক্ত বর্ণ লইয়া ব্যবহার করিলাম। মূর্ধন্য ळ (বৈদিক ळ—বাঙ্গলায় ळ অক্ষর না মিলিলে ল. রূপে লেখা চলে) প্রাচীন সংস্কৃতে ছিল, এখনও পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী ও উড়িয়াতে মিলে ; জীভ মুখের ভিতরে উল্‌টাইয়া উচ্চারণ করিতে হয়। ऱ ও ऩ—সাধারণ র ও ন-এর উচ্চারণের সঙ্গে এই দুই দ্রাবিড় ধ্বনির যে পার্থক্য আছে, আমরা তাহা সহজে ধরিতে পারি না ; এই দুই ऱ, ऩ দন্তমূলীয় ধ্বনি ; সাধারণ র ন যে স্থানে উচ্চারিত হয়, তাহার ঊর্ধ্বে এই দুইটী উচ্চারিত হয়। এই

*৪৬-এর পৃষ্ঠায় নলিনীবাবু যে তামিল শ্লোকটী দিয়াছেন, সেটী কুরল্‌-এর সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদের দশম শ্লোক নহে, সেটী হইতেছে ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদের দশম শ্লোক (অনুবাদ দ্রষ্টব্য, ৭৬ পৃষ্ঠা)। G. U. Pope-এর সংস্করণের মূলের পাঠ অনুসরণ করিয়া লিখিলে, উহার যথাযথ বাঙ্গালা বর্ণান্তরীকরণ এইরূপ হইবে—

কামম্‌ রেকুঠি ময়ক্‌কমিরৈমূऩ্‌হি
নামঙ্‌ কেটক্‌কেটু নোয়্‌।

দুইটীকে (অর্থাৎ ৼ ন-কে) তালু-জাত র় ন় বলাও চলে। ৼ-এর দ্বিত্ব হইলে, ৼ্ৼ আধুনিক তামিলে দন্তমূলীয় ত্ত (ৎ ত)-য়ে, অর্থাৎ আমাদের মূর্ধন্য ট্ট-ও নহে, দন্ত্য ত্ত-ও নহে, ইংরেজীর tt-র ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়; ন্ৼ্ ইংরেজীর ndr-তে রূপান্তরিত হয়।

র্ষ তামিল ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি। বাঙ্গালায় অক্ষরের অভাবে ইহার জন্য র্ষ এই সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করিলাম; এই ভূমিকায় তামিল শব্দে র্ষ-র উচ্চারণ র্ + ষ হইবে না, —র্ ও ষ্ মিলিত হইয়া মাত্র একটী ধ্বনির (ঘোষবৎ মূর্ধন্য ষ-এর) প্রকাশক হইবে; জীভ উল্‌টাইয়া ঘোষবৎ sh, অর্থাৎ zh উচ্চারণ করিতে হইবে। তামিলে র্ষ = সংযুক্ত র্ + ষ ব্যঞ্জন ধ্বনি নাই। দন্ত্য স বা s-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে z; তালব্য শ-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে ফরাসীর j, ইংরেজী pleasure, leisure শব্দের s-এর ধ্বনি; তেমনি মূর্ধন্য ষ-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে এই তামিল ধ্বনি; ইহা কতকটা r (খাঁটী ইংরেজের spirant বা উষ্ম r-এর মত) এবং zh মিশ্রিত ধ্বনির মত লাগে। ইহাই হইতেছে সংস্কৃত মূর্ধন্য ষ-এর ঘোষবৎ রূপ, এবং তামিলের বিশিষ্ট ধ্বনি। ইংরেজীতে l বা l̤, ও ক্বচিৎ বা zh রূপে ইহা লিখিত হয়।

প্রাচীন তামিলে একপ্রকার বিসর্গ ছিল, ইহার উচ্চারণ ছিল খ় (ফারসীর খে় বর্ণের ধ্বনি)।

তামিল অক্ষরের দ্বারা শুদ্ধভাবে সংস্কৃত লেখা সম্ভব নহে ; সেই হেতু তামিল দেশে সংস্কৃত লিখনের জন্য আর একটী সম্পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা প্রচলিত আছে—ইহার নাম গ্রন্থ-লিপি। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রসাদে উত্তর-ভারতের নাগরী লিপি দক্ষিণের গ্রন্থ-লিপিকে অনেকটা অপ্রচল করিয়া দিলেও, গ্রন্থ-লিপিতে ছাপা সংস্কৃত পুস্তক তামিল দেশে পাওয়া যায়, আর প্রাচীনকালে তামিল দেশে সব সংস্কৃত পুঁথিই এই অক্ষরে লিখিত হইত। আধুনিক-তামিলে সংস্কৃত ও অন্য ভাষার শব্দের ধ্বনি যথাযথ জানাইবার জন্য, প্রচলিত তামিল বর্ণমালায় গ্রন্থ-লিপি হইতে এই কয়টী বর্ণ গৃহীত হইয়াছে—**জ, ষ, স, হ, ক্ষ, শ্রী** ; প্রাচীন-তামিল বইয়ে এই বর্ণগুলি পাওয়া যায় না।

তামিলের প্রাচীন ও অর্বাচীন উচ্চারণ লইয়া এত কথা বলা গেল এই জন্য যে, এই উচ্চারণ-রীতিকে আশ্রয় করিয়া এ ভাষার একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের সমক্ষে দেখা দেয়। তামিল ভাষা আমাদের আর্য-ভাষা—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষা—হইতে যে কতটা পৃথক, ধ্বনি-বিষয়ে ও শব্দ-বিষয়ে, তাহা উপরের দেওয়া কতকগুলি দুর্বোধ্য নাম হইতেও কতকটা প্রণিধান করা যাইবে। আধুনিক তামিলে বহু সংস্কৃত শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে ; প্রাচীন তামিলে সংস্কৃত শব্দ তত আইসে নাই, শব্দ-বিষয়ে তামিল ভাষা নিজ বিশুদ্ধি বহুল পরিমাণে অটুট

রাখিয়াছিল ; এবং যে সব সংস্কৃত শব্দ তামিলে তখন স্থান লাভ করিত, তামিলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বহুশঃ তাহাদের আকার এতটা পরিবর্তিত হইত যে, তাহাদের সংস্কৃতত্ব ধরা পড়া কঠিন ব্যাপার। সংস্কৃত **শ্রী, সভা, ঋষি, কৃষ্ণ, সহস্র, স্নেহ** প্রভৃতির প্রাচীন তামিল বিকার **তিরু, অবৈ, ইরুটি, কিরুট্টিণন্, আয়িরম্, নেয়্** বা **নেচম্** প্রভৃতির মধ্যে, মূল শব্দ বাহির করা কঠিন।

ভাষায় যেমন প্রাচীন-তামিল নিজস্ব দ্রাবিড় বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রাখিয়াছে, সাহিত্যেও তদ্রূপ বিশুদ্ধ তামিল মনোভাব, তামিল সংস্কৃতি ও তজ্জাত সাহিত্যিক বাতাবরণ সুরক্ষিত আছে। এই বিশুদ্ধ তামিল সংস্কৃতির আবাস-ভূমি মৌলিক বা আর্য-পূর্ব তামিল জগৎ যে কি প্রকারের ছিল, তাহা সংঘ-যুগের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং প্রাচীনতম তামিল ব্যাকরণ 'তোল্-কাপ্পিয়ম্'-এর তৃতীয় 'অধিকার' বা অধ্যায় আলোচনা করিয়া জানা যায়। 'তোল্-কাপ্পিয়ম্' ব্যাকরণ ১,২৭৬ সূত্রে গ্রথিত। **এষু্ত্তিকারম্** নামে ইহার প্রথম অধ্যায়ে, **এষু্ত্তু** অর্থাৎ বর্ণ বা উচ্চারণ এবং লিখন আলোচিত হইয়াছে; **চোল্লতিকারম্** নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শব্দ ও ধাতুরূপ এবং বাক্যরীতির বিচার আছে; এবং **পোরুঠতিকারম্** নামে তৃতীয় অধিকার বা অধ্যায়ে, কাব্যে আলোচিত বিষয়-বস্তু, ছন্দ ইত্যাদির বিচার আছে। এই তৃতীয়

অধ্যায় হইতে দেখা যায় যে, কাব্যে বর্ণিতব্য বিষয়গুলিকে প্রাচীন তামিল বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকগণ ছুইটি মুখ্য ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন—[১] অকম্ অর্থাৎ অভ্যন্তর, [২] পুহুম্ অর্থাৎ বহিঃ। 'অকম্' অর্থে প্রেম, 'পুহুম্' অর্থে প্রেম ভিন্ন জীবনের অন্য সমস্ত দিক্, বিশেষতঃ লড়াই। প্রাচীন-তামিল সাহিত্য আলোচনা করিয়া, 'অকম্' ও 'পুহুম্'-এর প্রকাশ তামিল জীবনে কি ভাবে হইত, তাহার কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল হইল ইংরেজীতে প্রথম লেখেন স্বর্গীয় ভী. কনকসভৈ পিল্লৈ, তাঁহার The Tamils Eighteen Hundred Years Ago পুস্তকে। তামিল সাহিত্য-বিষয়ে পূর্বে তামিল লেখকদের যে সকল ইংরেজী পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলিতে, এবং স্বর্গীয় পী. টী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর্-রচিত ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Pre-Aryan Tamil Culture পুস্তকে, এবং শ্রীযুক্ত আর্. বাসুদেব শর্মা কর্তৃক প্রস্তুত তোল্-কাপ্পিয়ম্-এর 'পোরুল্অতিকারম্'-এর সটীক ইংরাজী অনুবাদে (Muruga Vilasa Jnananukula Press, Trichinopoly, 1933) প্রাচীন সংঘ-যুগের ও তৎপূর্বকালের তামিল সভ্যতার এবং তামিল সাহিত্যে আলোচিত বিষয়-বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইবে। 'অকম্' ও 'পুহুম্' যে ভাবে প্রাচীন তামিল সাহিত্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা

অবলম্বন করিয়া তোল্-কাপ্পিয়ম্-এর রচয়িতা প্রমুখ তামিল বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক ও কবি, তামিল সাহিত্যের উপযোগী এক অভিনব, সংস্কৃত অলঙ্কার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র, অলঙ্কার-শাস্ত্র এবং জীবন-দর্পন রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আভ্যন্তর প্রেম এবং বাহ্য প্রেমেতর বিষয়—**অকম্** ও **পুরম্**—প্রাচীন যুগের তামিল কবিরা জীবনকে এই দুই বর্গে বা ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য চিন্তায়, মানবের জীবনে কর্তব্য বা মানবের অনুষ্ঠাতব্য বিষয়কে চারিটী ভাগে—চতুর্বর্গে—বিভক্ত করা হইল—**ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ**। এই চতুর্বর্গ-বিষয়ক ধারণা, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে, তামিলদের মধ্যেও আসিল। চতুর্বর্গের চারিটী বর্গকে তামিলেরা নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া, বিষয়টী আত্মসাৎ করিয়া লইল; **ধর্ম = অরম্; অর্থ = পোরুঠ্, কাম = ইন্পম্**, এবং **মোক্ষ = রীটু**। তিরুবঠ্ঠুবর-এর ভগিনী কবি ঔবৈ বা আব্বৈ, 'নালটি' ছন্দের একটী শ্লোকে এই চারি বর্গের একটী করিয়া সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন; নিম্নে G. U. Pope-এর Hand-book of the Tamil Language হইতে তাহার চেন্-তমির্য্ মূলটী এবং Pope-এর ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে তামিল শব্দগুলির নীচে প্রত্যেক শব্দের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল:—

ஈதல் அறம் ; தீவினை விட்டு- ஈட்டல் பொருள் ;
দান(ই) ধর্ম ; পাপকে ছাড়িয়া, সংগ্রহ-করা(ই) অর্থ ;

எஞ்ஞான்றும் / காதல் இருவர் கருத்து ஒருமித்து-
সদা (সদৈব) প্রীতি দুইজনে মনে রাখিয়া

ஆதரவு / பட்டதே இன்பம் ;
আশ্রয় যাহা-অনুভব-করিয়াছে (তাহাই) কাম ;

பரனை நினைந்து-
পরব্রহ্মকে চিন্তা-করিয়া

இம்-மூன்றும் / விட்டதே
এই-তিনটী যাহা-পরিত্যাগ-করিয়াছে (তাহাই)

பேர்-இன்ப வீடு ॥
মহা-কাম (বা আনন্দ)-ময় মোক্ষ ॥

এই চতুর্বর্গময় জীবনই কবিগণের উপজীব্য। চতুর-বর্গের মধ্যে ত্রিবর্গ—**ধর্ম** বা মানুষের কর্তব্য এবং আদর্শ, **অর্থ** বা মানুষের পার্থিব লাভালাভ, এবং **কাম** বা স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ—এই তিনটী, চতুর্থ বর্গ **মোক্ষ** বা পরমার্থ লাভের পথ। এই তিনটীর সাধনায় মানবকে পরিচালিত করিবার জন্য বা মানবকে সহায়তা দিবার জন্য, জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা ধর্ম-শাস্ত্র, অর্থ-শাস্ত্র ও কাম-শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের সহিত এই তিনটীর সম্বন্ধ ; এবং এই তিনটীকে লইয়া যে শাস্ত্র, সে শাস্ত্র বস্তু-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—সে শাস্ত্র, আধুনিক

ভাবের কথায় বলিতে গেলে, বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান-মূলক। মোক্ষ-বিষয়ক শাস্ত্র হইতেছে দর্শন এবং অনুভূতি-মূলক; এখানে বিশেষ বিশেষ প্রকারের দর্শন ও অনুভূতির অবকাশ আছে। ত্রিবর্গাত্মক ব্যবহারিক জীবন, মানব-সাধারণ; ত্রিবর্গের উত্তরাবস্থা মোক্ষ-ধর্মের সাধনা লইয়া, দর্শন ও অনুভূতি লইয়া, মতভেদ থাকিতে পারে। এইজন্য, পরমার্থ লাভ করিয়াছেন এমন দিব্যজ্ঞান-যুক্ত ঋষি ও তত্ত্বজ্ঞ ছাড়া, সাধারণ পণ্ডিত বা উপদেশক ত্রিবর্গ লইয়াই আলোচনা করিতে বা উপদেশ দিতে পারেন। তিরু-ৱঌ্ঌুৱর্ ত্রিবর্গ লইয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; **নাৎ-পাল্** বা চতুর্বর্গের পরিবর্তে তিনি মাত্র **মুপ্-পাল্** বা ত্রিবর্গের বর্ণনা করিয়াছেন। **অৎম্, পোরুঌ্** ও **ইন্পম্** অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের বর্ণনা, বিচার ও বিশ্লেষণাত্মক শ্লোকাবলী লইয়াই তাঁহার **মুপ্পাল্** অর্থাৎ **ত্রিবর্গ** কাব্য; **কুৎঌ্** নামক দ্বিপংক্তিময় ক্ষুদ্র ছন্দে রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া, এই **মুপ্পাল্** কাব্যের অন্যতম নাম **কুৎঌ্**। **মুপ্পাল্** ও **কুৎঌ্** ব্যতীত এই কাব্যের আরও কতকগুলি নাম আছে, যথা—**উত্তর-বেদ (উত্তরবেতম্), পোয়্য়-মোৰ্ষি, তমির্ষ্মৰৈ, তিরু-ৱঌ্ঌুৱপ্পয়ন্, তৈরনূল্**, ইত্যাদি।

কুৎঌ্-ছন্দে রচিত ১৩৩০ বিচ্ছিন্ন শ্লোকের সংগ্রহাত্মক এই কাব্য। ইহা মণিহার বা পুষ্পমালা,—অবিচ্ছিন্ন

ধারার স্রোতস্বতী নদী নহে। মুপ্পাল্-এর তিনটী পৃথক্ বিভাগ—**অরত্তুপ্-পাল্** বা ধর্ম-বর্গ, **পোরুট্-পাল্** বা অর্থ-বর্গ এবং **কামত্তুপ্-পাল্** বা কাম-বর্গ। ধর্ম-বিষয়ে ৩৮০টী শ্লোক, অর্থ-বিষয়ে ৩৮১ হইতে ১০৮০ পর্যন্ত ৭০০ শ্লোক, এবং অবশিষ্ট ২৫০টী শ্লোক কাম-বিষয়ে। ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে তামিল কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে সংস্কৃতের ধর্ম, নীতি এবং অর্থশাস্ত্রের বহু শ্লোকের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—মনুস্মৃতি, কামন্দকীয় নীতিসার, কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি-রত্নাকর, রামায়ণ, মহাভারত (বিশেষতঃ গীতা), বৌধায়ন ধর্মসূত্র প্রভৃতির উক্তির সঙ্গে কুরল্-এর উক্তির সামঞ্জস্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দীক্ষিতর্ মহাশয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, ধর্ম-বর্গ ও অর্থ-বর্গের এবং বিশেষ করিয়া কাম-বর্গের শ্লোকগুলি, **পরিমেলর্ষকর্** প্রমুখ টীকাকারগণের মতে, প্রাচীন তামিল পদ্ধতি বা বিচার অনুসারে সজ্জিত। যেমন, ধর্ম-বর্গে দুইখণ্ড—**ইল্লরম্** বা গার্হস্থ্য-ধর্ম, এবং **তুররম্** বা সন্ন্যাস-ধর্ম; অর্থ-বর্গে তিনখণ্ড—**অরচিয়ল্** বা রাজ-ধর্ম, **অঙ্করিয়ল্** বা রাজ-কার্য, এবং **ওষিপিয়ল্** বা সামান্য বা সাধারণ কর্তব্য। সংস্কৃতের ধর্ম ও অর্থের পর্যায়ের সহিত এগুলির অসঙ্গতি নাই। কাম-বর্গের শ্লোকগুলি বিশুদ্ধ তামিল বিচার-পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত; কাম-বর্গ দুই খণ্ডে বিভক্ত—**কল্ঠরিয়ল্** বা **কল্ঠরু** অর্থাৎ গুপ্ত প্রেম

ও বিবাহ-বিষয়ক, এবং কহ্‌পিয়ল্‌ বা কহ্‌পু অর্থাৎ প্রকাশ্য বিবাহ-বিষয়ক। তামিল প্রেম-বিষয়ক অলঙ্কারের সহিত অনেকে কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ শাস্ত্রের একটা সঙ্গতি দেখিয়া থাকেন।

আমি G. U. Pope-এর, এবং নলিনীবাবু কর্তৃক অনুসৃত ভী. ভী. এস্. অয়্যর্-এর—এই দুইটী অনুবাদ দেখিয়াছি। পোপ ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরি, তথাপিও তিনি কুরল্‌-এর মহত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিরু-রল্ল্‌লুবর্-এর মত উচ্চ আদর্শের প্রচারক এবং কবি, খ্রীষ্টান না হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই নরকে যাইবেন—পোপ সাহেবের ধর্ম-বিশ্বাসে তাহাই বলে; অথচ এত উচ্চ কোটির আদর্শবান্ কবি যদি নরকেই যান্ তাহা হইলে সেটা নিজ ধর্মে আস্থাশীল অথচ গুণগ্রাহী পাদরির পক্ষে একটা অস্বস্তির কারণ হয়; তাই পোপ আশা করেন যে, পরলোকে ঈশ্বরের কৃপায় তিরু-রল্ল্‌লুবর্ নিশ্চয়ই খ্রীষ্টান ধর্মকেই একমাত্র সত্য ধর্ম বলিয়া উপলব্ধি করিয়া অন্য খ্রীষ্টানদের মত স্বর্গবাসের অধিকারী হইয়াছেন। পোপের অনুবাদ অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দোময় ইংরেজীতে করা হইয়াছে। ছন্দের খাতিরে পোপকে নিশ্চয়ই মূলের কথা সংক্ষেপ বা বিস্তার করিতে হইয়াছে। ভী. ভী. এস্. অয়্যর্ পোপের অনুবাদ সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অনুবাদ, পোপের পদ্যানুবাদ অপেক্ষা সহজবোধ্য।

কুরল্-এর মত সুবিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মূল ভাষা হইতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শীঘ্র তাহা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যত দিন তাহা না হইবে, তত দিন শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের অনুবাদ-দ্বারা সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালী পাঠকগণের কাজ চলিবে। ভী. কনকসভৈ পিল্লে-এর The Tamils Eighteen Hundred Years Ago পুস্তক অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু প্রাচীন তামিল সভ্যতার যে পরিচয় তাঁহার অনুবাদের পরিশিষ্টে দিয়াছেন, তদ্দারাও মোটামুটিভাবে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে উপকার হইবে। নলিনীবাবুর অনুবাদটী প্রাঞ্জল ও সুপাঠ্য; এবং স্বজাতির প্রতি ও তিরু-বল্লুবরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তামিল-ভাষী অনুবাদকের ইংরেজী অনুসরণ করায়, মূলের অনেকটাই তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

সৎসাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা-দেশে এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি নববর্ষ দিবস, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ॥

'সুধর্মা'
১৬ সংখ্যক হিন্দুস্থান পার্ক,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনুবাদকের ভূমিকা

১। কুরল

(১) দাক্ষিণাত্যে কুরল সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ও বেদের ন্যায় সম্মানিত গ্রন্থ। ইহা তামিল ভাষায় লিখিত একখানি উপদেশপূর্ণ উপাদেয় কাব্যগ্রন্থ। সম্ভবতঃ ইহা খৃষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতকে লিখিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বংশ-পরম্পরার উপর ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তিরুবল্লুবরের জীবনী সম্বন্ধে অল্পই জানা গিয়াছে। লোকে বলে যে বল্লুবর শব্দের অর্থ 'বল্লবা' জাতীয়। মাদ্রাজ প্রদেশে বল্লবা জাতি অস্পৃশ্য জাতিসমূহ মধ্যে পরিগণিত।

২। তিরুবল্লুবরের পরিচয় (২)

জনশ্রুতি এইরূপ যে, বল্লুবরের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল ভগবান। তাঁহার মাতার নাম ছিল অডি, এবং তিনি অস্পৃশ্য পৈরিয়া জাতির কন্যা ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ অডিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং

(১) এই গ্রন্থের দশ খানি টীকা আছে, তন্মধ্যে পরি-মেল-লকর কৃত টীকাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদৃত। 'তিরু' শব্দ সম্মানসূচক এবং 'শ্রী' শব্দের কাজ করে।

(২) ক্ষেমানন্দ রাহত কৃত হিন্দী অনুবাদের ভূমিকা।

তিনিই ভগবানের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই দম্পতীর সাতটি সন্তান হইয়াছিল—চারিটী কন্যা ও তিনটী পুত্র। তন্মধ্যে বল্লুবর সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। সকলেরই কবিত্বশক্তি ছিল। তন্মধ্যে বল্লুবরের ওয়্যার নামক ভগ্নী প্রতিভাশালী কবি ছিলেন।

এই পৈরিয়া-ব্রাহ্মণ-দম্পতি কোনো সময়ে দেশাটনে বহির্গত হইয়া মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী ময়লাপুর (মলয়াপুর) গ্রামে উপস্থিত হন, এবং সেখানকার এক উদ্যানে বল্লুবরের জন্ম হয়। কথিত হয় যে, কোনো কারণে বল্লুবর চিরদিনের জন্য সেইখানেই থাকিয়া যান। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর-জীবনের ইতিহাস অপরিজ্ঞাত। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, বস্ত্রবয়ন-কার্য্য অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ বলিয়া তিনি তন্তুবায়ের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সেখানে এলেলা শিঙ্গন নামক এক ধনী ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সে জাহাজের অধিকারী ছিল এবং সমুদ্র-পথে বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিত। সে বল্লুবরের শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত ছিল।

বল্লুবর বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম বাসুকী ছিল। বাসুকী ব্রাহ্মণ-কন্যা বা অস্পৃশ্য-জাতি-সম্ভবা ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু তামিলেরা তাঁহার চরিত্র আদর্শ চরিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করে, এবং বলে—তিনি সত্য সত্যই একজন পূজনীয়া আর্য্যদেবী

ছিলেন। তাঁহার অসামান্যা পতিভক্তিই এই শ্রদ্ধার কারণ। তিনি পতিতে এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি নিজ ব্যক্তিত্ব পতির ব্যক্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। পতির আজ্ঞা পালন করাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি অনন্যা শ্রদ্ধার সহিত পতিসেবায় নিরত ছিলেন। যতদিন বাসুকী বাঁচিয়া ছিলেন, তিরুবল্লুবর অতি আনন্দে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বল্লুবরের জীবন নিরানন্দময় হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল উদাসীনের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৩। কুরলের বিশেষ বিবরণ

প্রাচীন কালে তামিল দেশে তিনটি বিখ্যাত রাজ্য ছিল---পাণ্ড্য, চের ও চোল। পালি ভাষায় লিখিত মহাবংশ নামে সিংহলের ইতিহাসে এক চোলদেশীয় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ২৯৬০ কল্যব্দে সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন। এলেলা শিঙ্গন ঐ রাজা হইতে ষষ্ঠ পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা হইতে এই সন্ধান পাওয়া যায় যে, কল্যব্দ ৩২ শতকে বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে তিরুবল্লুবর জীবিত ছিলেন। জনশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পাণ্ড্য রাজা উগ্রপ্পেরু-

বলদীর রাজ্যকালে মাদুরার কবিসমাজে 'কুরল' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়্যঙ্গরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ তামিল আলোচনায় এই রাজার রাজ্যাভিষেক-কাল ১২৫ খৃঃ অঃ অনুমিত হইয়াছে। তামিল ভাষার "শিলপ্যাধিকারম্" ও "মনি-মেখলই" নামক দুইখানি মহাকাব্যে 'কুরলে'র ৫৫ সংখ্যক কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।* প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই দুইখানি মহাকাব্য খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের নিকট-বর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল। অতএব যদি 'কুরলে'র রচনাকাল খৃষ্টীয় প্রথম ও তৃতীয় শতকের মধ্যবর্ত্তী কোনো সময় ধরা যায়, তাহা হইলে অযৌক্তিক হইবে না। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাঘব আয়্যঙ্গর অনুমান করেন যে, উপরি উক্ত দুইখানি কাব্যগ্রন্থ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'কুরলে'র রচনাকাল ঐ দুইখানি কাব্যগ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব 'কুরলে'র যে কাল উপরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে আপত্তি হইতে পারে না।

যদিও তিরুবল্লুবর নীচবংশোদ্ভূত ছিলেন, তথাপি তাঁহার গ্রন্থ (কুরল) বেদের সম্মান লাভ করিয়াছে—ব্রাহ্মণেরাও

---

* ইহার বাংলা অনুবাদ এই—দেখ, যে নারী শয্যাত্যাগ করিবামাত্র অন্য দেবতাদের পূজা না করিয়া স্বীয় পতি-দেবতার পূজায় নিযুক্ত হয়, জলপূর্ণ মেঘও তাহার আজ্ঞা পালন করে।

উহাকে মস্তকে ধারণ করেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ —এই চারিটীকে শাস্ত্রে চতুর্বর্গ বলে এবং এই মনুষ্য-জীবনের চারিটী অভীষ্ট বস্তু। অর্থ (ধন-বৈভব) এবং কাম (স্ত্রী ইত্যাদি বাসনার বস্তু)—এই দুইটির জন্য সকল মনুষ্যই লালায়িত। একটু উচ্চস্তরের মনুষ্যেরা ধর্ম (সাধুমার্গে চলিতে) ও (জীবনান্তে) মোক্ষ (পরমাত্মাকে পাইতে) চাহেন। 'কুরলে' কেবল প্রথমোক্ত তিনটি অভীষ্টের আলোচনা অতি নিপুণতার সহিত ও অতি মধুরভাবে করা হইয়াছে। মোক্ষের পৃথক্ আলোচনা ইহাতে নাই। কিন্তু গ্রন্থের প্রথম (ধর্ম) অংশে, বিশেষতঃ উহার তপস্বী-জীবনাত্মক খণ্ডের শিক্ষার মধ্যে, চরম আনন্দ পাইবার মূল সাধন আত্মানুভূতির কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে 'কুরলে' 'ধর্ম' বলিতে গৃহস্থ ও তপস্বী-জীবন বুঝায়, 'অর্থ' বলিতে রাজনীতি বুঝায় এবং 'কাম' বলিতে দাম্পত্য প্রেম বুঝায়।

এই গ্রন্থে ১৩৩টি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম চারিটি পরিচ্ছেদ উপক্রমণিকা-স্বরূপ। তাহাদের পরের চৌত্রিশটি পরিচ্ছেদে গৃহস্থ ও তপস্বী-জীবনের, সত্তরটি পরিচ্ছেদে রাজনীতির, এবং অবশিষ্ট পঁচিশটি পরিচ্ছেদে দাম্পত্য প্রেমের আলোচনা আছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে দশটি করিয়া কবিতাত্মক সূত্র আছে। অতএব সমগ্র গ্রন্থে

১৩৩০টি সূত্র আছে। এক-একটি অংশ দুই বা তিন খণ্ডে বিভক্ত। ধর্ম-শীর্ষক অংশের দুই খণ্ডের নাম (১) গৃহস্থ জীবন ও (২) তপস্বী জীবন। অর্থ-শীর্ষক অংশের তিন খণ্ডের নাম (১) রাজা, (২) রাজতন্ত্রের অংশ-সমূহ ও (৩) বিবিধ। কাম-শীর্ষক দুই খণ্ডের নাম (১) গুপ্ত বিবাহ ও (২) পতিপরায়ণতা।

(ক) ধর্ম (গৃহস্থ ও তপস্বীর কর্ত্তব্য)

ধর্ম-শীর্ষক অংশের গৃহস্থ-জীবনাত্মক প্রথম খণ্ডে উত্তম পত্নী, উত্তম পিতা, উত্তম প্রতিবাসী এবং উত্তম মনুষ্য হইবার জন্য যে-সকল গুণ আবশ্যক তাহার শিক্ষা উনিশটি পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে দেখান হইয়াছে—মনুষ্য যশের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কি প্রকারে ভাল কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তাহার পর তপস্বীদের কি কি গুণের অভ্যাস করা উচিত তাহার উল্লেখ তেরটি পরিচ্ছেদে আছে। এই খণ্ডের শেষ অষ্ট-ত্রিংশ পরিচ্ছেদে ভাগ্য সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য আছে।

[জড় বিজ্ঞানে দুই প্রকারের শক্তির উল্লেখ আছে-- (১) সঞ্চিত বা অব্যক্ত (Potential) এবং (২) ক্রিয়াশীল বা ব্যক্ত (Kinetic or active) শক্তি। ক্রিয়াশীল শক্তির উদাহরণ পাওয়া যায় বায়ু, জল

ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থের গতিতে, মাধ্যাকর্ষণজনিত গতিতে, রাসায়নিক ক্রিয়াতে, শব্দে, উত্তাপে, আলোকে, তড়িৎ-প্রবাহে, চুম্বকের আকর্ষণে ইত্যাদি। এই সকল প্রতীয়মান শক্তি ব্যতীত কতকগুলি এমন শক্তি আছে, যাহাদের কার্য্য এখন প্রতীয়মান নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে, যেমন—বারুদ, ইলেট্রিক্ ব্যাটারী, সলফিউরিক্ আদি এসিড, কাঠ, তেল, তুলা, দেশলাই ইত্যাদি। সামান্যমাত্র উত্তেজনা পাইলেই ইহাদের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইয়া পড়ে। রাশীকৃত বারুদের একস্থান সামান্যমাত্র অগ্নির স্পর্শ পাইলেই সমস্ত স্তূপটি জ্বলিয়া উঠিবে।]

মনুষ্যের কার্য্যাবলীতে আমরা শক্তির ব্যক্ত অবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু ব্যক্ত শক্তি ব্যতীত মনুষ্যে বহু পরিমাণে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি সঞ্চিত বা অব্যক্ত ভাবে আছে, যাহা উপযুক্ত উত্তেজনা পাইলেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে,—যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, দয়া, সহানুভূতি, সেবা, স্নেহ, স্বদেশ-প্রীতি, হরি-ভক্তি ইত্যাদির প্রবৃত্তি। এই সঞ্চিত প্রবৃত্তিগুলি জীবকে ভাল-মন্দ কাজ করিতে চালিত করে। জন্ম-জন্মান্তরে জীব যে-সকল ভাল-মন্দ কাজ করিয়াছে, ভাল-মন্দ চিন্তাকে মনে স্থান দিয়াছে এবং এই জন্মে যে-সকল ভাল-মন্দ কাজ ও চিন্তায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের একটি

সমষ্টি তাহার মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নির্মিত হইতেছে এবং ইহাই ঐ সময়ে ঐ জীবের চরিত্র। উহার কিয়দংশ এ-জন্মে ব্যক্তরূপ ধারণ করিতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ অব্যক্ত বা সঞ্চিত থাকিতেছে। এই জীবনের শেষে কর্মফল যে পরিমাণে অব্যক্ত থাকিবে, উহাই ভবিষ্যৎ জীবনে জীব সঙ্গে লইয়া যাইবে, এবং উহাই ঐ জীবনের প্রারব্ধ বা প্রাক্তন কর্মফল বা ভবিতব্যতা বা ভাগ্য। অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদের উক্তিগুলি এই চিন্তাধারা প্রসূত বলিয়া অনুমিত হয়। এই পরিচ্ছেদের সার মর্ম এই যে, ভবিতব্যতার গতি অপ্রতিহত, এবং ভবিতব্যতার (অর্থাৎ নিজ কর্মফলের) হাত হইতে কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না। তথাপি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, অনাসক্ত পুণ্যকর্ম ও শুদ্ধ চিন্তা দ্বারা, এই জন্মেই হউক বা ভবিষ্যৎ অনেক জন্মেই হউক, সঞ্চিত পাপরাশির অনেক পরিমাণে ক্ষয় সাধন করিতে পারা যায়। নতুবা তিরুবল্লুবরের এত উপদেশ বৃথা হইয়া যায়। তাঁহার মতও বোধ হয় ইহাই। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে তপের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। কৃচ্ছ্রসাধন, অর্থাৎ শারীরিক বা মানসিক আঘাত সহ্য করিতে পারিলেই কর্মবন্ধন শিথিল হইতে পারে এবং মনুষ্য নিজেকে মুক্ত করিতে পারে। ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, দৃঢ়সঙ্কল্প দ্বারা সে মন্দ ভাগ্যকে পরাজয় করিতে পারে। দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদের

নবম ও দশম সূত্রেও উত্তমের মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

কুরলের ধর্ম-শীর্ষক অংশে অনেকগুলি উচ্চভাব পূর্ণ উক্তি পাওয়া যায়, যথা—

১। যাহারা বলে যে কেবল ধার্মিক লোকেরই প্রেমে অধিকার আছে, তাহারা মূর্খ; কেন-না, মন্দ লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইলেও প্রেমই মনুষ্যের একমাত্র সহায়। (৮.৬)

২। শুভ ও অশুভ সকল লোকের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকট ন্যায়নিষ্ঠ চিত্তই গৌরবের বস্তু। (১২.৫)

৩। যদি তোমার একটি কথা দ্বারা কাহারও পীড়া জন্মে তাহা হইলে তোমার সমস্ত সাধুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে মনে করিও। (১৩.৮)

৪। প্রতিশোধের আনন্দ একদিন মাত্র স্থায়ী কিন্তু ক্ষমার গৌরব চিরস্থায়ী। (১৬.৬)

৫। অন্য সর্ববিধ শত্রু হইতে পরিত্রাণ আছে, কিন্তু পাপকর্মের কদাপি বিনাশ নাই। উহা পাপীকে অনুসরণ করতঃ তাহাকে নষ্ট না করিয়া ছাড়ে না।

(২১.৭)

৬। যেমন ধন-বৈভবশূন্য মনুষ্যের জন্য ইহলোক নয়, তেমনই দয়াশূন্য মনুষ্যের জন্য পরলোক নয়। (২৫.৭)

৭। যাহারা কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে, তাহাদের শাস্তিবিধান সে ব্যক্তি কি প্রকারে করিবে? উপকার করিয়া সে তাহাদিগকে হৃদয়ে লজ্জা দিবে।

(৩২.৪)

৮। কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ বস্তু হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতে সে মুক্ত হইয়াছে। (৩৫.১)

৯। কাম, ক্রোধ ও মোহকে যে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছে, তাহার সকল কষ্ট নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(৩৬.১০)

১০। নিষ্কামনা হইতে শ্রেষ্ঠতর সম্পদ মর্ত্যলোকে আর নাই। যদি তুমি স্বর্গেও যাও, সেখানে এমন কোনো মূল্যবান বস্তু পাইবে না, যাহা ইহার সমকক্ষতা করিতে পারে। (৩৭.৩)

মানবজীবন সম্বন্ধে আশাপূর্ণ ভাবই কুরলের প্রথম অংশের বিশিষ্টতা।

তিরুবল্লুবর অতি ওজস্বী ভাষায় পারিবারিক জীবনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি স্ত্রী সুযোগ্যা ও আজ্ঞাকারিণী হয়, তাহা হইলে বিদ্বান্ ও ভক্তিমান্ সাধুদিগের পক্ষেও বিবাহ বাঞ্ছনীয় ও পরমোপ-যোগী। নতুবা একক থাকাই ভাল। স্ত্রী বাস্তবিকই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রাণ। গৃহস্থের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণকে সে

স্বর্গের রূপ দান করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বল্লুবর বলিয়াছেন, "স্ত্রী যদি সুযোগ্যা হয় তাহা হইলে দারিদ্র্য কাহাকে বলে ?" আর "স্ত্রী যদি অযোগ্যা হয় তবে ধনী হইয়া লাভ কি ?" "যে স্ত্রী শয্যা হইতে উত্থান করিবামাত্র পতিসেবায় ব্রতী হয়, জলপূর্ণ মেঘও তাহার আজ্ঞা পালন করে !" বোধ হয় তিনি নিজের অনুভব হইতেই এই সকল কথা বলিতে পারিয়াছেন। যেখানে তপোমূর্ত্তি বাসুকী প্রসন্ন-সলিলা মন্দাকিনীর ন্যায় জীবন-উদ্যানকে পত্রপুষ্পে সজীব করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে স্ত্রীলোকের গ্লানি-সূচক উক্তির (১) প্রয়োগ কি প্রকারে সম্ভব ? বল্লুবর নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা তাঁহার বাৎসল্য রসানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, "বংশীধ্বনি মধুর, বীণাধ্বনিও মধুর—যাহারা নিজ শিশু সন্তানের আধ আধ কথা শুনে নাই, তাহারাই এরূপ বলে।" যাহারা বেশ্যাসঙ্গ করে, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "বেশ্যার কপট-আলিঙ্গন, অন্ধকার ঘরে শবদেহ আলিঙ্গন করার সমান।" ব্যভিচারকে তিনি অতিশয় নিন্দার্হ বলিয়াছেন। স্ত্রৈণ ব্যক্তিকে তিনি অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর চরণার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকে সে কখনও মহত্ত্ব লাভ করিতে

(১) Frailty thy name is woman.—Shakespeare
'স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্। ইত্যাদি

পারে না। এরূপ লোক ধর্ম্মোপার্জ্জনও করিতে পারিবে না, ধনোপার্জ্জনও করিতে পারিবে না। স্নেহের আস্বাদনও তাহার ভাগ্যে নাই।"

কুরলগ্রন্থ পদ্যে রচিত নীতিবিষয়ক সূত্রের সমষ্টি। বল্লুবর (জৈন) নিগ্রন্থ (১) সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ আস্থাবান থাকিয়াও নির্ভীক ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মত ছিল, "যে-জ্ঞানে মনুষ্যসমাজের সুখ বৃদ্ধি হয় তাহাই যথার্থ জ্ঞান।" তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন এ বিষয় লইয়া এক সময়ে ঘোর মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছিল। শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই তাঁহাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। এই সকল সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মত তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় সত্য, তথাপি ইহা বলা যায় না যে, তিনি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি উদার মতাবলম্বী স্পষ্টবাদী ব্যক্তি ছিলেন, এবং মত-মতান্তরের বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ হইতে দেন নাই। তিনি যেখানে যে রত্ন পাইয়াছিলেন তাহা দ্বারাই নিজ ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভ্রমরের ন্যায় তিনি নানা পুষ্পের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কোনও পুষ্প বিশেষে আবদ্ধ হন নাই।

---

(১) যে ব্যক্তি সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

• তিরুবল্লুবর বলিয়াছেন, "দান গ্রহণে তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতে পারে, তথাপি দান গ্রহণ অনুচিত। যদি স্বর্গ নাও থাকে, তথাপি দান করা ভাল।" "নির্ভীক সাহসে বীরত্ব আছে বটে, কিন্তু একজন অভাগাকে দয়া দেখানতে তদপেক্ষা অধিক মহানুভবতা আছে।" সকল ব্যবসায়ের মধ্যে তিনি কৃষকের ব্যবসায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। "যাহারা ভূমি কর্ষণ করে তাহারাই প্রকৃত সুখী; অন্যেরা বড় লোকের অনুসরণ ও সেবা করিয়া জীবন যাপন করে।" তিনি অদৃষ্টবাদীদের উপহাস করিয়া বলিয়াছেন "যাহারা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে তাহারা ভাগ্যের উপর জয়ী হইবে।" "একটী কাজ কঠিন বোধ হওয়াতে সাহস হারাইও না। পরিশ্রমই লোককে বড় করে।"

তিনি মনুষ্যগণকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছেন, "অজ্ঞ লোকেরা বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য নয়। পশুতে ও মনুষ্যে যে প্রভেদ, অজ্ঞ লোকে ও বিদ্বানে সেই প্রভেদ।" "অজ্ঞ লোকেরা জীবিত থাকে বটে, কিন্তু ঊষর ভূমির ন্যায় কিছুই উৎপন্ন করে না।" "জ্ঞানীরা যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পায়, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা সব থাকিতেও দরিদ্র।" তিনি নিগ্রন্থ ছিলেন বলিয়া কাহারও জীবন না লওয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভাবিতেন, এবং ব্রাহ্মণদের পশুবলিকে অতি ঘৃণার চক্ষে

দেখিতেন। "একটী প্রাণীরও জীবন নষ্ট না করা, সহস্র যজ্ঞ করিয়া ঘৃতাহুতি দেওয়া অপেক্ষা ভাল।" তিনি প্রতিফলে (অর্থাৎ পাপ করিলে দণ্ড পাইতে হয় এই মতে) বিশ্বাস করিতেন। "যদি পূর্ব্বাহ্নে কাহারো অনিষ্ট কর, অপরাহ্নে তোমার অপকার হইবে।" তিনি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকে বিদ্যার অহঙ্কারে কেবল মত্ত না থাকিয়া, শ্রম করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে বলিয়াছেন। যে কর্ম্মে কোনো লাভ নাই তাহা না করিয়া যে জ্ঞানময় সত্তা এই বিশ্ব-চরাচরের নিয়ন্তা, তাঁহার সম্মান ও আজ্ঞাপালন করিতে তিনি তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। "হায়! সে বিদ্যায় লাভ কি, যদি বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সর্ব্বজ্ঞ সত্তার চরণ-পূজা না করে?"

যাহাকে লোকে মৃত্যু বলে উহা তো কেবল জীবের শরীরের বিনাশ। উহাতে তো জীবের সম্পূর্ণ লোপ হয় না। উহার একটি ভবিষ্যৎ জীবনও আছে। মনুষ্য যখন হিতকর ও সাধুজীবন যাপন করিয়া এবং এই অনন্ত জীবন-নাটকে স্বীয় স্থান অধিকার করিবার জন্য পুত্রোৎপাদন করিয়া সমাজের প্রতি তাহার যে কর্তব্য ছিল তাহা পালন করিয়াছে, তখন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাহার প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

যখন গৃহস্থ নিজ সাধু আচরণের ফল-স্বরূপ জীবন সোপানের কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করিয়াছে তখন এই

উচ্চতর স্থান প্রাপ্ত হইবার ফলে একটি উচ্চতর সাধুতার ক্ষেত্র তাহার সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইতেছে, এবং ঐ স্তরের উপযুক্ত হইবার জন্য আপনাকে অধিকতর শাসনাধীন রাখা উচিত বিবেচনা করিতেছে। সেই উদ্দেশ্যে এখন সে সর্ব্বভূতে দয়া, নিরামিষ আহার, আত্ম-নিগ্রহ ও ধ্যান-যোগের অভ্যাস করিয়া এবং (এই উপায়ে অধিকতর আধ্যাত্মিক বল ও দৃষ্টি-শক্তি সঞ্চিত হইলে) প্রতারণা, অসত্য, ক্রোধ, হিংসা, পরপীড়ন হইতে নিবৃত্ত হইয়া, মনকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। এই প্রকার আত্ম-শাসন দ্বারা অবিদ্যার নানা কোষ স্খলিত হওয়াতে তপস্বীর চক্ষু খুলিয়া যায় এবং সে স্বীয় অন্তরে অনুভব করে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা—আজ আছে, কাল অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এই হেতু সাংসারিক বস্তুতে তাহার পূর্ব্ববৎ আসক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সত্যের যথার্থ মূর্তি প্রতিভাত হয়। কিন্তু বাসনা এখনও তাহার মনের নিকট বিদায়গ্রহণ করে নাই। উহা নানা বর্ণে ও নানা আকারে তাহার মনকে কলুষিত করিতে থাকে। বড় বড় ধর্ম্মাত্মাগণও তাহার ছলনা হইতে অব্যাহতি পান না, এবং যে পর্য্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মা বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। সেই জন্য গ্রন্থকর্তা এই অংশের উপসংহারে বলিতেছেন,—বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না,

কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বাসনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (৩৭.১০)

মলয়াপুরের এই অস্পৃশ্য তাঁতি যে আচার-ধর্ম্মের মহিমা ও শক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জগতের কোনো ধর্ম্ম-সংস্থাপক এতদপেক্ষা অধিক শিক্ষাপ্রদ ও প্রভাব-শালী উপদেশ দিতে পারেন নাই। ইহা মনুষ্যসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী এক সাধু-হৃদয়ের সৃষ্টি। জীবনকে উচ্চ ও পবিত্র করিবার নিমিত্ত যে সকল বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, যথা—মিথ্যা ও প্রতারণার অনিষ্টকারিতা, সত্যের উচ্চতা ও উপকারিতা, ক্রোধের বিষময় ফল, অহিংসার গুণ এবং সাংসারিক পদার্থের অসারতা,—ধর্ম্মের প্রকরণে ইহাদের সূক্ষ্মতা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

(খ) অর্থ (রাজনীতি)

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে কবি রাজনীতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনটি অংশের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জীবনের পরি-কল্পনায় কবি রাজনীতিকে কিরূপ স্থান দিয়াছেন। এই অংশটির নাম দিতে গিয়া কবি বোধ হয় কৌটিল্যের অনু-সরণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কেবল রাজনীতির প্রসঙ্গই আছে, কারণ রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত শাসনা-ধীন না থাকিলে নিরুপদ্রবে ধনের সঞ্চয় বা উপভোগ

করা যায় না। কবি বলেন যে, অত্যাচারী রাজার শাসনে দরিদ্রের অবস্থাপেক্ষা ধনীর অবস্থা অধিক সঙ্কটাপন্ন। (৫.৬৮) রাজাকে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ধনীর উপরও প্রযোজ্য।

প্রথম অংশ পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই কাব্যের লেখক একজন গার্হস্থ্য-নীতি-বিশারদ। যে অংশের আলোচনা এখন আরম্ভ হইতেছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, তিনি একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ এবং সাংসারিকজ্ঞানে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। রাজনীতির এমন কোনো অংশ নাই, যাহা তাঁহার সুপরিচিত ছিল না। রাজ্য-শাসন ব্যাপারের মৌলিক তত্ত্বগুলি ধরিবার বিশেষ ক্ষমতা তাঁহার ছিল বলিয়া বুঝা যায়। কোনো স্থানে অস্পষ্টতা, যদৃচ্ছা-কল্পনা বা শব্দবাহুল্য দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক বিষয় যথাস্থানে ও উচিত পরিমাণে সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনীতি-বিষয়ক সমগ্র ক্ষেত্র তাঁহার সুযুক্তি-কিরণে সমুজ্জ্বল।

কি উপায়ে সুনিপুণ ভাবে রাজ্য-শাসন-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। এই অংশের প্রথম খণ্ডে মুখ্যতঃ রাজাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কারণ তিনিই রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা। কতকগুলি উপদেশ সাধারণ লোকদিগকে দেওয়া হইলেও, তাহা রাজার প্রতিও প্রযোজ্য। আবার কতক-

গুলি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইলেও, তাহা হইতে সাধারণ লোকও উপকার পাইতে পারে, যেমন—"আত্ম-প্রসাদ হইতে যে অনবধানতার উৎপত্তি হয়, তাহা অতি-ক্রোধ অপেক্ষাও দূষণীয়" (৪.১)। "যে রাজা গুণবান্ ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কোনো কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করে, তাহার পক্ষে এমন কোনো কাজ নাই, যাহা অসম্ভব।" (৪৩.২)

রাজ্যে শৃঙ্খলা ও সুশাসন থাকা অত্যাবশ্যক। কুশাসন ও অরাজকতা হইতে অনেক অনর্থ উৎপন্ন হয়। রাজার পক্ষে নিজে রাজ্যের শাসননীতির উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তাহার ন্যায়-নিষ্ঠ ও পক্ষপাত-শূন্য হওয়া কর্তব্য (৫৫ পরি)। রাজার অন্যায় কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার মন্ত্রীদিগের ও সকল প্রজার থাকা প্রয়োজন (৩৯.৯, ৪৫.৭, ৪৫.৮)। রাজার বিলাসী হওয়া অনুচিত। তাহার এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক —(১) সে প্রজা-মাত্রকেই তাহার নিকট প্রবেশের অধিকার দিবে, (২) সে জ্ঞানী ব্যক্তিগণের উপদেশ গ্রহণ করিবে, (৩) সে গুণবান ব্যক্তিদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে, (৪) সে কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবে, (৫) সে বিশেষ চিন্তা-পূর্ব্বক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, (৬) সে বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগ করিবে, (৭) সে আলস্য ত্যাগ করিবে, (৮) সে নির্ভীক ও পরিশ্রমী হইবে, (৯) সে প্রজাপীড়ন করিবে না,

(১০) সে শান্তি ও বিগ্রহের নিয়ম ও কৌশলে অভিজ্ঞ হইবে, (১১) সে নিজে সকল কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিবে, (১২) সে দৃঢ়সঙ্কল্প ও সাহসী হইবে, (১৩) সে রাজনীতিতে পারদর্শী হইবে এবং (১৪) সে চর-নিয়োগে নিপুণ হইবে।

এই অংশের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দশ পরিচ্ছেদ মন্ত্রীদের বিষয়ে লিখিত। মন্ত্রীরা কর্ম্মঠ, চতুর, দৃঢ়সঙ্কল্প, প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং অপরের মনোভাব অনুমান করিতে সমর্থ হইবে। তাহারা রাজসভাসদের সর্ব্বোচ্চগুণসম্পন্ন এবং যথাসময়ে মৌনাবলম্বনে সক্ষম হইবে। যদি কখনও বিদেশী রাজ-সভায় দৌত্য কবিতে যাইতে হয়, তখন তাহারা সেখানকার রাজার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবে, এবং রাজ-কর্ম্মচারীদিগের সহিত মেলা-মেশা করিবে এবং তাহাদের সংসর্গে শিষ্টাচার দেখাইবে। কিন্তু তাহারা নিষ্কলঙ্ক থাকিবে এবং সর্বদা তাহাদের দৃষ্টি স্বীয় রাজার হিতের ও গৌরবের প্রতি থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের আত্ম-প্রত্যয় ও জন-মণ্ডলীর সম্মুখে বাক্-পটুতা দেখাইবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

ভারতীয় অর্থ-শাস্ত্র-বিশারদেরা সমগ্র রাজ-তন্ত্রকে ছয় অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তিরুবল্লুবরও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। ছয়টি অঙ্গের মধ্যে মন্ত্রী-সমাজ একটি। অবশিষ্ট অঙ্গগুলির নাম—সেনা, প্রজা, ধন,

মিত্ররাজন্যবর্গ এবং দুর্গ (৩৯.১)। ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে এই সকল বিষয়ের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের পরে কয়েকটি পরিচ্ছেদে নানাপ্রকার দোষের এবং বিরুদ্ধাচারীদের বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষ পরিচ্ছেদে ঔষধ এবং চিকিৎসকদের কথা আছে।

তৃতীয় খণ্ডের তেরটি পরিচ্ছেদে বিবিধ বিষয়ের বিচার আছে। ঐগুলির মধ্যে 'সম্মান' ও যোগ্যতা'-বিষয়ক পরিচ্ছেদ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ-গুলির বিষয় এই—কুলীনতা, মহত্ত্ব, শিষ্টাচার, কৃষি, ভিক্ষাবৃত্তি, অধঃপতিত জীবন।

(গ) কাম (দাম্পত্য প্রেম)

গৃহস্থ-জীবন ও রাজনীতির আলোচনা শেষ করিয়া কবি তৎপরে জীবনের তৃতীয় লক্ষ্য "প্রেমের" একখানি অপূর্ব্ব আলেখ্য আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতেছেন। 'কুরলের' প্রধান প্রধান ভাষ্যকারের মতে এই অংশটি কোনো বাস্তব প্রেমের চিত্র—কোনো বিশেষ প্রণয়ী-যুগলের প্রেম-গাথা। নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার হইতে তাহাদের মিলন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার ইতিহাস আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার ধরণ দেখিয়া বাস্তবিকতার অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু এই কবিতাগুলি সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার কার্য্যকলাপ ও

মনোভাবের বর্ণনা বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। এই কবিতা-সমূহে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের অসংখ্য পরিবর্তন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। টেনিসনের লক্সলী-হলে বর্ণিত নায়িকার সহস্র হৃদয়াবেগ যাঁহাদের পরিচিত, তাঁহারা তিরুবল্লুবরের বর্ণনাগুলি পড়িয়া স্বীকার করিবেন যে, এই প্রাচীন তামিল কবি এ-বিষয়ে টেনিসন অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই কল্পনোজ্জ্বল বৃত্তান্তের আরম্ভ এই প্রকারে করা হইয়াছে—এক নির্জন বনে কোনো সময়ে নায়িকা হঠাৎ নায়কের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইল। যুবতীর রূপের মোহে যুবক আত্মহারা হইল। যুবতীর লাবণ্য, বিশাল যুগলনেত্র, নয়নের হৃদয়ভেদী চঞ্চলদৃষ্টি, উন্নত উরস্থল তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। পরে তরুণী আরও দুই-একবার যুবকের সম্মুখে পড়িল, কিন্তু ভাব গোপন করিয়া সে যুবকের সহিত অপরিচিতার ন্যায় ব্যবহার করিল। নায়ক ভাবিতে থাকে—"সে আমাকে জানিতে দেয় না বটে যে, সে আমাকে দেখিয়াছে, কিন্তু যখন অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখিয়া না দেখিবার ভাণ করে, তখন আমি বুঝিতে পারি যে সত্য সত্যই তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিতে থাকে এবং তাহার মুখমণ্ডলে অস্ফুট হাস্যের রেখা দেখা দেয়। 'প্রত্যাখ্যানের অভিনয় করিলে কি হইবে,

হৃদয়ে সে আমার প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করে।” সত্যই নায়িকা হৃদয় হারাইয়াছে। সে মনে মনে বলিতেছে, “আমার প্রিয়তম অহরহঃ আমার নয়নের মধ্যে বাস করিতেছেন। আমি নয়নে কজ্জল লেপন করিতেও ভয় পাই, পাছে মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আমার নেত্র ছাড়িয়া যান।” (১১৩.৭) একদিন সে নায়কের অনুনয় ব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া গলিয়া গিয়া মৃদু হাস্য করিল। নায়ক ভাবিল “হৃদয়, ফুল দেখিয়া তুমি আত্মহারা হও! তোমার কি ভ্রম! যে-সকল কুসুম সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা কি প্রিয়ার চক্ষুর সমতা করিতে পারে?” (১১৩.৩) বারান্তরে তাহার চোখের চাহনীতেই সম্মতি ব্যক্ত হইল। তখন তাহারা চিরদিন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল এবং তাহাদের গুপ্ত বিবাহ হইল। এরূপ বিবাহ প্রাচীন তামিল সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ইহা আর্য্য-ধর্মশাস্ত্রোক্ত গন্ধর্ব বিবাহের অনুরূপ। এখন তরুণ-তরুণী পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ হইল। যে রমণী এ-পর্য্যন্ত নায়কের হৃদয়ে ব্যথা দিয়া আসিতেছিল, সে-ই সে-ব্যথার ঔষধ হইল। এখন উভয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ শরীরের মধ্যে সমীরণের প্রবেশও বিয়োগ-ব্যথা উৎপন্ন করে।

বিবাহ গোপনে হইল—তরুণীর পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন কেহ জানিতে পারিল না। প্রেমিকদ্বয় একটি

অনুকূল সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, যখন এই ঘটনা সহজে সমাজে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু দুই চারি দিন অতীত হইতে না হইতেই যুবক মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কবে রহস্য-ভেদের উপযুক্ত সময় আসিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। যুবকের অধীরতা অধিক অপেক্ষা করা অসম্ভব করিয়া তুলিল।

অতি প্রাচীন কালে তামিল দেশে প্রেমিকদের এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার একটি কৌশলের উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। কিন্তু উপায়টি অবলম্বন করা নিতান্ত সহজ ছিল না—প্রেমিক যুবককে দারুণ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে ও অশেষ লজ্জাহীনতা দেখাইতে হইত। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যুবকের এই করুণ অবস্থা দেখিয়া যুবতীর পিতামাতা ও সমাজের লোকেরা তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবে এবং যে-বিবাহ গোপনে হইয়াছে, তাহাতে সম্মতি দিয়া তাহার হস্তে তাহার প্রণয়িনীকে সমর্পণ করিবে।

উপায়টিকে বর্বরোচিত স্থূল উপায় ভিন্ন আর কি বলা চলে? কতকগুলি সবৃন্ত তালপত্র কাটিয়া আনিয়া দড়ি দিয়া ঈষৎ লম্বা একটি মোটা গোল বোঝার আকারে বাঁধা হইত। প্রেমিক যুবক সেই বোঝার উপর দুই দিকে পা ঝুলাইয়া ঘোড়-সওয়ারের মত বসিত, এবং সেই অবস্থাতেই তাহার কয়েক জন বন্ধু আবেগময় প্রেমগাথা

গান করিতে করিতে তাহাকে বহন করিয়া গ্রামের ভিতরে লইয়া যাইত। সেই সময়ে তালপাতার ধারবিশিষ্ট অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশের সঙ্ঘর্ষে ঐ প্রেম-যাত্রার পথিক-মহাশয়ের শরীরের অংশ-বিশেষের কিরূপ দশা হইত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার উপর গ্রামের যত বালক ও যুবক ঐ প্রেম-বিহ্বল অশ্বারোহী বীরবরকে ঘিরিয়া তাহাকে উপহাস ও বাক্যবাণে জর্জর করিতে করিতে এবং সম্ভবতঃ তাহার প্রণয়িনীর নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে, তাহার অধীনস্থ সেনা-বাহিনীর ন্যায় তাহার অনুসরণ করিত। (১১৪ পরিচ্ছেদ) এই কোলাহলের শব্দ যুবতীর পিতামাতা ও বন্ধুবর্গের কর্ণ-গোচর হইত এবং তখন তাহারা যুবতীর অপকীর্তির কথা প্রথম জানিতে পারিত। বলা বাহুল্য যে, তাহার তিরস্কারের সীমা থাকিত না। কিন্তু এখন তিরস্কার করিলে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ত ফিরিবে না। এই সংবাদ সমস্ত গ্রামে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বাধ্য হইয়া পিতামাতাকে বিবাহে সম্মতি দিতে হইত। তখন প্রেমিক-যুগলের হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সুখ-সূর্য্যের উদয় হইত।

আলোচ্য গ্রন্থের নায়কও গত্যন্তর না দেখিয়া ভাবিল, "প্রিয়া হইতে যে সকল প্রণয়ী বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরহের তুষানলে দগ্ধ হইতেছে, কৃচ্ছ্র-জ্ঞাপক তীক্ষ্ণ-ধার তালপত্রের

উপর আরোহণ করা ছাড়া তাহাদের অন্য উপায় নাই।” (১১৪.১) এই উপায়ে সে তাহার প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইল। কিছুকাল পর্য্যন্ত নবীন দম্পতি পরস্পরের মধুময় সাহচর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের ধারা সহজ গতিতে প্রবাহিত হয় না। নিরানন্দের কাল মেঘ আসিয়া তাহাদের প্রেমের নির্ম্মল নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। শীঘ্রই সৈনিক বেশে যুদ্ধে যাইবার জন্য যুবকের ডাক আসিল। উহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে হৃদয় পাষাণ করিতে হইল। আহা বিদায়-দৃশ্য কি করুণ! যুবক তাহার তরুণী পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সে শীঘ্রই গৌরব লাভ করিয়া ও ধন সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু যুবতী কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহে না—বিয়োগের চিন্তামাত্রেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বলিল “তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। ফিরিবার কথা ছাড়া যদি আর কিছু বলিবার থাকে ত বল—তোমার আশু প্রত্যাগমনের কথা তাহাকেই বলিলে ভাল হয়, যে ততদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকার আশা করে”। (১৬৬.১) যুবক বারংবার বিদায়-ভিক্ষা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বিষণ্ণ মনে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ নবীনা রমণীদের আজ্ঞাধীন নয় এবং

তাহাদের সুবিধানুসারে সমাপ্ত হয় না। প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, কিন্তু যুবক বাটী ফিরিল না। যুবতী এ পর্য্যন্ত কোনো প্রকারে ধৈর্য্য-ধারণ করিয়াছিল। এখন ব্যাকুল হইল—বিরহ-বেদনা অসহ্য হইয়া পড়িল। তরুণীর বিরহ-যাতনার বিবরণ গ্রন্থের এগারটি পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। প্রেম প্রথমাবস্থায় রূপ-জনিত মোহমাত্র—দৈহিক উপভোগের স্পৃহা—যেন সাগরের বহিঃপৃষ্ঠের ঊর্মিমালার উচ্ছ্বাস; কিন্তু ক্রমশঃ উহা ঘনীভূত হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তল অধিকার করে—তখন উহার বাহ্য প্রকাশ বিরল—উহা যেন সাগরের গভীর দেশস্থ স্রোতের স্থিরগতি—বাহ্য-দৃষ্টির অগোচর। বিরহেই প্রেমের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিরহের বর্ণনাতেই কবির যথার্থ কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হয়। নায়িকার দুঃসহ-যন্ত্রণা-জনিত সহস্র তীব্র আবেগময় ভাব পাঠককে আনন্দে পরিপ্লুত করে। তিরুবল্লুবর এই সকল ভাবের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

নায়িকা বলিতেছে "সাধারণের নিন্দা-রূপ সার এবং মাতার গঞ্জনা-রূপ জল-সেক দ্বারা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া আমার বিরহ-দিগ্ধ হৃদয়ের বেদনা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে (১১৫.৭)। অগ্নিকে স্পর্শ করিলে তবে সে দগ্ধ করে, কিন্তু সুদূর হইতে দগ্ধ করে প্রেম (১১৬.৯)। এখনও আমি আমার অন্তরের অসীম দুঃখের কণ্ঠরোধ

করিয়া রাখিয়াছি ; কিন্তু নিঝরের জলধারা যেমন অবিরাম শোষণেও নিঃশেষিত হয় না, সেইরূপ আমার শোকাশ্রু-নির্ঝর শত প্রয়াস সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে (১১৭.১)। আমার প্রাণ-যষ্টির দুই প্রান্তে অনুরাগ ও সঙ্কোচের বোঝা বাঁধিয়া আমি বহন করিয়া বেড়াইতেছি, সেই কারণে আমার আর্ত ও অসহায় দেহ দুঃসহ (দুঃখের) ভারে সতত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে (১১৭.৩)। যামিনীর মায়া-দণ্ডের স্পর্শে নিখিল জগৎ নিদ্রায় অচেতন, কেবল আমিই জাগ্রত থাকিয়া তাহার সাহচর্য্য করিতেছি (১১৭.৯)। আমার হৃদয়ের মত আমার চক্ষুও যদি দৌড়াইয়া বাঞ্ছিতের কাছে পৌঁছিতে পারিত, তবে তাহাকে (চক্ষুকে) আজ অশ্রু-সাগরে সাঁতার দিতে হইত না (১১৭.১০)। হে আমার চক্ষুদ্বয়, আজ আমার নিকট অভিযোগ করিতেছ কেন? তোমাদেরই নিমিত্ত আমি সান্ত্বনার অতীত এই সন্তাপ ভোগ করিতেছি ; কারণ তোমরাই আমার বল্লভকে দেখাইয়া আমাকে তাহার হৃদয়-তীর্থের যাত্রী করিয়াছ (১১৮.১)। আমার বিবর্ণতা তাঁহার বিরহ-সম্ভূত বলিয়াই স্পর্ধা পাইয়াছে, তাই সে রঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে লীলা করিতেছে (১১৯.২)। সেই তস্কর আমার ব্রীড়া ও কমনীয়তা সকলই হরণ করিয়া লইয়াছেন ; বিনিময়ে দিয়াছেন সুধু অসহ বিরহ ও পাণ্ডুর বর্ণ (১১৯.৩)।

প্রেমের প্রতিদান না পাইয়াও পাষাণ দেবতার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া যে নারী জীবিত থাকে, তাহা অপেক্ষা কঠিন-প্রাণ জীব পৃথিবীতে আর কে আছে? (১২০.৮) তাঁহার স্মৃতিপট হইতে তিনি সযত্নে আমার ছবিখানি মুছিয়া ফেলিয়াছেন। আমার মানসপটে আপনাকে এইরূপ প্রকাশ করিতে কি তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত নহেন? (১২১.৫) যে জন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমরা অভিন্নাত্মা, দুটি অংশে গঠিত একটি পূর্ণজীবন', তাঁহার নির্মমতার কথা যখন চিন্তা করি, তখন দেহ হইতে প্রাণ যেন লুকাইয়া যায় (১২১.৯)। আজও যে বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ, জাগরণে যাঁহাকে কখনও পাই না, স্বপ্নের সম্মোহে মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শন পাই (১২২.৩)। এই বেদনাময় জাগরণের অবস্থা যদি না থাকিত, তাহা হইলে শাশ্বত স্বপ্ন-লোকে প্রিয়তমের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনের অক্ষয় আনন্দ অনুভব করিয়া ধন্য হইতাম (১২২.৬)। শিশির-সিক্তা সন্ধ্যা-বধূ একদা বেপথু ও দীর্ঘশ্বাস সহকারে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইত। আজ সে সাহসিকার ন্যায় উপস্থিত হইয়া আমার বক্ষে বেদনা ও নৈরাশ্যের হাহাকার তুলিয়া দেয় (১২৩.৩)। আমার এই বেদনা প্রভাতে কোরকের মত হৃদয়-বৃন্তে দেখা দেয়, সারাদিন ধরিয়া সে তাহার দলগুলি বিস্তার করিতে থাকে, এবং সন্ধ্যার সময় পূর্ণ

প্রস্ফুটিত অবস্থায় বিরাজ করে (১২৩.৭)। বিবাহের দিনে যে পেলব বাহুদ্বয় স্ফীত হইয়াছিল, আজ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা প্রিয়তমের নিকট হইতে বিদায় লইবার বার্তা ঘোষণা করিবে (১২৪.৩)। হে হৃদয়, আত্মসম্মানে তুমি জলাঞ্জলি দিয়াছ, যেহেতু নির্মম-চিত্তে যে তোমাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে, সে আসিল না বলিয়া তুমি হাহাকার করিতেছ এবং তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছ (১২৫.৮)। অগ্নিতে ঘৃতের ন্যায় যাহাদের চিত্ত প্রেমের উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহারা কি প্রিয়তমের সহিত মনোবাদ পোষণ করিয়া বাঁচিতে পারে? (১২৬.১০) হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি-গুলিকে পদদলিত করিয়া তিনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া-ছেন। তথাপি অচিরেই তিনি আবার আসিবেন—এই চিন্তায় আমার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠে (১২৭.৪)। আমার নয়ন-মণি হৃদয়-দেবতা যখন ফিরিয়া আসিবেন, আমি কি তখন দীর্ঘ অদর্শনের জন্য মানভরে বসিয়া থাকিব? না, তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিব? অথবা একে একে দুয়েরই অনুষ্ঠান করিব?" (১২৭.৭)

নায়ক ঘরে ফিরিবার পূর্ব্বে, তাহার উপেক্ষার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মর্মাহত হইয়া নায়িকা কতই বিলাপ করিতেছে। তাহার মনে সহস্র বিচিত্র ভাবের উদয় হইতেছে। কখনও সে নায়ককে অতি নিষ্ঠুর, কখনও

তাহার সমস্ত দুর্দশার কারণ, কখনও সমাজে নিন্দনীয় হওয়ার হেতু বলিতেছে; কখনও নিজ হৃদয়কে ধিক্কার দিতেছে যে, এত উপেক্ষা ও অনাদর সত্ত্বেও সে প্রিয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হয় ও মিলনের জন্য অধীর হয়। "তিনি কবে ফিরিবেন—কবে তাঁহার রূপ-সুধা পান করিয়া আমার উপোষিত নেত্র তৃপ্ত হইবে—আমার শীর্ণ বাহুর বিবর্ণতা দূর হইবে?"

ওদিকে বাড়ি ফিরিবার জন্য নায়ক ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সে চায় যে আজই যুদ্ধের অবসান হউক—আজই সন্ধ্যার সময় বাটী পৌঁছিয়া প্রিয়ার সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হই। তাহার প্রিয়তমার অবস্থার কথা ভাবিয়া সে কাতর ও ভীত হইতেছে—"আমার ফিরিবার আগেই যদি তাহার কুসুম-পেলব হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তবে ঘরে ফিরিয়া কি হইবে?" (১২৭.৮.১০)

আজ কাতরা অবলার হৃদয়-দেবতা ঘরে পৌঁছিলেন। "এ কি এ? প্রিয়া দৌড়িয়া আসিয়া কণ্ঠলগ্ন হইল না কেন? ওহো, মান করিয়া বসিয়া আছেন?" পরিণীত জীবনে মান কি মধুর ও উপভোগ্য! মিলিত হইবার আগ্রহ কত বৃদ্ধি পায়! ক্রোধের মধ্যে প্রেমের কিরূপ আত্মপ্রকাশ হয়! শেষের পাঁচটি পরিচ্ছেদে কবি পাঠকগণকে মান-লীলা-মাধুর্য্যের আস্বাদন করাইয়াছেন। এই পরিচ্ছেদ কয়টি পড়িলা আমরা একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা

পড়ার আনন্দ পাই। রস-পুষ্টির জন্য এক তৃতীয় ব্যক্তির সন্নিবেশ করা হইয়াছে—এই পাত্রীটি নায়িকার সখী। মানের অবস্থায়, ইহাকে সম্বোধন করিয়া নায়ক ও নায়িকা নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে এবং, সখীও সময়মত নিজের বক্তব্য বলিয়াছে।

নায়ক বলিতেছে, "হে প্রিয়া, তুমি গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও, তোমার নয়নের চঞ্চলতা বলিয়া দিতেছে যে, তোমার স্পন্দমান বক্ষে কোন্ বিচিত্র চিন্তা তরঙ্গিত হইতেছে।" (১২৮.১)

(নায়িকা নীরব ; সখীকে সম্বোধন করিয়া নায়ক)

আহা, আমার সরলা বনিতার বাক্-সংযম ললনাকুলের মধ্যেও অতুলনীয়। তাহার সৌন্দর্য্য আমার নয়নের আনন্দ ; তাহার বংশ-সদৃশ সুগোল ও সুগঠিত ভুজদ্বয় কি মনোহর (১২৮.২)। অস্ফুট কোরকের সৌরভের মত আমার ছলনাহীনা প্রিয়ার অস্ফুট হাস্যের মধ্যেও একটি প্রচ্ছন্ন অর্থ নিহিত আছে (১২৮.৪)।

(নায়িকার প্রস্থান ; সখীর প্রতি জনান্তিকে নায়িকা)

আমা অপেক্ষা আমার মণিবন্ধচ্যুত কঙ্কণ তাঁহার চিত্তের উদাসীনতা অগ্রে অনুভব করিয়াছে (কারণ প্রিয়-বিরহের চিন্তামাত্রেই তাহা প্রকোষ্ঠ-ভ্রষ্ট হইয়াছে) (১২৮.৭)।

(নায়ককে সম্বোধন করিয়া জনান্তিকে সখী)

সখী একবার কঙ্কণের দিকে, পরে তাহার সুকুমার বাহুর দিকে এবং শেষে স্বীয় চরণের দিকে তাকাইল। মাত্র এই কয়টি সঙ্কেত সে আমাকে করিয়াছে। (১২৮.৯)

(সখীকে নায়ক)

প্রিয়া সঙ্কেতে বিরহ-বেদনার তীব্রতার কথা বলিয়াছে, এবং সহগামিনী হইবার অনুমতি চাহিয়াছে। কেবল নয়নের ভাষা দিয়া তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া সে মাধুর্য্য গুণে রমণী মাত্রকেই অতিক্রম করিয়াছে। (১২৮.১০)

(জনান্তিকে সখীর প্রতি নায়িকা)

সখি, মনে করিয়াছিলাম, মানভরে চলিয়া যাইব, কিন্তু আমার হৃদয় সে কথা ভুলিয়া গেল, এবং প্রিয়-সঙ্গমের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। যেমন চিত্রণ-কালে চক্ষু তুলিকার কৃষ্ণত্ব দেখিতে পায় না, তেমনি দয়িত নিকটে থাকিলে তাঁহার কোনো দোষই আমার চোখে ধরা পড়ে না। (১২৯.৪.৫)

(স্বগত নায়ক)

কুসুম অপেক্ষাও কোমল এই প্রেম। কিন্তু অতি অল্প লোকেই জানে ইহা কত সুকুমার এবং কত যত্নে ইহাকে লালন করিতে হয়। (১২৯.৯)

(স্বগত নায়িকা)

উঁহার হৃদয় উঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তন করে।

হৃদয়, তুমি আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া চল না কেন? উঁহার সাহচর্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিবার পূর্বে, একটু অভিমান দেখাইতেও তুমি অস্বীকৃত কেন? এই সকল ব্যাপারে আর কে তোমাকে বিশ্বাস করিবে? হয়ত উঁহাকে পাইব না, অথবা পাইয়াও হারাইব, এইরূপ বেদনাময় চেতনায় আমার চিত্ত নিয়ত চঞ্চল। (১৩০. ৩.৪.৫)

(নায়ক)

যখন আমার হৃদয়ই আমার পক্ষ ত্যাগ করিয়া অভিমানিনী প্রিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিতেছে, তখন অপরে (অর্থাৎ প্রিয়া) যে আমাকে উপেক্ষা করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? (১৩০.১০)

(নায়িকার প্রতি জনান্তিকে সখী)

হে সখি, উঁহাকে আলিঙ্গন করিও না, ক্রোধের ভাণ করিয়া বসিয়া থাকিও। দেখা যাক্, এই ব্যাপারে উনি কিরূপে বিব্রত হন। মানই প্রেমের লবণ, কিন্তু মনে রাখিও, দীর্ঘকাল মান ধরিয়া থাকিলে, খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ সংযোগের ন্যায়, উহা অপ্রীতিকর হইবে। (১৩১.১.২)

(নায়ক অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্ত—এই সন্দেহে ঈর্ষ্যার ভাব দেখাইয়া নায়কের প্রতি নায়িকা)

যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, তাহাকে আশ্লেষ

না করিয়া আসা, আহতকে পুনরাঘাত করার মতই অকরুণ হইয়া পড়ে। (১৩১.৩১)

(নায়িকার প্রতি নায়ক)

বিশুদ্ধ-চরিত্র পুরুষের নিকটও প্রিয়ার অভিমানের মাধুর্য্য নিতান্ত অ::ন নহে। প্রিয়ার মধ্যে ভ্রূকুটি ও অভিমানের লীলা যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রেম তাহার পরিণত ও অর্ধ-পরিণত ফলগুলি হইতে বঞ্চিত হইত। কিন্তু অভিমানের একটি বেদনাময় অনুভূতি আছে, কারণ প্রতিক্ষণেই মনোমধ্যে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয়—"মিলন নিকটে, না এখনও অনেক দূরে ?" (১৩১. ৫.৬.৭)

(নায়িকাকে শুনাইয়া অর্ধ স্বগতভাবে নায়ক)

শোক করিয়া ফল কি ? কারণ, এমন কেহ নিকটে নাই যে, আমাকে ভালবাসে, এবং আমি যে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছি তাহা বুঝিতে পারে। ছায়া-বহুল-নিকুঞ্জেই (সুপেয়) বারি তৃপ্তি-দায়ক, এবং যে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাহারই পক্ষে মান সুশোভন। আমার হৃদয় যদি এখনও তাহাকেই আকাঙ্ক্ষা করে, যে আমার তৃপ্তিবিধান করে না, তবে ইহা তাহার বৃথা কামনা। (১৩১.৮.৯.১০)

(নায়িকা)

হে কপট রসিক, রমণী মাত্রেই দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে

গ্রাম (তোমার মনোহরণ) করে। তোমার আলিঙ্গনে আমার প্রয়োজন নাই। (১৩২.১)

(নায়ক) (১৩২—৩ হইতে ১০)

আমি যদি কখনও মাল্য পরিধান করি, তবে "অন্য কোনো তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছ."—এই বলিয়া সে রোষভরে চলিয়া যায়। আমি তাহাকে বলিলাম, "প্রিয়ে আমি জগতে সবচেয়ে তোমাকে ভালবাসি," সে ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কার চেয়ে বল ত?" আমি কহিলাম, "এ-জীবনে আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না।" হায়, হায়, শ্রবণ মাত্র তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুর ঝারি ঝরিয়া গেল (পর জীবনে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে, এই কল্পনা করিয়া)। আমি তাহাকে বলিলাম, "প্রিয়ে, প্রবাসে আমি তোমাকে নিত্য স্মরণ করিতাম," অমনি উদ্যত আলিঙ্গন সংবরণ করিয়া মানভরে সে এই বলিয়া চলিয়া গেল, "তবে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে (কোন দিন) ভুলিয়াছিলে।" আমি হাঁচিলাম, এবং সে আমার আয়ুষ্কামনা করিল। পরক্ষণেই সেই শুভেচ্ছা প্রত্যাহার করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিল, "এখন তোমাকে কে স্মরণ করিতেছে যে তুমি হাঁচিতেছ?" আমি আমার হাঁচি দমন করিলাম। তথাপি সে বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিল, "কেহ যে তোমাকে স্মরণ করিতেছে, সে-কথা তুমি আমার নিকট গোপন করিতে চাহ।" তাহাকে

সান্ত্বনা দিবার অশেষ চেষ্টা করিলেও সে অধিকতর কুটিল ভ্রূকুটি করিয়া বলে, "অপরের মান-ভঙ্গ করিয়া করিয়া এ-বিষয়ে তুমি বেশ অভ্যস্ত হইয়াছ বটে।" তাহার মঞ্জু-মূর্ত্তির প্রতি আবেশময় দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সে তিরস্কার করিয়া কহে, "কাহার রূপের সহিত আমার অবয়বের তুলনা করিতেছ?"

(নায়িকা) (১৩৩—১ হইতে ৪)

উনি দোষশূন্য হইলেও এই অভিমানই আমাকে উঁহার মনোরঞ্জন-পটুত্ব-মাধুর্য্যের আস্বাদ দেয়। যদিও এই কোমল গুণ প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইতে প্রিয়তমকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তথাপি অভিমান দেখাইতে আমাদের যে সামান্য বেদনার অনুভব হয়, তাহারও একটি নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। প্রবহমান বারি-ধারার সহিত উহার সংশ্লিষ্ট ভূমির যেরূপ সম্বন্ধ, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধও যদি সেইরূপ নিবিড় ও নিগূঢ় হয়, তাহা হইলে, অভিমানাপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গ (আনন্দ) আর কোথায় আছে? প্রিয়তমের সহিত আমার কলহের মধ্যে সেই অমোঘ শক্তি নিহিত আছে, যাহা আমার অন্তরের অবরোধ বলপূর্ব্বক উল্লঙ্ঘন করে।

(নায়ক) (১৩৩—৫ হইতে ১০)

সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তির দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গন হইতে যখন প্রিয়ার বাহুলতা অপসারিত হয়, তখন উহা হইতে এক-

অননুভূতপূর্ব্ব হর্ষ-শিহরণ জাগিয়া উঠে। ভোজনাপেক্ষা অধিকতর সুখকর তাহার পরিপাক ; সেইপ্রকার আশ্লেষাপেক্ষা অধিকতর সুখকর প্রেম-কলহ। প্রেম-কলহে অগ্রে যে নতি স্বীকার করে, তাহারই হয় জয় ; মিলন-কালে ইহার সত্যতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ক্ষণকালের জন্য কলহের ভাণ করিয়া প্রিয়া কি আমাদের আলিঙ্গনে অধিকতর সরসতার সঞ্চার করিতে চাহেন? আহা, মানময়ীর কুঞ্চিত ললাট ও রোষ-স্ফুরিত অধরের শোভা যেন আরও কিছুক্ষণ উপভোগ করিতে পারি। কেবল আমার প্রার্থনায় যামিনী যেন আরও কিছুকাল দীর্ঘ হয়। প্রেমের মাধুর্য্য অভিমানে, এবং অভিমানের চরম সার্থকতা পরবর্তী নিবিড় মধুর আলিঙ্গনে।

এই বিবরণটি এক সাধ্বী তরুণীর মনোভাব ও কার্য্যাবলীর সজীব চিত্র। ইহাতে অসংযম, উদ্দামতা, প্রগল্ভতা বা অপবিত্রতার নামগন্ধ নাই। ইহা ন্যক্কারজনক অবৈধ পরকীয়া প্রেম হইতে সহস্র যোজন দূরে ; ইহাতে তাহার ইঙ্গিত মাত্র নাই, এবং অশ্লীলতার ছায়াস্পর্শও হয় নাই। ইহা কল্পনা-স্বর্গের পারিজাতের পরিমল-বাহী। অবচ্ছিন্ন (abstract) উপদেশ ব্যর্থ হয় জানিয়া কবি দুটি তরুণ-তরুণীকে পাঠকগণের সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের চিন্তাধারা ও কার্য্য-পরম্পরা প্রদর্শন করার ছলে প্রেমরাজ্যের রহস্যের বাস্তব স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন,

এবং যাহাতে প্রেম-ব্যাপার যথোচিত ভাবে নির্বাহিত হইতে পারে, তাহার একটি পথ-প্রদর্শক আদর্শ যুবক-যুবতীদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রে মানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের নাট্য-শাস্ত্র, ও ভাসের নাটকাবলী অতি প্রাচীন বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু তিরুবল্লুবরের সময়ের পূর্বে কোনো অলঙ্কারগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহার বার শত বৎসর পরে বৈষ্ণব কবিরা পরকীয়া নায়িকার মানের উত্তম বিশ্লেষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত প্রাচীন সময়েও এই তামিল কবি স্বকীয়া নায়িকার মানলীলা বর্ণনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। রামায়ণে কৈকেয়ীর মানের বিবরণ আছে। মান কালিদাসের শকুন্তলা বা সেক্স্পীয়রের টেম্পেস্টের বিষয়ীভূত নহে, তথাপি তিরুবল্লুবরের নায়িকাতে নিভৃত-নিবাসিনী শকুন্তলা ও মিরাণ্ডার সরল অকপট প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়; প্রেমিক-প্রেমিকার কম্পান্বিত হৃদয়ের আবেগের বর্ণনায় তিরুবল্লুবর যেন তাহাদের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

উপসংহার

মনুষ্যের নৈতিক, পারিবারিক বা নাগরিক জীবনের যে দিগদর্শন কবি স্বীয় গ্রন্থে করাইয়াছেন, তাহা অমূল্য। গ্রন্থে মানব-মনের প্রত্যেক দেশের বিশাল অভিজ্ঞতার নিদর্শন

পাওয়া যায়। মলয়াপুরের এই দরিদ্র অস্পৃশ্য তাঁতির প্রতিভা অসামান্য। তিনি ভীষ্ম, কৌটিল্য, বাৎসায়ন, কামন্দক ইত্যাদি নীতি-ব্যাখ্যাতাদের সঙ্গে আসন পাইবার যোগ্য। কবিত্ব-শক্তিও তাঁহার নিতান্ত সামান্য ছিল না। তিনিই কবি, যাঁহার কল্পনা উচ্চ, যিনি উপযুক্ত ভাষায় নিজ ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন এবং যাঁহার উক্তি হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিরুবল্লুবরের রচনায় এই সকল গুণ বর্তমান। তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া এই ধারণা পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয় যে, সংসার একেবারে উপেক্ষার বস্তু নয়, ইহার কিছু বাস্তব সত্তা ও মাধুর্য্যও আছে; ইহাতে যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও আছে, সুখ-দুঃখে জড়িত এই সংসারের কর্তব্য অনেক। সেগুলি যথাশক্তি পালন করিতে হইবে। সাধুতা, আত্ম-সম্মান ও পৌরুষের মত গুণ নাই, এবং অনৃত, ও নীচতা হেয় ও অবশ্য-বর্জনীয়। বিশ্ব-সাহিত্যে "কুরল" তিরুবল্লুবরের এক অমূল্য দান।

রাজনীতি বিষয়ক দ্বিতীয় অংশের নীতিতে এক-আধ স্থানে অসামঞ্জস্যের সন্দেহ উপস্থিত হয় (যথা ৮৩.১০এ); কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ব্যক্তিগত নীতি হইতে রাজনীতি ভিন্ন। গৃহস্থ-জীবনে ক্ষমার সমান গুণ নাই, কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রে দুষ্টের দমন আবশ্যক—রাষ্ট্র-শত্রু ক্ষমার্হ নয়।

পরিমলেলকর "কুরলের" প্রধান ভাষ্যকার। তাঁহার পূর্বের নয়জন টীকাকার গ্রন্থের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, কেবল পরিমলেলকরই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে এবং মূলের চিন্তাধারা ও সৌন্দর্য্য বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য না পাইলে এখনকার দিনে মূলের তাৎপর্য্য বুঝিতে কেহই সমর্থ হইত না। এই গ্রন্থ লাটিন, জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। হিন্দী ও তেলুগু ভাষাতেও ইহার কিয়দংশের অনুবাদ হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদকগণের নাম F. W. Ellis, W. H. Drew, E. J. Robinson, J. Lazarus, Rev. G. U. Pope এবং V. V. Srinivas Aiyar. শেষোক্ত অনুবাদক প্রধানতঃ পরিমলেলকরকে অনুসরণ করাতে তাঁহার অনুবাদটি শুদ্ধ ও সুন্দর হইয়াছে। আমি ল্যাজারাস-এর অনুবাদও দেখিয়াছি। অনেক স্থলে আয়ার-এর অনুবাদের সহিত তাঁহার অনুবাদের মিল নাই---উভয়ের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমি আয়ার মহোদয়ের অনুবাদের অনুসরণ করিয়াছি। এজন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

৪। মাদুরার সাহিত্য পরিষদ্ (১)

তিরুবল্লুবর তাঁহার কুরল গ্রন্থ রচনা করিয়া, উহা মাদুরার বিদ্বৎ-পরিষদ্ দ্বারা অনুমোদন করাইবার জন্য

(১) V. Kanaksabhai.

মলয়াপুর হইতে মাদুরায় গমন করেন। অনেক কবি এই সমাজভুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মাদুরার অধিবাসী ছিলেন, কেহ কেহ চোল রাজ্যের উরইয়ার ও কবি-বিপ্পদম্ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, কেহ কোঙ্গনদের চেল্লুর হইতে, কেহ খোন্দাইনাদের বেঙ্কটম্ হইতে এবং অন্যেরা তামিল দেশের নানাস্থান হইতে আসিয়াছিলেন। এই কবি-পরিষদে ইনিয়-নারপতু নামক নীতিবিষয়ক কাব্য-রচয়িতা পূথন-চেন্থনর; তিরিক্কডুকম্ নামক নীতিবিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ-রচয়িতা নল্লাথনর; কলিথ্-থোকাই সংগ্রহীতা নল্লন্থুবনর; শৃঙ্গার-রসাত্মক কবিতা-সমূহের অকাপ্পাবল নামক ব্যাকরণ রচয়িতা ইবইনর; কুরিঞ্জি-প্পদ্দু ও ইন্ন-নারপতু দুইখানি মনোমুগ্ধকর কাব্য-রচয়িতা কপিলর; মঙ্কাদি-মরুতনর, যিনি অলঙ্কানুম্-বিজয়ী পাণ্ড্য-রাজ নেদুঞ্জ-চেলিদনের উদ্দেশে মদুরইক-কাঞ্চি নামক গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন; পরম বিদ্বান্ নক্কিবর, যিনি নেদুনল-বদই তিরুমুরুক্কারুপ-পদই নামক পশুপাল-জীবন-মূলক ছোট ছোট পদ রচনা করিয়াছিলেন; গভীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বৌদ্ধ-বিদ্বান্ চীদলনইচ চাদনর, যিনি মণি-মেগলই নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—এই সকল বড় বড় বিদ্বানেরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বড় বড় চিকিৎসা-শাস্ত্রাচার্য্যগণ, জ্যোতিষাচার্য্য-গণ, সাহিত্যাচার্য্যগণ—যাঁহাদের রচিত গ্রন্থ আজিও

হস্তগত হয় নাই—উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ের অগ্রগণ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর ও প্রসিদ্ধ কবিমণ্ডলীর মধ্যস্থলে পণ্ডিত-কুল-পোষক পাণ্ড্যরাজ উগ্র-পেরু বলুদী (উগ্রবেরু বজ্রদি) বিরাজমান ছিলেন। এই মহাসভায় বিচারের জন্য দণ্ডায়মান বল্লুবরের হৃদয় উৎকণ্ঠায় কম্পিত হইতেছিল সন্দেহ নাই।

৫। কুরল সম্বন্ধে পরিষদের অভিমত (১)

তামিল কবিদের পরিচিত কোনো ভাষায় এরূপ গ্রন্থ পূর্বে কখনো রচিত হর নাই। পরিষদ্ এই গ্রন্থ প্রশংসার্হ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং উপস্থিত প্রত্যেক কবি, রাজাকে সম্বোধন করিয়া এই গ্রন্থের প্রশংসা-সূচক এক-একটি কবিতা রচনা করিলেন। ইরাইনর সাহসের সহিত এরূপ ভবিষদ্বাণী করিলেন যে, বল্লুবরের গ্রন্থ অবিনশ্বর হইবে এবং ভবিষ্যদ্ বংশাবলীর শিক্ষার মূল স্বরূপ হইবে। যে ছয়টী ধর্ম্ম সম্প্রদায় সতত পরস্পরের সহিত বিবাদে নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সকলেই একবাক্যে বল্লুবর-রচিত গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিল দেখিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

একজন কবি বলিলেন, 'বল্লুবরের মুখ হইতে যে সকল বাক্য আজ শুনিলাম, তাহা আমরা পূর্বে কখনো শুনি

(১) V. Kanaksabhai.

নাই। তাহা শুনিয়া ধর্ম কি, অর্থ কি এবং কাম কি বুঝিতে পারিলাম, এবং আজ চিরসুখের পথ আমাদের নিকট স্পষ্ট হইল।' আর একজন কবি বলিলেন, 'ব্রাহ্মণেরা বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন এবং অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন না, পাছে এরূপ করিলে তাহার আদর কমিয়া যায়; কিন্তু বল্লুবরের মুপ্পাল (কুরল) সামান্য তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইলেও কখনো ইহার মূল্যের হ্রাস হইবে না।' এক জ্যোতিষী বলিলেন, 'সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি পৃথিবী হইতে সত্বর অন্ধকার বিদূরিত করে, কিন্তু বল্লুবরের কুরল মানব-মনের অন্ধকার দূর করে।' এক বৈদ্যশাস্ত্রী চমনকে (১) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'মধুর সহিত সম্মিল লবণ ও শুণ্ঠী মাড়িয়া খাইলে শিরঃপীড়া নিবারিত হয়; কিন্তু বল্লুবরের মুপ্পাল পাঠ করিয়া চমনেরও শিরঃপীড়া দূর হইল!' আর একজন কবি বলিলেন, 'ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে এই মধুর কুরল নির্দ্দোষ। ইহাতে সকল লেখকের ও সর্ব্বকালের জ্ঞান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।'

কুরলের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত দেখিয়া রাজা উগ্র গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের প্রশংসায় এইরূপ বলিলেন, "চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বল্লুবরের ছদ্মবেশে আসিয়া মুপ্পাল দ্বারা আমাদিগকে

---

(১) চমন চিন্তা করিবার সময় সর্ব্বদা তাঁহার লেখনী দ্বারা নিজ মস্তকে আঘাত করিতেন।

চারিবেদের শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থ মস্তক দ্বারা আদৃত হইবে, মুখের দ্বারা পঠিত হইবে, কর্ণের দ্বারা শ্রুত হইবে এবং মানব দ্বারা চিন্তিত হইবে।”

৬। কুরলের রচনা-কাল

উপরি বর্ণিত জনশ্রুতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত এম, শ্রীনিবাস আয়্যাঙ্গর উগ্রবেরুবজ্রদির রাজ্যারম্ভ কাল ১২৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী বলেন। এতদ্ব্যতীত—‘শিলপ্পদিকরম্’ ও ‘মণিমেগলই’ নামক দুইখানি তামিল গ্রন্থে কুরলের ষষ্ঠ প্রকরণের পঞ্চম পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কতকগুলি বিদ্বানের মতে, এই দুইখানি গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এম, রাঘব আয়্যাঙ্গর বলেন যে, ঐ গ্রন্থদ্বয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর রচনা। কিন্তু উহারা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইলেও দুই শতাব্দী পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধরণ হওয়ার কোনো বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এলেনাশিঙ্গন নামক এক ধনী বণিক তিরুবল্লুবরের বন্ধু ছিলেন। এইরূপ কথিত হয় যে, এই শিঙ্গন ঐ নামের চোল বংশীয় রাজার ষষ্ঠ পর্য্যায়ের বংশধর। মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, চোলরাজ শিঙ্গন খৃষ্টের ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে সিংহল আক্রমণ করিয়া বিজয় প্রাপ্ত হন এবং সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। এক এক

পুরুষ ৬০ বৎসর ধরিলেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, কুরল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বী, বী, এস, অয়্যার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম ও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে তিরুবল্লুবরের জন্ম হইয়াছিল।

৭। কুরলের উপর আর্য্যসাহিত্যের প্রভাব

সম্ভবতঃ তিরুবল্লুবর স্বকীয় গ্রন্থের মতামতের জন্য কোনো আর্য্যশাস্ত্রের নিকট ঋণী নন। আমি কুরলের ধর্ম্মপ্রকরণ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ ও বৌধায়ান-ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত, অর্থ-প্রকরণ সম্বন্ধে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সহিত এবং কাম-প্রকরণ সম্বন্ধে বাৎসায়নের কামসূত্রের সহিত উহাদের মিল করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু উভয় মধ্যে কোন সাদৃশ্য পাই নাই। তিরুবল্লুবরের উক্তিগুলি সরল, জটিলতাবিহীন, ওজস্বী এবং উপযোগী। তিনি স্বাধীন-ভাবে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কুরল পাঠ করিলে তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়। কাম-প্রকরণে তাঁহার ভাবুকতার ও উচ্চ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'কুরল' একটী তামিল ছন্দের নাম। তিরুবল্লুবর তাঁহার কাব্য-গ্রন্থ কুরল ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম দিয়াছেন 'কুরল'। প্রত্যেক শ্লোক দুটী

পংক্তিতে বিভক্ত—প্রথম পংক্তিতে চারিটী, এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে তিনটী,, পাদ (foot)। প্রথম পংক্তির শেষ পাদ বা দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পাদ, প্রথম পংক্তির প্রথম পাদের সহিত মিত্র (সদৃশ-উচ্চারণ-বিশিষ্ট)। যথা সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদের ১০ম শ্লোকের মূল এইরূপ—

কামম্ বেকুলি ময়ক্কম্ ইবৈমূন্দ্রিন্
নামম্ কেদক্কেড়ুম্ নোয়্।

"বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"

গ্রন্থের পরিশিষ্টে তামিল-জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস, এবং প্রাচীন তামিল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পরিশেষে ইহা বলা আবশ্যক যে, মূলের তৃতীয় ভাগের (কাম প্রকরণের) অনুবাদে আমার মধ্যম পুত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ বিনায়ক সান্যাল, এম-এ আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

শান্তিপুর (নদীয়া)
১লা কার্তিক, ১৩৪৩। } **শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল।**

সূচীপত্র

তপস্বী

অর্থ ৮১



প্রস্তাবনা

কুরল

প্রস্তাবনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর-স্তুতি

১। 'অ' শব্দলোকের মূল-স্থান; ঠিক সেইরূপ আদিব্রহ্ম সর্ব্বলোকের মূল-স্রোত।

২। যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পূজা না কর, তবে তোমার এই সমস্ত বিদ্বত্তা কি কাজের?

৩। যে ব্যক্তি হৃদয়-কমলের অধিবাসী শ্রীভগবানের পবিত্র চরণের শরণ লয়, সে সংসারে অনেক কাল জীবিত থাকিবে।

৪। যাহারা সেই আদি-পুরুষের পদারবিন্দে রত থাকে, যিনি কাহারো প্রতি অত্যধিক প্রেমও দেখান না এবং কাহাকে ঘৃণাও করেন না, তাহারা কখনো কোনো দুঃখে পতিত হয় না।

৫। দেখ, যে সকল লোক উৎসাহ পূর্ব্বক প্রভুর গুণগান করে, তাহাদিগকে নিজেদের ভালমন্দ কর্ম্মের দুঃখপ্রদ ফল ভোগ করিতে হয় না। (১)

---

(১) হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের মতে শরীরের মৃত্যুর পর লোকের কর্ম্মফল তাহার আত্মার সঙ্গী হইয়া তাহার পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়। কর্ম্ম শব্দে বুঝিতে হইবে, সে যে সকল চিন্তা ও কাজ তাহার জীবনে করিয়াছে। মনুষ্য-জীবন দুঃখময়, পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলে দুঃখের অবসান হয় না, এবং মুক্তি দ্বারা যে পরামানন্দ লাভ

৬। যে সকল লোক সেই পরম জিতেন্দ্রিয়-পুরুষ-প্রদর্শিত ধর্ম্মমার্গের অনুসরণ করে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইবে।

৭। কেবল সেই সকল লোকই দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, যাহারা সেই অদ্বিতীয় পুরুষের শরণ লয়।

৮। ধন-বৈভব ও ইন্দ্রিয়-সুখের সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের পারে তাহারাই যাইতে পারে যাহারা সেই ধর্ম্মসিন্ধু মুনীশ্বরের চরণে লীন থাকে।

৯। যে মনুষ্য অষ্ট গুণ সম্পন্ন পরব্রহ্মের (২) চরণকমলে মস্তক অবনত করে না, সে সেই ইন্দ্রিয়ের সমান, যাহার নিজগুণ (ধর্ম্ম) গ্রহণ (প্রকাশ) করিবার শক্তি নাই। (৩)

১০। জন্মমৃত্যুরূপসমুদ্র তাহারাই পার হইতে পারে, যাহারা প্রভুর শ্রীচরণের শরণাপন্ন হয়; অন্যেরা তাহা পারে না।

হয়, তাহা পিছাইয়া যায়। ভাল কাজও যদি সকাম হয়, তাহাতে পুনর্জ্জন্মের বীজ নিহিত থাকে।

(২) **শৈবমতে**—(১) বাহ্য কোনো বস্তুর উপর নির্ভর না করা, (২) পবিত্র দেহ ধারণ করা, (৩) অস্পৃষ্ট বুদ্ধির অধিকারী হওয়া, (৪) সর্ব্বজ্ঞতা, (৫) অনায়াসে সকল সীমা অতিক্রম করা, (৬) অসীম দয়া, (৭) সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং (৮) অসীম আনন্দ।

জৈনমতে—(১) অসীম জ্ঞান, (২) অসীম দৃষ্টি, (৩) অসীম ক্রিয়াশীলতা, (৪) অসীম আনন্দ, (৫) অবর্ণনীয়তা (৬) অনাদিত্ব, (৭) অকালত্ব এবং (৮) অমরতা।

(৩) যেমন অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেঘ-স্তুতি

১। যাহার সময়ের ভুল হয় না, এমন বর্ষাদ্বারাই ধরিত্রী আপনাকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং এই জন্যই বৃষ্টিকে লোকে দেবভোগ্য অমৃত বলে।

২। যত প্রকার সুস্বাদ খাদ্য দ্রব্য আছে, বৃষ্টি হইতেই মনুষ্য তাহার অধিকারী হয়; এবং স্বয়ং বৃষ্টিও খাদ্যের একটী অংশ।

৩। যদি জল-বর্ষণ না হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী চতুর্দ্দিকে সমুদ্র-বেষ্টিত থাকিয়াও দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পতিত হইবে।

৪। যদি স্বর্গের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কৃষকেরা হল-চালনাই ত্যাগ করিবে।

৫। বর্ষাই নষ্ট করে, এবং আবার বর্ষাই নষ্ট লোককে পুনঃ সমৃদ্ধ করে।

৬। যদি আকাশের জলধারা বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তৃণোদ্‌গম পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

৭। যদি স্বর্গ-লোক সমুদ্রের জলপান করিতে এবং পুনরায় তাহা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে

সমুদ্র শক্তিশালী হইয়াও কুৎসিত বিভৎসতার দারুণ প্রকোপে অভিভূত হইবে। (১)

৮। যদি স্বর্গের জল শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে দেবতাগণকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত যাগ-যজ্ঞও হইবে না, এবং পৃথিবীতে ভোজ দেওয়াও চলিবে না। (২)

৯। যদি স্বর্গ হইতে জলধারা প্রবাহিত না হয়, তবে সমগ্র পৃথিবীতে দানও থাকিবে না, তপও থাকিবে না। (৩)

১০। জল ব্যতীত সংসারের কোনো কাজ চলিতে পারে না, সেইজন্য, এমন কি, সদাচারও বর্ষার আশ্রিত।

(১) ইহার ভাবার্থ এই যে, সমুদ্র বর্ষার কারণ হইলেও, উহারও বর্ষার প্রয়োজন আছে। যদি বর্ষা না হয়, তাহা হইলে সমুদ্রে মলিনতা উৎপন্ন-হইবে, জলচরগণের কষ্ট হইবে এবং মুক্তা উৎপন্ন হইবে না।

(২) সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবে।

(৩) তপ সন্ন্যাসিগণের জন্য এবং দান গৃহস্থদের জন্য। তপের অর্থ আত্মদমন ও কৃচ্ছ্র সাধন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংসার-ত্যাগী পুরুষদের মহিমা

১। দেখ, যে সকল লোক সব (ইন্দ্রিয়-সুখ) ত্যাগ করিয়া তাপস জীবন অতিবাহিত করে, শাস্ত্রে অন্য সকল লোকাপেক্ষা তাহাদের মহিমা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

২। তুমি তপস্বিগণের মহিমার পরিমাণ করিতে অক্ষম। মৃত ব্যক্তিদের গণনা করা যেরূপ কঠিন, এ কাজও সেইরূপ কঠিন।

৩। দেখ, যাহারা পরলোকের সহিত ইহলোকের তুলনা করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মহিমা দ্বারা এই পৃথিবী দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

৪। দেখ, যে ব্যক্তি নিজ সুদৃঢ় ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা নিজ পাঁচটী ইন্দ্রিয় সেইরূপ সংযত করিয়াছে, যেরূপ অঙ্কুশ দ্বারা গজকে বশে রাখা হয়, সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক স্বর্গের ক্ষেত্রে বপন-যোগ্য বীজ।

৫। যে সকল সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তুমি কি তাঁহাদের শক্তির পরিচয় পাইতে ইচ্ছা কর? দেবরাজ ইন্দ্রের উদাহরণই যথেষ্ট। (১)

---

(১) গৌতম ও অহল্যার উপাখ্যান স্মরণ করুন।

৬। যাঁহারা অসম্ভব (২) কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন তাঁহারাই মহাপুরুষ, এবং যাহারা সেরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহারাই দুর্ব্বল মনুষ্য।

৭। দেখ, যে মনুষ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়-বিষয়ের যথোচিত মূল্য বুঝিতে পারে, (৩) সেই সংসারের উপর শাসন করিবে।

৮। সংসারের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সত্যবক্তা মহাত্মাদের মহিমার ঘোষণা করিয়াছে।

৯। ত্যাগের শিলা-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান মহাপুরুষদিগের ক্রোধ ক্ষণমাত্রও সহ্য করা যায় না।

১০। ত্যাগী পুরুষদিগকেই ব্রাহ্মণ বলা উচিত। তাঁহারাই সব প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।

(২) ইন্দ্রিয় দমন।

(৩) ইন্দ্রিয়গণ কেবল ক্ষণিক সুখ উৎপন্ন করে এবং মনুষ্যকে বিপথে লইয়া যায়, ইহা জানিয়া যে তাহাদের প্রভাবে পড়ে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের মহিমা বর্ণন

১। ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যের মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, এবং উহা হইতে ধন প্রাপ্তিও হয়; তবে বল দেখি ধর্ম্মাপেক্ষা অধিক লাভদায়ক অন্য বস্তু কি আছে?

২। ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় শুভ নাই, এবং তাহা হারান অপেক্ষা অধিক হানিকর দ্বিতীয় অশুভ নাই।

৩। তুমি নিয়ত সৎকর্ম্মে লাগিয়া থাকিও, নিজ পূর্ণ শক্তিতে ও পূর্ণ উৎসাহে তাহা সম্পন্ন করিতে থাকিও।

৪। নিজ মন পবিত্র রাখিও—সকল ধর্ম্মের সার মর্ম্ম এই উপদেশের অন্তর্গত। অবশিষ্ট আর সব কথা কিছুই নহে—আড়ম্বর মাত্র।

৫। ঈর্ষ্যা, লোভ, ক্রোধ ও অপ্রিয় বচন—এই সকল বিষয় হইতে দূরে থাকিও। ধর্ম্মলাভের ইহাই মার্গ।

৬। তুমি ধীরে ধীরে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিবে ভাবিও না। বিলম্ব না করিয়াই ভাল কাজে প্রবৃত্ত হও; কারণ যে বস্তু মৃত্যুর দিন অমর মিত্র হইয়া তোমার সঙ্গী হইবে সেই বস্তুই ধর্ম্ম।

৭। আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না ধর্ম্ম হইতে কি লাভ

হয়। কেবল শিবিকার বাহকগণকে ও তাহার ভিতরের আরোহীকে দেখিয়া লও। (১)

৮। যদি তুমি একটী দিনও বৃথা নষ্ট না করিয়া সমস্ত জীবন ভাল কাজ করিতে থাক, তবে এইরূপেই তোমার ভবিষ্য জন্ম-পরম্পরার পথ রুদ্ধ হইবে।

৯। কেবল ধর্ম্ম-জনিত সুখই যথার্থ সুখ। অবশিষ্ট সকলই (২) তো পীড়া ও লজ্জা মাত্র।

১০। যে বিষয় ধর্ম্ম-সঙ্গত তাহাই করণীয়, অন্যান্য সকল কার্য্যই জ্ঞানীদিগের মতের বিরুদ্ধ—তাহা হইতে দূরে থাকা উচিত।

(১) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহারা সাধু আচরণ করিয়াছে তাহারা তাহার ফলে শিবিকারোহী হয়, এবং যাহারা অসাধু আচরণ করিয়াছে, তাহারই বাহক হয়।

(২) ধন, বৈভব ইত্যাদি।

ধর্ম্ম

প্রথম ভাগ

ধর্ম্ম

প্রথম খণ্ড

গৃহস্থ আশ্রম

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক জীবন

১। গৃহস্থাশ্রমস্থ মনুষ্য অপর তিনটী আশ্রমের প্রমুখ আশ্রয়। (১)

২। গৃহস্থগণ মৃত পিতৃপুরুষদের (২) সুহৃদ, দরিদ্রের আশ্রয় এবং সংসার ত্যাগী ব্যক্তিগণের সহায়।

৩। মৃত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা, দেবতাদিগের উদ্দেশে বলি দেওয়া, অতিথি সৎকার করা, বন্ধুবান্ধবের সাহায্য করা এবং আত্মোন্নতি করা—এই পাঁচটী গৃহস্থের কর্ম্ম।

৪। যে পুরুষ মন্দ কর্ম্মকে ভয় করে এবং ভোজন

---

(১) ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

(২) পূর্ব্বপুরুষগণের দেহমুক্ত আত্মার সুহৃদ্,—কারণ গৃহস্থগণ তাহাদের শ্রাদ্ধ তর্পণ করে।

করিবার পূর্ব্বে দান করে, তাহার বংশ কখনো লুপ্ত হয় না।

৫। যে গৃহে স্নেহ ও পুণ্যের নিবাস, যাহাতে ধর্ম্মের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্তোষ পূর্ণরূপে বিরাজ করে, তাহার সকল উদ্দেশ্য সফল হয়।

৬। যদি মনুষ্য গৃহস্থ-ধর্ম্ম যথাযথভাবে পালন করে, তাহা হইলে অপর ধর্ম্মের আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন কি ?

৭। মুমুক্ষুগণের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ, যাহারা ধর্ম্মানুকূল গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করে।

৮। দেখ, যে গৃহস্থ অপর লোকের কর্ত্তব্য-পালনে সাহায্য করে এবং নিজেও ধর্ম্ম-জীবন অতিবাহিত করে, সে ব্রত-উপবাসকারী ঋষিদের অপেক্ষাও অধিক পবিত্র।

৯। বিবাহিত জীবনের সহিত সদাচার ও ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ, সুযশ উপহার ভূষণ। (৩)

১০। যে গৃহস্থ কর্ত্তব্যানুযায়ী আচরণ করে, সে মনুষ্য-মধ্যে দেবতা বলিয়া গণ্য হয়।

---

(৩) গার্হস্থ্যজীবনই যথার্থ ধর্ম্ম-জীবন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সহধর্ম্মিণী

১। যাহার মধ্যে সুপত্নীত্বের সকল গুণ বর্ত্তমান এবং যে নারী পতির সামর্থ্যের অধিক ব্যয় করে না, সেই সাধ্বী সহধর্ম্মিণী। (১)

২। স্ত্রী যদি স্ত্রীত্ব-গুণ-বিহীনা হয়, তাহা হইলে অন্য সকল শ্রেষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও গার্হস্থ্য জীবন ব্যর্থ।

৩। যদি কেহ সুযোগ্যা স্ত্রী পায়, তবে এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা তাহার হস্তগত হয় নাই? আর স্ত্রীতে যদি যোগ্যতা না থাকে, তবে তাহার কাছে আছে কি? (২)

---

(১) সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥

(২) স্ত্রী সুযোগ্যা হইলে দারিদ্র্যের দুঃখ অনুভূত হয় না, এবং স্ত্রীতে যদি যোগ্যতা না থাকে, তবে বৈভব বৃথা।

Of all the blessings in this world
the best is a good wife,
And a bad one is the bitterest
curse of human life.

৪। স্ত্রীলোক যদি সতীত্বের শক্তিদ্বারা রক্ষিতা থাকে, তবে তাহার নিকট তদপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল কোন্ বস্তু থাকিতে পারে ?

৫। দেখ, যে স্ত্রী অন্য দেবতার পূজা না করিয়া শয্যা-ত্যাগ করিবামাত্র স্বীয় পতি-দেবতার পূজায় নিযুক্ত হয়, জলপূর্ণ মেঘও তাহার আজ্ঞা পালন করে।

৬। সেই উত্তম সহধর্ম্মিণী যে নিজ ধর্ম্ম ও নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করে, এবং ভক্তির সহিত নিজ পতির আরাধনা করে।

৭। চারিটী প্রাচীরের মধ্যে নিভৃত বাসে লাভ কি ? ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই নারীর ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম রক্ষক।

৮। যে নারী নিজ পতির আরাধনা করে, দেবলোকে তাহার স্থান উচ্চ।

৯। যে ব্যক্তির গৃহ হইতে সুযশ বিকীর্ণ হয় না, সে শত্রুর সম্মুখে মস্তক উত্তোলন করিয়া সিংহ-গতিতে চলিতে অক্ষম।

১০। সুসম্মানিত পবিত্র গৃহই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বর, এবং সুযোগ্য সন্ততি তাহার মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্ততি

১। বুদ্ধিমান্ সন্ততি উৎপন্ন হওয়া অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্য আমার জানা নাই।

২। সেই ব্যক্তি ধন্য যাহার সন্তানগণের আচরণ নিষ্কলঙ্ক। সাত জন্ম পর্য্যন্ত তাহাকে কোন অশুভ স্পর্শ করিতে পারে না।

৩। সন্ততিই মনুষ্যের যথার্থ সম্পত্তি ; কেন না, তাহারা তাহাকে নিজ কর্ম্ম-সঞ্চিত পুণ্য অর্পণ করে।

৪। নিঃসন্দেহ, (পিতার সঙ্গে আহারে বসিয়া) নিজ শিশু সন্তানেরা ছোট ছোট হাত দিয়া যে ঝোল ঘাঁটিয়া দেয়, তাহা অমৃতাপেক্ষা সুস্বাদু।

৫। শিশু সন্তানের স্পর্শে শরীরের সুখ, কথা শ্রবণে কর্ণের সুখ।

৬। বংশীর স্বর প্রিয় এবং বীণার ধ্বনি মধুর এ কথা তাহারাই বলে, যাহারা নিজ শিশু সন্তানের অর্দ্ধ-স্ফুট বাক্য শ্রবণ করে নাই।

৭। পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য এই যে তিনি তাহাকে যেন সভার প্রথম পংক্তিতে বসিবার যোগ্য করিয়া দেন।

৮। সন্তানকে আপনা অপেক্ষা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ দেখিলে সকল পিতারই মনে সুখ হয়।

৯। যখন গর্ভ হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তখন মাতার মনে আনন্দের ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু যখন অন্য লোকের মুখে সন্তানের প্রশংসা শুনেন, তখন তাঁহার তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হয়।

১০। পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য কি? তাহা এই যে, পৃথিবীর লোকে তাহাকে দেখিয়া, তাহার পিতাকে যেন জিজ্ঞাসা করে,—কোন্ তপস্যার বলে তুমি এইরূপ পুত্র লাভ করিয়াছ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেম

১। এমন কোন্ অর্গল আছে যাহা প্রেমের দ্বার রুদ্ধ করিতে পারে? প্রেমিকের চক্ষুর স্থলিত অশ্রু-বিন্দু উহার অস্তিত্বের ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারে না।

২। যাহারা প্রেম করে না, তাহারা নিজের জন্যই জীবিত থাকে, কিন্তু যাহারা অপরকে ভালবাসে, তাহাদের অস্থিও অপরের কাজে লাগে।

৩। কথিত হয় যে প্রেমের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই আত্মা পুনর্ব্বার অস্থি-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইয়াছেন।

৪। প্রেমের দ্বারা সকলের প্রতি হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া উঠে, এবং সেই স্নেহশীলতা হইতেই মিত্রতারূপী বহুমূল্য রত্ন উৎপন্ন হয়।

৫। লোকে বলে, ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্র, ভাগ্যবানের সৌভাগ্য তাহার অতীতের নিরন্তর প্রেমের পারিতোষিক।

৬। যাহারা বলে যে কেবল ধার্ম্মিক লোকেরই প্রেমে অধিকার আছে তাহারা মূর্খ; কেননা মন্দ লোকের

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইলেও প্রেমই মনুষ্যের একমাত্র সহায়। (১)

৭। দেখ, অস্থিহীন কীটকে সূর্য্য কিরূপে দগ্ধ করে। যে প্রেম করে না তাহাকে সাধুতা সেইরূপে দগ্ধ করে।

৮। যে মনুষ্য প্রেম করে না, সে তখনই ফল-পুষ্পযুক্ত হইবে, যখন মরুভূমির শুষ্ক স্থানুতে পল্লব নির্গত হইবে।

৯। আত্মার ভূষণ স্বরূপ প্রেম যদি হৃদয়কে সুন্দর না করে, তবে বাহ্য-সৌন্দর্য্যে লাভ কি ?

১০। প্রেমই জীবনের আবাসস্থান। যে মনুষ্যে প্রেম নাই সে কেবল মাংসাবৃত অস্থি-স্তূপ। (২)

(১) কেবল ভাল লোকদেরই সহিত প্রেমময় ব্যবহার করা উচিত, এ সিদ্ধান্তঠিক নয়। মন্দ লোকের সহিতও প্রেমের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কেন না মন্দকে ভাল, এবং শত্রুকে মিত্র, করিবার জন্য প্রেমাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী রসায়ন আর নাই।

(২) যে হৃদয়ে প্রেম নাই, তাহা শ্মশান সদৃশ।

নবম পরিচ্ছেদ

আতিথ্য

১। বুদ্ধিমানেরা এত পরিশ্রম করিয়া গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন কেন ? অতিথিকে আহার দিবার এবং পথিককে সাহায্য করিবার জন্য।

২। যখন বাটীতে অতিথি আসিয়াছে, তখন অমৃতও একলা আস্বাদন করা উচিত নয়।

৩। যে ব্যক্তি অভ্যাগত অতিথির আদর অভ্যর্থনা করিতে কখনও অমনোযোগী হয় না, তাহার উপর কখনো কোনো আপদ আসে না।

৪। দেখ, যে ব্যক্তি প্রসন্ন চিত্তে যোগ্য অতিথির অভ্যর্থনা করে, তাহার গৃহে লক্ষ্মী আনন্দে অবস্থান করেন।

৫। দেখ, যে ব্যক্তি অতিথিকে প্রথমে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পরে নিজে আহার করে, তাহার কি আর ক্ষেত্র বপন করিবার প্রয়োজন হয় ?

৬। দেখ, যে ব্যক্তি গমনোন্মুখ অতিথির সেবা সম্পন্ন করিয়া আগন্তুক অতিথির প্রতীক্ষা করে, সে দেবতাদিগের সুপ্রিয় অতিথি হয়।

৭। অতিথি সেবার এত গুণ যে, তাহা বর্ণনা

করা আমাদের অসাধ্য। অতিথি-যজ্ঞের মহত্ত্ব অতিথির যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

৮। দেখ, যে বক্তি অতিথি-যজ্ঞ করে না, সে একদিন বলিবে—আমি পরিশ্রম করিয়া এত ধন সঞ্চয় করিয়াছি, কিন্তু, হায়, তাহা বৃথা হইল, কারণ তাহা দ্বারা আমকে শান্তি দিবার কেহ নাই।

৯। ধন ও বৈভব থাকিতেও যে ব্যক্তি পথিকের আদর অভ্যর্থনা করে না, সে দরিদ্র। কেবল মূর্খেরাই এইরূপ করিয়া থাকে।

১০। আঘ্রাণ করিবার পর অনিচ পুষ্প শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু অতিথির হৃদয় ভগ্ন করিবার নিমিত্ত একটী মাত্র দৃষ্টিই যথেষ্ট।

দশম পরিচ্ছেদ

মৃদু ভাষণ

১। সাধু পুরুষদের বাক্য সত্য সত্যই প্রীতিকর হইয়া থাকে, কারণ উহা সদয়, কোমল ও অকৃত্রিম।

২। উদার দান অপেক্ষাও কথার মাধুর্য্য, দৃষ্টির স্নিগ্ধতা ও ব্যবহারের স্নেহপূর্ণতা অধিক গুণবিশিষ্ট।

৩। হৃদয়োত্থিত মধুর বাক্য ও মমতাপূর্ণ কোমল দৃষ্টির মধ্যেই সাধুতার আবাস।

৪। দেখ, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এমন বাক্য বলে যাহা সকলের হৃদয়ে আনন্দ দান করে, তাহার নিকট দুঃখাভিবর্দ্ধক দারিদ্র্য কখনো উপস্থিত হয় না।

৫। নম্রতা ও স্নেহার্দ্র সম্ভাষণই মনুষ্যের ভূষণ, অন্য কিছু নয়।

৬। যদি তোমার চিন্তা শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, এবং তোমার বাক্যে সহৃদয়তা থাকে, তাহা হইলে তোমার পাপপ্রবৃত্তির ক্ষয় এবং সাধুতার বৃদ্ধি হইবে।

৭। সেবা-ভাব-প্রকাশক বিনম্র বচন হইতে মিত্রতা উৎপন্ন হয় এবং এতদ্ব্যতীত অনেক লাভ হয়।

৮। যে সকল শব্দ সহৃদয়তাপূর্ণ এবং ক্ষুদ্রতাশূন্য, তাহা ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই লাভদায়ক।

৯। শ্রুতিপ্রিয় শব্দ মধ্যে মাধুর্য্য আছে, ইহা অনুভব করিবার পরেও লোকে কঠোর শব্দের ব্যবহার কেন পরিত্যাগ করে না ?

১০। মিষ্ট শব্দ থাকিতেও যাহারা কঠোর শব্দের প্রয়োগ করে, তাহারা যেন সুপক্ক ফল ত্যাগ করিয়া অপক্ক ফল খাইতে ভালবাসে। (১)

(১) মিষ্ট শব্দদ্বারা কাজ চলে দেখিয়াও যে ব্যক্তি কঠোর শব্দের ব্যবহার করে, সে যেন পাকা ফল অপেক্ষা কাঁচা ফল অধিক পছন্দ করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কৃতজ্ঞতা

১। আমি উপকার করিতেছি—এইরূপ ভাব-রহিত যে দয়া, স্বর্গ ও মর্ত্ত একত্রিত হইয়াও তাহার প্রতিদান করিতে পারে না।

২। প্রয়োজনের সময় যে উপকার করা হয়, তাহা দেখিতে সামান্য হইলেও পৃথিবী অপেক্ষা ভারী।

৩। প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া যে উপকার করা হয় তাহা সমুদ্রাপেক্ষা মূল্যবান্।

৪। কাহারও নিকট প্রাপ্ত উপকার সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র হইলেও বিবেচকের গণনায় তাহা তালবৃক্ষের সমান।

৫। কৃতজ্ঞতার পরিমাণ কৃত-উপকারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। তাহা উপকৃত ব্যক্তির মহত্ত্বের উপর বিলম্বিত।

৬। মহাত্মাদের মিত্রতার অবহেলা করিও না। যাহারা অসময়ে তোমার সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিও না।

৭। যে ব্যক্তি কাহাকেও প্রয়োজনের সময় কষ্ট হইতে উদ্ধার করে, জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত তাহার নাম কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

৮। উপকার বিস্মৃত হওয়া নীচতার কর্ম্ম, কিন্তু যদি কেহ উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই বিস্মৃত হওয়া মহত্ত্বের পরিচায়ক। (১)

৯। অপকারী ব্যক্তি এক সময় কোনো উপকার করিয়াছে একথা যদি মনে উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার আঘাতের অতি দারুণ ব্যথাও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১০। অন্যান্য দোষে কলঙ্কিত ব্যক্তির উদ্ধার সম্ভব, কিন্তু হতভাগ্য অকৃতজ্ঞের উদ্ধার নাই।

---

(১) অপকারিষু যঃ সাধুঃ, স সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সততা ও ন্যায়-পরায়ণতা

১। যদি কোনো ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে ন্যায়পূর্ব্বক মিত্র বা শত্রুর বা অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায্য প্রাপ্য মিটাইয়া দেয়, তাহাই তাহার সাধুতার সার, আর কিছুই নহে।

২। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সৌভাগ্য কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তাহা পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে।

৩। সততা ত্যাগ করিয়া যদি ধন পাওয়া যায়, তাহাতে লাভ ব্যতীত অন্য কিছুর সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাহা কখনো স্পর্শ করিও না।

৪। সাধু ও অসাধুর পরিচয় তাহাদের সন্তানগণ হইতে পাওয়া যায়।

৫। শুভ ও অশুভ সকল লোকের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকট ন্যায়-নিষ্ঠ চিত্তই গৌরবের বস্তু। (১)

(১) নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎপথঃ প্রবিচলন্তি পদংন ধীরাঃ॥

ভর্তৃহরি নীঃ শঃ ৮৪।

৬। যখন তোমার মন সাধুতা ত্যাগ করিয়া অসাধুতার দিকে চালিত হইবে, তখন বুঝিও যে, সর্ব্বনাশ তোমার নিকটবর্ত্তী।

৭। ন্যায়নিষ্ঠ ও সাধু ব্যক্তির দারিদ্র্যকে সংসার হেয় দৃষ্টিতে দেখে না।

৮। ঐ সমান-ভার-বিশিষ্ট মানদণ্ডটী দেখ। উহা সরল, অতএব উভয় দিকে সম-ভার-বিশিষ্ট। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরূপে নির্ম্মিত যে, তাঁহারা মানদণ্ডের ন্যায় এদিকেও ঝোঁকেন না, ওদিকেও ঝোঁকেন না। এই কারণেই তাঁহাদের গৌরব।

৯। যিনি কল্পনাতেও সাধুতা হইতে বিচ্যুত হন না, তাঁহার সত্যপরায়ণ ওষ্ঠ হইতে নির্গত কথা সব সময়েই সত্য হয়।

১০। ঐ ব্যবসায়ী লোকটীকে দেখ। সে পরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া বিবেচনা করে। ব্যবসায়ে তাহার নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আত্ম-সংযম

১। আত্ম-সংযম দ্বারা স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়, কিন্তু অসংযত ইন্দ্রিয়-লিপ্সা নরকের পথ প্রশস্ত করে।

২। আত্ম-সংযমকে স্বীয় ধনাগারের ন্যায় রক্ষা করিও। এই পৃথিবীতে উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বস্তু জীবনের অধিকারে নাই।

৩। যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় বস্তুর মূল্য বুঝিয়া-সুঝিয়া স্বীয় ইচ্ছার দমন দরে, সে জ্ঞান ও অপরাপর উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করিবে।

৪। যে স্বীয় ইচ্ছাকে দমন করিয়াছে এবং স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হয় নাই, তাহার আকৃতি পর্ব্বতা-পেক্ষাও অধিক প্রভাবশালী।

৫। নম্রতা সকলেরই শোভা-বর্দ্ধক, কিন্তু উহার ঔজ্জ্বল্য ধনবানেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

৬। যেরূপ কচ্ছপ তাহার হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া নিজ শরীর মধ্যে লুকাইয়া রাখে, সেইরূপ যে ব্যক্তি নিজ

ইন্দ্রিয়-সমূহকে নিজের মধ্যে টানিয়া রাখে, সে নিজ ভবিষ্যৎ জন্মসমূহের জন্য ধন সঞ্চিত করিয়া রাখে। (১)

৭। তুমি অন্য কাহাকেও দমনে রাখ বা না রাখ, কিন্তু তোমার জিহ্বাকে রশ্মি-সংযুক্ত করিয়া রাখিও, কারণ, রশ্মিহীন জিহ্বা বহু দুঃখের আকর।

৮। যদি তোমার একটী কথার দ্বারাও কাহারও পীড়া জন্মে, তাহা হইলে তোমার সমস্ত সাধুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে মনে করিও।

৯। অগ্নি-দাহ-জনিত ক্ষত কালক্রমে নিরাময় হইয়া যায়, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা উৎপন্ন ক্ষত চিরকাল নূতন থাকে।

১০। যে ব্যক্তি জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে এবং মনকে সম্পূর্ণ শান্ত ও বশীভূত রাখিয়াছে, তাহাকে দেখ। এরূপ ব্যক্তির দর্শনের নিমিত্তই ধার্ম্মিকতা ও সাধুতা তাহার আলয়ে উপস্থিত হয়।

---

(১) তুলনা কর গীতা ২।৫৮—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সদাচার

১। যে ব্যক্তির আচার পবিত্র, সকলেই তাহার সম্মান করে। অতএব সদাচারকে প্রাণাপেক্ষা মহৎ বলিয়া জানিবে। (১)

২। নিজ আচরণের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে, কেন না তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে অন্বেষণ কর, সদাচারাপেক্ষা প্রকৃত সহায় কোথাও পাইবে না।

৩। সদাচার সম্মানিত বংশের পরিচায়ক, কিন্তু কদাচার মনুষ্যকে নীচশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করায়।

৪। বেদও বিস্মৃত হইয়া গেলে পুনরায় অভ্যাস করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মনুষ্য যদি একবার সদাচার হইতে স্খলিত হয়, তাহা হইলে চির কালের জন্য নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

৫। সুখ-সমৃদ্ধি ঈর্ষ্যাকারীর জন্য নয়। ঠিক সেই রূপে গৌরবও দুরাচারিগণের জন্য নয়।

৬। যাহারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাহারা সদাচার হইতে

(১) বরং বিন্ধাটব্যামনশণতৃষার্ত্তস্য মরণম্। ন শীলাদ্‌বিভ্রংশো ভবতু কুলজস্য শ্রুতবত ঃ॥

স্খলিত হয় না, কারণ এইরূপ স্খলন হইতে কত আপদ্ আসিয়া পড়ে, তাহা তাহারা জানে।

৭। মনুষ্য-সমাজে সদাচারী পুরুষের সম্মান হয়, কিন্তু যাহারা উন্মার্গগামী, তাহাদের ভাগ্যে দুর্নাম ও অসম্মান হয়।

৮। সদাচার সুখ-সম্পদের বীজ বপন করে, কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তি অসীম আপদের জননী। (২)

৯। অশ্লীল ও অপবিত্র শব্দ ভদ্রলোকের মুখ হইতে অসতর্ক অবস্থাতেও বহির্গত হয় না।

১০। মূর্খ ব্যক্তি আর যাহা ইচ্ছা তাহা শিখিতে পারে, কিন্তু সে সদা সন্মার্গে থাকিবার শিক্ষা কখনো গ্রহণ করিতে পারে না।

---

(২) जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना।
जहाँ कुमति तहँ बिपति निधाना॥—तुलसीदास

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা-পরিহার

১। যাহাদের দৃষ্টি ধন ও ধর্ম্মের উপর থাকে, তাহারা পরস্ত্রীর আকাঙ্ক্ষারূপ মূর্খতা করে না।

২। যাহারা ধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে প্রতিবাসীর দ্বার-দেশে গমনাগমন করে, তদপেক্ষা অধিক মূর্খ আর কেহ নাই।

৩। নিঃশঙ্ক মিত্রের গৃহে যাহারা দ্রোহ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইয়াছে।

৪। মনুষ্য যতই বড় হউক না কেন, তাহার বড় হওয়া কি কাজের, যদি সে ব্যাভিচার-জনিত লজ্জার তিল মাত্র চিন্তা না করিয়া পরস্ত্রী-গমন করে? (১)

৫। যে পুরুষ সুযোগ পাইয়া নিজ প্রতিবাসীর স্ত্রীকে গল-লগ্ন করে, সে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইল জানিও।

৬। যে ব্যাভিচারী, সে এই চারিটী বস্তু হইতে নিষ্কৃতি পায় না—ঘৃণা, পাপ, ভয় ও কলঙ্ক।

---

(१) **परनारी पैनी छुरी, मत कोई लावो अंग।**
रावनके दस सिर कटे, परनारीके संग॥ —कबीर

৭। যে নিজ প্রতিবাসীর স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, সেই সদ্গৃহস্থ।

৮। যে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করে না, তাহার মনুষ্যত্ব ধন্য। সে কেবল সৎ ও ধর্ম্মাত্মা নহে, সে সাধু।

৯। পৃথিবীর সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তুতে কাহার অধিকার? যে পরস্ত্রীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে না।

১০। তুমি যত অপরাধ ও পাপ কর না কেন, প্রতিবাসীর স্ত্রীর অভিলাষ না করা, তোমার সকল কর্ত্তব্যের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এই ত্যাগ হইতে তুমি যশের অধিকারী হইবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ক্ষমা

১। ধরিত্রীকে তাঁহার কুক্ষী পর্য্যন্ত খনন করিলেও, তিনি খননকারীদিগকে আশ্রয় দেন, অতএব যাহারা তোমাকে পীড়া দেয়, তুমিও তাহাদের উৎপাত সহ্য করিও।

২। যাহারা তোমাকে ক্লেশ দেয়, তৎপরিবর্ত্তে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিও; যদি তুমি তাহা ভুলিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

৩। অতিথি-সৎকারে বিমুখ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দারিদ্র্যের পরিচায়ক; এবং মূর্খদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা সহ্য করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্বের পরিচায়ক।

৪। যদি তুমি চিরকাল গৌরবে থাকিতে চাহ, তাহা হইলে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিবার অভ্যাস করিও।

৫। যাহারা অনিষ্টের প্রতিশোধ লয়, বুদ্ধিমানেরা তাহাদের সম্মান করে না; কিন্তু যাহারা শত্রুকে ক্ষমা করে, তাহারা স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান বিবেচিত হয়।

৬। প্রতিশোধের আনন্দ একদিন মাত্র স্থায়ী, কিন্তু ক্ষমার গৌরব চিরস্থায়ী।

৭। ক্ষতির পরিমাণ যতই অধিক হউক না কেন, তাহা গ্রাহ্য না করা এবং তাহার প্রতিশোধ না লওয়াই মহত্ত্ব।

৮। দম্ভে স্ফীত হইয়া যে তোমাকে পীড়া দিয়াছে, তোমার নিরীহতা দ্বারা তুমি তাহাকে জয় করিও।

৯। যে তোমার নিন্দাকারী, তাহার কটু বাক্য যদি তুমি সহ্য করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে তুমি সংসার-ত্যাগী পুরুষাপেক্ষাও অধিক সাধু।

১০। যাঁহারা অনাহারে তপশ্চর্য্যা করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ মহৎ, কিন্তু তাঁহাদের পদ সেই সকল ব্যক্তির ঠিক নিম্নে, যাঁহারা নিজের নিন্দাকারীকে ক্ষমা করেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ঈর্ষ্যা

১। যখন দেখিবে যে তোমার মন ঈর্ষ্যার ভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তখন জানিবে যে ধর্ম্মে তোমার মতি হইতেছে।

২। ঈর্ষ্যা-বর্জ্জিত স্বভাবের সমান কোনো শ্রেষ্ঠ লাভ আর নাই।

৩। যে ব্যক্তি ধন বা ধর্ম্ম গ্রাহ্য করে না, সেই প্রতিবাসীর সমৃদ্ধিতে হর্ষান্বিত না হইয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয়।

৪। ঈর্ষ্যা হইতে অনিষ্ট উৎপন্ন হয় জানিয়াই বুদ্ধিমানেরা ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া অপরের হানি করেন না।

৫। ঈর্ষ্যাকারীর পক্ষে ঈর্ষ্যাই যথেষ্ট দুর্ভাগ্য, কারণ শত্রুরা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও ঈর্ষ্যাই তাহার সর্ব্বনাশ করিবে।

৬। কাহাকেও কিছু দেওয়া হইতেছে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে পারে না, তাহার স্ত্রী-পুত্র অন্ন-বস্ত্রের জন্য হাহাকার করিবে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

৭। ঈর্ষ্যাকারীর নিকট লক্ষ্মী থাকিতে পারেন না। তিনি তাহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর (দারিদ্র্যের) নিকট রাখিয়া চলিয়া যান।

৮। দুষ্টা ঈর্ষ্যা দারিদ্র্যকে আহ্বান করে, এবং মনুষ্যকে নরকের দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া যায়।

৯। ঈর্ষ্যাকারী ব্যক্তির সমৃদ্ধি, ও উদারচেতা ব্যক্তির দারিদ্র্য উভয়ই তুল্য বিস্ময়কর।

১০। ঈর্ষ্যা কখনো সম্পদ্ প্রসব করে নাই, এবং উদার-চিত্ত কখনো সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নির্লোভ

১। যে ব্যক্তি সৎপথ ত্যাগ করিয়া অপরের সম্পত্তি গ্রহণের অভিলাষী, তাহার দুর্ব্বৃত্ততার বৃদ্ধি হইতেই থাকিবে, এবং তাহার পরিবারবর্গের হ্রাস হইবে।

২। যে সকল ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকে, তাহারা লোভের বশবর্ত্তী হয় না, এবং দুষ্কর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্তি থাকে না।

৩। দেখ, যে সকল লোক অন্যরূপ সুখের অভিলাষী, তাহারা সামান্য সুখের লোভ করে না, এবং মন্দ কর্ম্ম হইতেও বিরত থাকে।

৪। যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে নিজ বশে রাখিয়াছে, এবং যাহাদের মনোভাব উদার, তাহারা "এই বস্তু আমার প্রয়োজনীয়" বলিয়া অপরের দ্রব্যের কামনা করে না।

৫। যে মন লোভে আবদ্ধ হয়, এবং অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, তাহার বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী হওয়ায় লাভ কি?

৬। যাহারা যশের আকাঙ্ক্ষী ও সরল-পথগামী, তাহারা যদি কখনো ধনের লোভে পড়িয়া কোনো কুচক্র রচনা করে, তাহারাও নষ্ট হইয়া যাইবে।

৭। ধনলিপ্সা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অর্থ সঞ্চয়ের কামনা করিও না, কারণ ভোগ করিবার সময় তাহার ফল কটু লাগিবে।

৮। যদি তোমার সম্পত্তির হ্রাস হওয়ার ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তোমার প্রতিবাসীর ধন-বৈভব গ্রাস করিবার কামনা করিও না।

৯। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ ও ন্যায় আচরণ কাহাকে বলে বোঝে, এবং অপরের দ্রব্য লইতে আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহার শ্রেষ্ঠতা জানিয়া লক্ষ্মী তাহাকে অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহার দ্বারে উপস্থিত হন।

১০। অদূরদর্শী লালসা নাশের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু যে মহত্ত্ব "আমি চাহি না" বলিতে জানে, সেই সর্ব্ব-বিজয়ী হয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পৈশুন্য (ঠক লাগান)

১। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসৎ কর্ম্ম করে, এবং সৎকর্ম্মের নামও লয় না, তাহারও মন প্রসন্ন হয় যখন কেহ বলে "দেখ, ঐ ব্যক্তি কথা-লাগালাগী করে না।"

২। সাধুতা হইতে বিমুখ হওয়া এবং দুরাচার করা নিঃসন্দেহ মন্দ; কিন্তু প্রত্যক্ষে হাসিয়া কথা কহা ও পশ্চাতে নিন্দা করা, তদপেক্ষাও মন্দ।

৩। মিথ্যা ও নিন্দা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাওয়াও ভাল, কারণ এ প্রকারে মরিলে সাধুতার ফল পাওয়া যায়।

৪। কেহ তোমার মুখের উপর তোমাকে গালি দিলেও তাহার পশ্চাতে তাহার নিন্দা করিও না।

৫। মুখে কেহ যতই সদালাপ করুক না কেন, তাহার পিশুন জিহ্বা তাহার নীচতা প্রকাশ করিবেই করিবে।

৬। যদি তুমি অপর কোনো ব্যক্তির নিন্দা কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তোমার দোষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া, তন্মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ, তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে।

৭। যাহারা অপরের গ্লানিতে আনন্দ বোধ করে, তাহারা বন্ধু অর্জ্জন করিবার মধুর কৌশল জানে না। তাহারা মিত্রদের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

৮। যাহারা প্রকাশ্যে আপনাদের মিত্রদের দোষের চর্চ্চা করে, তাহারা তাহাদের শত্রুদের দোষ কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে ?

৯। ধরিত্রী সহিষ্ণু ভাবে নিন্দাকারীর ভার কি প্রকারে সহ্য করেন ? নিজ ভার হরণ করাইবার জন্যই কি তিনি ধর্ম্মের দিকে বারম্বার তাকান ?

১০। লোকে শত্রুর দোষের বিচার যে প্রকারে করে, যদি নিজের দোষের বিচার সেই প্রকারে করিত, তাহা হইলে কি অসাধুতা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত ?

বিংশ পরিচ্ছেদ

বৃথা-ভাষণ পরিহার

১। দেখ, যে ব্যক্তি কথা দ্বারা তাহার শ্রোতাগণের ক্রোধের উদ্রেক করে, তাহাকে সকলে ঘৃণা করে।

২। বহুজন সমক্ষে বৃথা বাক্য ব্যয় করা, নিজ আত্মীয়গণের ক্ষতি করা অপেক্ষাও মন্দ।

৩। যে ব্যক্তি অসার কথার সংখ্যা-বৃদ্ধি করে, সে উচ্চৈঃস্বরে নিজ অন্তঃসারশূন্যতা বিঘোষিত করে।

৪। দেখ, যে ব্যক্তি সভায় অসার কথা বলে, তাহার তাহাতে নিজের কোনও লাভ নাই, বরং যাহা কিছু ভাল তাহা হইতে সে দূরে সরিয়া যায়।

৫। নিরর্থক উক্তি দ্বারা গুণবান্ ব্যক্তিদেরও সম্মানের হানি হয়।

৬। যে ব্যক্তি নিরর্থক কথা ভালবাসে, তাহাকে মনুষ্য বলিও না, বরং তাহাকে মানুষের খোলা বলিয়া জানিও। (১)

৭। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অপ্রিয় কথা বলিলেও বলিতে

---

(১) কারণ তাহাদের মধ্যে শাঁস নাই, কেবল খোলাই আছে।

পারেন ; কিন্তু তাঁহারা যেন অলাভ-সূচক কথা হইতে বিরত থাকেন। ৭

৮। উচ্চ উচ্চ প্রশ্নের মীমাংসায় যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি নিযুক্ত, তাঁহারা গভীর ভাবপূর্ণ কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না।

৯। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা দৃষ্টিভ্রম বশতঃ কখনো বৃথা বাক্য কহেন না।

১০। যে সকল কথা বলিবার উপযুক্ত তাহাই বলিবে, এবং যে সকল কথা বলায় কোনো লাভ নাই কিম্বা নিরর্থক, তাহা বলিও না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাপকর্ম্মে ভয়

১। মূর্খতা পাপ বলিয়া কথিত হইলেও, লোকেরা তাহা হইতে ভয় পায় না, কিন্তু সজ্জনেরা তাহা হইতে দূরে পলায়ন করে।

২। এক দুষ্কর্ম্ম হইতে অন্য দুষ্কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেই জন্য দুরাচারকে অগ্নি অপেক্ষা অধিক ভয় করা উচিত।

৩। কথিত হয় যে, যদ্দারা শত্রুরও ক্ষতি হয়, তাহা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

৪। ভুলিয়াও অপরের সর্ব্বনাশের চিন্তা করিও না, কারণ যাহারা অন্যের অনিষ্টের চিন্তা করে, ধর্ম্ম (ন্যায় বা সমদর্শিতা) তাহার বিনাশের উপায় দেখিতেছে।

৫। "আমি দরিদ্র" এই বলিয়া কাহারও পাপকর্ম্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে ; কারণ এরূপ করিলে সে অধিকতর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে।

৬। যে ব্যক্তি আপৎকালের দুঃখ ভোগ করিতে চাহে না, তাহার পক্ষে অন্যের হানি হইতে বিরত থাকা উচিত।

৭। অন্য সর্ব্ববিধ শত্রু হইতে পরিত্রাণ আছে, কিন্তু পাপকর্ম্মের কদাপি বিনাশ নাই। পাপকর্ম্ম পাপীকে অনুসরণ করতঃ তাহাকে নষ্ট না করিয়া ছাড়িবে না।

৮। ছায়া যেমন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না, এমন কি যেখানে যেখানে সে যায় তাহার পশ্চাতে লাগিয়াই থাকে, ঠিক সেইরূপ পাপকর্ম্ম পাপীর সঙ্গ ছাড়ে না; অবশেষে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া বসে।

৯। যদি তোমার নিজের প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে তোমার মনকে পাপের দিকে একটুও লওয়াইও না।

১০। যে ব্যক্তি অনুচিত কার্য্য করিবার জন্য সৎপথ ত্যাগ করে না, জানিও যে সে আপদ্ হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরহিত-চিন্তা

১। উপকার করিয়া মহাপুরুষেরা প্রতিদান চাহেন না। আচ্ছা, জলবর্ষণকারী মেঘের ঋণ জগৎ কিরূপে পরিশোধ করিতে পারে ?

২। যোগ্য ব্যক্তিরা নিজ হস্তে পরিশ্রম করিয়া যে ধন একত্রিত করেন, তাহা অপরের জন্যই সঞ্চিত হয়।

৩। হার্দ্দিক উপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোনো বস্তু এ জগতে পাওয়া যায় না—এমন কি স্বর্গেও নয়।

৪। যে উচিত-অনুচিতের বিচার করিতে পারে, সেই যথার্থ জীবিত আছে, কিন্তু যে যোগ্য-অযোগ্যের চিন্তা করে না, তাহার গণনা মৃত-ব্যক্তিদের মধ্যে।

৫। গ্রামের ঐ কানায় কানায় ভরা পুষ্করিণীটী দেখ ; যাহারা সর্ব্বভূতে প্রেম করে, তাহাদের সম্পদ ঐ পুষ্করিণীটীর মত।

৬। হৃদয়বান্ ব্যক্তির বৈভব গ্রামের মধ্যস্থলে উৎপন্ন ফল-ভারাবনত বৃক্ষের ন্যায়।

৭। উদার ব্যক্তির হস্তস্থিত ধন সেই বৃক্ষের সমান, যাহাতে ঔষধীর উপাদান পাওয়া যায়, অথচ যাহা সকল সময় সরস থাকে।

৮। দেখ, যাহাদের উচিত ও যোগ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে, দুঃসময় আসিলেও তাহারা পরের উপকার করিতে ভোলে না।

৯। পরোপকারী ব্যক্তি সেই সময় নিজের দারিদ্র্য অনুভব করে, যখন সে অর্থীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে না।

১০। পরোপকার করার ফলে যদি সর্ব্বনাশও উপস্থিত হয়, তথাপি আত্মবিক্রয় করিয়া বা ক্রীতদাস হইয়াও তাহা সম্পাদন করা উচিত।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দান

১। দান অর্থে দরিদ্রগণকে দেওয়া; অন্য সকল প্রকারের দেওয়া ধার দেওয়ার সমান।

২। দানে স্বর্গলাভ হইলেও দান গ্রহণ মন্দ; এবং যে ব্যক্তি দান করে, তাহার যদি স্বর্গের দ্বারও রুদ্ধ হয়, তথাপি তাহার পক্ষে দান করা ধর্ম্ম।

৩। "আমার কাছে নাই" না বলিয়া যে ব্যক্তি দান করে, কেবল সেই ব্যক্তিই কুলীন।

৪। যাচকের ওষ্ঠপ্রান্তে সন্তোষজনিত হাসির রেখা না দেখিলে দাতার মনে আনন্দ হয় না।

৫। ক্ষুধাকে জয় করাই আত্মজয়ীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়; কিন্তু যে ব্যক্তি (অন্যের) ক্ষুধা শান্ত করে, তাহার বিজয় ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

৬। যে প্রণালীতে দরিদ্রগণের ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যাইতে পারে, তাহা এই যে, এতদর্থে ধনী ব্যক্তিরা ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন।

৭। যে ব্যক্তি নিজের আহার অপরের সহিত ভাগ করিয়া খায়, তাহাকে ক্ষুধার ভয়ঙ্কর ব্যাধি কখনও স্পর্শ করে না।

৮। যে সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তি ধন সঞ্চিত করিয়া উহার অপব্যবহার করে, তাহারা কি কখনো দানের আনন্দ আস্বাদন করিয়াছে ?

৯। যে সঞ্চয়-লব্ধ খাদ্য একাকী ভোজন করে, সেই কৃপণের কার্য্য ভিক্ষা করা অপেক্ষাও অপ্রিয়।

১০। মৃত্যু অপেক্ষা কটু বস্তু আর নাই ; কিন্তু যে ব্যক্তির দান করিবার সামর্থ্য চলিয়া যায়, তাহার নিকট মৃত্যুও মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কীর্ত্তি

১। দরিদ্রদিগকে দান করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন কর। এতদপেক্ষা অধিক লাভ মনুষ্যের আর কিছুতেই নাই।

২। যাহারা দান করে, প্রশংসাকারীর জিহ্বায় তাহাদেরই নাম অবস্থিতি করে।

৩। পৃথিবীর আর সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু অতুল কীর্ত্তি চিরকাল বিদ্যমান থাকে।

৪। দেখ, যে ব্যক্তি দিগন্তব্যাপী স্থায়ী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বর্গের দেবতারা সাধু ও তপস্বী অপেক্ষাও মহৎ বলিয়া গণ্য করেন।

৫। যে বিনাশ হইতে কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হয় এবং যে মৃত্যু হইতে অলৌকিক যশ লব্ধ হয়, এতদুভয়ই মহাত্মা-দের পথেই আবির্ভূত হইতে দেখা যায়।

৬। যখন মনুষ্যকে নিশ্চয়ই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে তখন সুযশ অর্জ্জন করাই উচিত। যাহারা তাহা করে না, তাহাদের জন্ম একেবারেই না হইলে ভাল হইত।

৭। দোষ হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিবৃত্ত না হইয়াও

যাহারা নিজেদের প্রতি বিরক্ত হয় না, (১) তাহারা তাহাদের নিন্দকদের উপরে কেন অসন্তুষ্ট হয়? (২)

৮। যদি মনুষ্য সেই স্মৃতির প্রতিষ্ঠা না করিতে পারে যাহাকে কীর্ত্তি বলে; তাহা হইলে মনুষ্যজাতির পক্ষে ইহা অগৌরবের কথা।

৯। নিন্দার্হ লোক দ্বারা ভারাক্রান্ত পৃথিবীকে দেখ, ভূতকালে ইহার সমৃদ্ধি যতই অধিক থাকুক না কেন, ধীরে ধীরে সেই সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যাইবে।

১০। যাহারা নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করে, তাহারাই জীবিত, এবং যাহাদের জীবন কীর্ত্তিহীন, তাহারাই যথার্থ মৃত।

(১) অথচ জানে যে, তাহারা নিজেই নিজেদের দুর্দ্দশার জন্য দায়ী।

(২) যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিজেই নিজেদের দুর্দ্দশা আনিয়াছে, তখন নিন্দকেরা তাহাদের নিন্দা করিতেছে বলিয়া নিন্দকদের উপর বিরক্ত হওয়া অনুচিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

তপস্বি-জীবন

ক উপবিভাগ—সংযম

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

দয়া

১। দয়া দ্বারা আকণ্ঠ পূর্ণ মনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন, কারণ পার্থিব বিভব তো নীচ লোকের অধিকারেও দেখিতে পাওয়া যায়।

২। নীতি অনুসরণ করিয়া বিচার পূর্ব্বক হৃদয়ে দয়া পোষণ করিবে; যদি তুমি সকল ধর্ম্মের মধ্যে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর, তবে দেখিতে পাইবে যে দয়াই মুক্তির একমাত্র সাধন।

৩। যে সকল লোকের হৃদয় দয়া কর্ত্তৃক অধিকৃত তাহারা কখনও অন্ধকারময় অপ্রিয় লোকে প্রবেশ করে না।

৪। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে দয়া প্রদর্শন করে, তাহার সেই সকল পরিণাম হইতে পলায়ন করিতে হয় না, যাহা দেখিলে আত্মা কম্পিত হয়।

৫। ক্লেশ দয়ালু পুরুষের জন্য নয়; প্রাচুর্য্যময়ী বায়ু-বেষ্টিত পৃথিবী এই বাক্যের সাক্ষী।

৬। যে দয়াধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে এবং পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার অবস্থা শোচনীয়। সে পূর্ব্বজন্মে ধর্ম্মত্যাগ করা হেতু অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

৭। যেমন ধনবৈভবশূন্য মনুষ্যের জন্য ইহলোক নয়, তেমনই দয়াশূন্য মনুষ্যের জন্য পরলোক নয়।

৮। ঐহিক বৈভবশূন্য দরিদ্র ব্যক্তিরা এক দিন কোনও প্রকারে বিত্তশালী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যাহারা দয়া-মমতাশূন্য, তাহারা যথার্থই কাঙ্গাল, এবং তাহাদের দিন কখনও ফেরে না।

৯। কঠিন-হৃদয় মনুষ্যের পক্ষে ভাল কাজ করা সেইরূপ সহজ, যেমন বিকারগ্রস্ত মনুষ্যের পক্ষে সত্য লাভ করা সহজ।

১০। যখন তুমি কোনও দুর্ব্বল লোককে নির্য্যাতিত করিতে উদ্যত হও, তখন ভাবিয়া দেখিও যে যখন তোমাপেক্ষা বলবান্ লোকের নিকট তুমি ভয়ে কম্পান্বিত হইবে, তখন তুমি কিরূপ বোধ করিবে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

নিরামিষ আহার

১। যে নিজ মাংস বৃদ্ধির জন্য অন্যের মাংস ভক্ষণ করে, তাহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক কি প্রকারে হইতে পারে ?

২। অমিতব্যয়ীর নিকট যেমন ধন থাকিতে পায় না, মাংসাশীর হৃদয়ে ঠিক সেইরূপ দয়া থাকে না।

৩। যে ব্যক্তি মাংস আস্বাদন করে, তাহার মন বর্ম্মাচ্ছাদিত মনুষ্যের ন্যায় সাধু কার্য্যের লক্ষীভূত হয় না।

৪। জীবহত্যা যে ক্রূরতা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবের মাংস ভোজন করা সম্পূর্ণ পাপকর্ম্ম।

৫। মাংস ভোজন না করাতেই জীবন। যদি তুমি মাংস আহার কর, তাহা হইলে তোমার বহির্গমনের জন্য নরক তাহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে না।

৬। যদি কেহই মাংস খাইতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে মাংস-বিক্রেতাও থাকিবে না। (১)

---

(১) এই পদটী সেই সব লোকের জন্য, যাহারা বলে যে আমরা নিজে প্রাণিহত্যা করি না—আমরা কাটা মাংস কিনিতে পাই।

৭। যদি মনুষ্য অন্য প্রাণীর ক্লেশ ও যন্ত্রণা এক বার অনুভব করিতে পারে, তবে সে মাংস ভোজনের ইচ্ছা করিবে না।

৮। যাহারা মায়া ও মূঢ়তার পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহারা যে শবদেহ হইতে শ্বাস বহির্গত হইয়া গিয়াছে, তাহা ভক্ষণ করে না।

৯। সজীব প্রাণীর হত্যা ও আহার হইতে বিরত থাকা, সহস্র যজ্ঞে বলি ও আহুতি দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১০। যে ব্যক্তি জীবহিংসা করে না এবং মাংসাহার হইতে বিরত থাকে, তাহাকে দেখ। দেখিবে যে, সমস্ত জগৎ যুক্তকরে তাহার সম্মান করে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

তপ (১)

১। ধৈর্য্যের সহিত ক্লেশ সহ্য করা এবং জীব-হিংসা হইতে বিরত থাকা এই দুইটীতেই তপস্যার সকল সার বিদ্যমান।

২। যাহারা পূর্ব্বজন্মে তপস্যার দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের পক্ষেই তপ সম্ভব। অন্যের পক্ষে তপ অনর্থক।

৩। তপস্বীদিগের পানভোজন ও সেবাশুশ্রূষার জন্য কতকগুলি লোকের প্রয়োজন। এই জন্যই কি অন্যেরা তপে অবহেলা করে?

৪। যদি তুমি শত্রু নাশ করিতে, এবং যাহারা তোমাকে ভালবাসে তাহাদিগকে উন্নত করিতে চাহ, তাহা হইলে মনে রাখিও যে, এই শক্তি তপে আছে।

৫। তপ, তুমি যে ভাবে চাহ, তোমার কামনা পূর্ণ করিয়া দেয়। এই জন্যই পৃথিবীতে লোকে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইতে চাহে।

৬। যাহারা তপস্যা করে তাহারাই নিজেদের যথার্থ

(১) কৃচ্ছ্রসাধন, আত্ম-নিগ্রহ ও চিত্তবৃত্তি-নিরোধ

কল্যাণ-সাধন করে। অন্যেরা লালসার ফাঁদে আবদ্ধ হয় এবং কেবল নিজেদের ক্ষতি করে।

৭। যে অগ্নিতে সোণা গালান হয়, তাহার উত্তাপের যত বৃদ্ধি হয়, সোণার ঔজ্জ্বল্যের ততই বৃদ্ধি হয়। ঠিক সেইরূপে তপস্বী যতই দুর্দ্দশা ভোগ করে, ততই তাহার প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

৮। দেখ, যে ব্যক্তি নিজের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাকে সকলেই পূজা করে।

৯। দেখ, যাহারা তপ করিয়া শক্তি ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহারা মৃত্যুকে জয় করিতেও সমর্থ।

১০। পৃথিবীতে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণ এই যে, যাহারা তপ করে তাহাদের সংখ্যা কম, এবং যাহারা তপ করে না, তাহাদের সংখ্যা অধিক।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতারণা

১। যখন প্রতারকের নিজ শরীরের পঞ্চভূত উহার ধূর্ত্ততা ও শঠতা দেখিতে পায়, তখন তাহারা মনে মনে হাসে।

২। শ্রীসম্পন্ন ও তেজস্বী রূপ কি কাজের, যদি ভিতরে অসাধুতা পরিপূর্ণ থাকে এবং মন তাহা জানে ?

৩। যে নিজের উপর প্রভুত্ব লাভ না করিয়া তপস্বীর ন্যায় তেজোবিশিষ্ট সজ্জায় নিজেকে সজ্জিত করিয়া রাখে, সে সেই গর্দ্দভের ন্যায়, যে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া চরিয়া বেড়ায়।

৪। সেই ব্যক্তিকে দেখ, যে ধার্ম্মিকের বেশে আপনাকে গোপন করিয়া দুষ্কর্ম্ম করে। সে সেই ব্যাধের ন্যায়, যে ঝোপের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া পক্ষী ধরিয়া বেড়ায়।

৫। প্রতারক পবিত্রতার ভাণ করিয়া বলে "আমি ইন্দ্রিয়-লালসা জয় করিয়াছি।" শেষে কিন্তু সে ইহার প্রতিফল পাইবে এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিবে, "আমি কি করিয়াছি ! হায়, আমি কি করিয়াছি !"

৬। যে ব্যক্তির আন্তরিক ত্যাগ হয় নাই, অথচ

ত্যাগীর ন্যায় আড়ম্বর দেখাইয়া লোকজনকে ঠকাইয়া বেড়ায়, তাহার ন্যায় অবিবেকী দুর্বৃত্ত পৃথিবীতে আর নাই।

৭। কুঁচ দেখিতে সুন্দর, কিন্তু তাহার এক স্থানে একটী কাল দাগ থাকে। কতকগুলি লোক সেই প্রকারের। তাহাদের বাহ্য রূপ সুন্দর, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ কলুষিত।

৮। এমন অনেক লোক আছে যাহাদের অন্তঃকরণ অপবিত্র, কিন্তু তাহারা তীর্থে তীর্থে স্নান করিয়া বেড়ায়।

৯। তীর আকারে সোজা কিন্তু রক্তপিপাসু। সারঙ্গীতে বক্রতা থাকা সত্ত্বেও উহা সুস্বর বিকীর্ণ করে। অতএব মনুষ্যগণকে তাহাদের কর্ম্মের দ্বারা জানিবে, আকারের দ্বারা নহে।

১০। লোকে যাহাকে মন্দ বলে, যদি তুমি তাহা হইতে দূরে থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার জটাও রাখিতে হইবে না, মস্তকও মুণ্ডন করিতে হইবে না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রবঞ্চনা

১। যে ব্যক্তি ঘৃণার পাত্র হইতে চহে না, প্রবঞ্চনার চিন্তা হইতে তাহার সাবধান থাকা উচিত।

২। "আমি আমার প্রতিবাসীর বিষয় ঠকাইয়া লইব" এরূপ ভাব মনোমধ্যে আসাও পাপ।

৩। প্রবঞ্চনা দ্বারা গঠিত বিভবের উন্নতি হইতেছে, ইহা মনে হইতে পারে; কিন্তু উহা চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত জানিবে।

৪। লুণ্ঠনের পিপাসা সময়ে অশেষ দুঃখের কারণ হয়।

৫। দেখ, যে ব্যক্তি অপরের বিত্তের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তজ্জন্য তাহার অসাবধান মুহূর্ত্তের অন্বেষণ করে, সে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের কথা ভাবে না এবং স্বীয় হৃদয়কে প্রেম হইতে দূরে রাখে।

৬। যে ব্যক্তি লুণ্ঠন-পিপাসী, সে বস্তুসমূহের যথার্থ গুরুত্বের অনুমান করিতে ও ধর্ম্মের পথে চলিতে পারে না।

৭। দেখ, যে ব্যক্তি সংসারের বস্তুসমূহের গুরুত্বের উপলব্ধি করিয়াছে এবং নিজ হৃদয় দৃঢ় করিয়াছে, সে তাহার প্রতিবাসীকে প্রবঞ্চনা করিবার মূর্খতা দেখায় না।

৮। যে ব্যক্তি বস্তুসমূহের যথার্থ মূল্য জানে, তাহারই হৃদয়ে ধর্ম্মভাব স্থান পায়। সেইরূপ তস্করের হৃদয়ই প্রবঞ্চনার বাসস্থান।

৯। দেখ, যে ব্যক্তির মনে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই, সে ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিবে ও ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

১০। যে ব্যক্তি অন্য লোকদিগকে ঠকায়, তাহার নিজ শরীরই তাহার স্ববশে নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক, দেবগণের রাজ্যেও তাহার নিঃসন্দেহ অধিকার থাকে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সত্য

১। সত্য কি ? যাহা দ্বারা কোনো প্রকারের ক্ষতি হয় না, এরূপ বাক্য বলাই সত্য।

২। সেই মিথ্যাতেও সত্যের গুণ বর্ত্তমান, যাহার ফল সম্পূর্ণ হিতকর।

৩। যে কথাটীকে তোমার মন মিথ্যা বলিয়া জানে, তাহা কখনও বলিও না, কারণ মিথ্যা বলিলে তোমার অন্তরাত্মাই তোমাকে দগ্ধ করিবে।

৪। যে ব্যক্তির হৃদয় মিথ্যাশূন্য এবং পবিত্র, সে সকল লোকের মনের উপর প্রভুত্ব করে।

৫। যাহার মন সত্যে নিমজ্জিত, সে তপস্বী অপেক্ষাও মহান্ এবং দাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

৬। মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক সুযশ আর কি হইতে পারে যে, লোকমধ্যে তাহার এই বলিয়া খ্যাতি যে, সে মিথ্যা বলিতে জানে না। এরূপ ব্যক্তি শরীরকে কষ্ট না দিয়াই সকল পুণ্যের অধিকারী হয়।

৭। মিথ্যা না বলিয়া যদি কোনও ব্যক্তি জীবিত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর অন্য কোনো গুণের প্রয়োজন নাই।

৮। শরীরের পবিত্রতা তো জলের দ্বারা নিষ্পাদন করা যায়, কিন্তু মনের পবিত্রতা সত্যভাষণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। (১)

৯। গুণী ব্যক্তিরা অন্য প্রকারের আলোককে আলোক বলেন না—কেবল সত্যের জ্যোতিকেই তাঁহারা যথার্থ আলোক বলিয়া বিবেচনা করেন।

১০। আমি এ সংসারে অনেক বস্তু দেখিয়াছি; কিন্তু যাহা দেখিয়াছি তন্মধ্যে সত্য অপেক্ষা কোনো উচ্চতর পদার্থ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

---

(১) অদ্‌ভির্গাত্রাণি শুদ্ধন্তি, মনঃ সত্যেন শুদ্ধতি।—মনু

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ক্রোধ পরিহার

১। আঘাত করার শক্তি থাকিতেও যে আঘাত করে না, তাহাকে সহিষ্ণু বলা যাইতে পারে। যাঁহার কোনো শক্তিই নাই, সে ক্ষমা করুক আর নাই করুক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি ?

২। তোমার ক্ষতি করিবার শক্তি না থাকিলেও, ক্রোধ করা মন্দ ; কিন্তু যদি শক্তি থাকে, তবে তো ক্রোধ অপেক্ষা অধিক মন্দ বস্তু আর কিছুই নাই।

৩। যে-ই তোমার ক্ষতিকারক হউক না কেন, ক্রোধ পরিত্যাগ কর, কেন না ক্রোধ হইতে শত শত অনিষ্টের উৎপত্তি হয়।

৪। ক্রোধ হাস্যের হত্যা ও আনন্দের বিনাশ করে। ক্রোধ অপেক্ষা মানুষের অধিক ভয়ঙ্কর শত্রু আর কি আছে ?

৫। যদি তুমি নিজ কল্যাণ চাও, ক্রোধ হইতে দূরে থাক ; কেন না, তাহা না করিলে, সে আসিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরিবে এবং তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।

৬। যে ব্যক্তি অগ্নির নিকট থাকে, সে দগ্ধ হইতে

পারে; কিন্তু ক্রোধাগ্নিকে পোষণ করিলে, সেই অগ্নি পোষণকারীর সমগ্র পরিবারকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

৭। যে ব্যক্তি ক্রোধকে বহুমূল্য পদার্থের ন্যায় হৃদয়ে রক্ষা করে, সে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের হাত জোরে মাটিতে আঘাত করে। এই ব্যক্তির হাতে ব্যথা প্রাপ্ত হওয়া যেমন নিশ্চিত, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরও ভাগ্যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হওয়া সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

৮। তোমার যে ক্ষতি হইল তাহা যদি তোমাকে অঙ্গারের ন্যায়ও দগ্ধ করে, তথাপি তোমার ক্রোধ হইতে বিরত হওয়া ভাল।

৯। মনুষ্য যদি মন হইতে ক্রোধকে দূরীভূত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সকল কামনাই অচিরাৎ পূর্ণ হইবে।

১০। যে ব্যক্তি ক্রোধবশে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, সে মৃত দেহের সমান, এবং যে ক্রোধকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, সে সাধুর সমান।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরের অপকার

১। যাহার হৃদয় পবিত্র, সে রাজার সম্পত্তি পাইলেও পরের অপকার করিবে না।

২। ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ নির্ম্মল-চেতা ব্যক্তির অপকার করে, তথাপি ঐ অপকৃত মহৎলোক প্রতিশোধ লইতে চাহে না।

৩। বিনা উত্তেজনায় কেহ তোমার অপকার করিলে যদি তুমি তাহার অনিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি নিজের উপর এমন সকল অনিষ্ট আনয়ন করিবে, যাহার প্রতিকার হয় না।

৪। যাহারা কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে, তাহাদের শাস্তি বিধান সে ব্যক্তি কি প্রকারে করিবে? উপকার করিয়া সে তাহাদিগের হৃদয়ে লজ্জা দিবে।

৫। অপরে যে সকল ক্লেশ অনুভব করে, তাহা যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ক্লেশ বলিয়া অনুভব না করে, এবং নিজের ক্লেশ বলিয়া অনুভব করিয়াও অনিষ্ট হইতে বিরত না হয়, তবে তাহার বুদ্ধির কি প্রয়োজন?

৬। কোনো ব্যক্তি যেরূপ ক্লেশ নিজে অনুভব

করিয়াছে, সেরূপ ক্লেশ সে যাহাতে অপরকে না দিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সাবধান থাকা উচিত।

৭। যদি তুমি জ্ঞাতসারে কোনো সময়ে কোনো ব্যক্তির কোনো পরিমাণে অনিষ্ট না কর, তাহা হইলে তোমার কার্য্য মহৎ।

৮। যাতনা কাহাকে বলে যে নিজে অনুভব করিয়াছে, সে অপরকে তাহা দিতে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইতে পারে?

৯। যদি কোনো ব্যক্তি প্রাতঃকালে তাহার প্রতিবাসীর অনিষ্ট করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিকালে তাহার নিজের উপর বিপদ্ আপনা-আপনি আসিয়া পড়িবে।

১০। অনিষ্টকারীর মস্তকের উপরই যত অশুভ প্রতিফলিত হইয়া আসিয়া পড়িবে। অতএব যাহারা অমঙ্গলের লক্ষীভূত হইতে না চাহে, তাহারা যেন অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অহিংসা

১। সকল ধর্ম্মের মধ্যে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ। জীব-হিংসার পশ্চাতে সর্ব্বপ্রকার পাপ লগ্ন থাকে।

২। সকল ঋষির সকল উপদেশের মধ্যে এইগুলি শ্রেষ্ঠ—"অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত নিজ খাদ্য ভাগ করিয়া খাও", "হিংসা হইতে দূরে থাক।"

৩। প্রাণীহত্যা না করা সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সত্যের পদ ইহারও ঠিক পরে।

৪। উত্তম পথ কোনটী? সেই পথই উত্তম যাহাতে এই ভাবনা থাকে যে, ক্ষুদ্র জীবগণকেও কি উপায়ে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

৫। যে ব্যক্তিরা এই পাপময় গার্হস্থ্য-জীবন বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রাণীবধ হইতে ভয় পাইয়া অহিংসা-মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৬। ধন্য সেই ব্যক্তি; যে অহিংসা-ব্রত-গ্রহণ করিয়াছে। মৃত্যু সকল জীবকে কবলিত করে, কিন্তু তাহার জীবনের দিনগুলির উপর আক্রমণ করে না।

৭। যে জীবন সকল প্রাণীর কাছে মধুর, নিজ জীবন রক্ষার জন্যও তাহা লইও না।

৮। লোকে বলিতে পারে যে, বলিদান করিলে অনেক পুণ্যসঞ্চয় হয়, কিন্তু বিমলচেতা মনুষ্যগণের দৃষ্টিতে যে পুণ্য হিংসা হইতে লব্ধ হয়, তাহা জঘন্য ও ঘৃণার্হ।

৯। যে সকল ব্যক্তি প্রাণীবধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, বিচারশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে তাহারা শবাঁহারীর তুল্য।

১০। দেখ, ঐ ভিক্ষুকের গলিত দেহ পুজযুক্ত ঘায়ে আচ্ছন্ন। বুদ্ধিমান লোকেরা বলেন যে, বোধ হয় ঐ ব্যক্তি অতীত কালে রক্তপাতে অভ্যস্ত ছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

তপস্বি-জীবন

খ উপবিভাগ—জ্ঞান

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সাংসারিক বস্তুর অসারতা

। সেই মোহ অপেক্ষা অধিকতর মূর্খতা আর কিছু নাই, যাহাতে আবদ্ধ হইয়া মনুষ্য অস্থায়ী পদার্থ সমূহকে স্থির ও নিত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

২। ধনসঞ্চয় তামাসা দেখিতে আগত ভিড়ের সমান, এবং ধনক্ষয় সেই ভিড় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার সমান।

৩। সমৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী। যদি তুমি সমৃদ্ধিশালী হইয়া থাক, তাহা হইলে যেরূপ কার্য্য হইতে স্থায়ী লাভ পাওয়া যায়, তাহা করিতে বিলম্ব করিও না।

৪। দেখিতে সময় সরল ও নিষ্পাপ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা একখানি করাত, যাহার অবিরাম ঘর্ষণে জীবনের ক্ষয় হইতেছে।

৫। জিহ্বা রুদ্ধ হওয়ার ও হিক্কা উঠার পূর্ব্বেই ভাল কাজে তৎপর হইও।

৬। একব্যক্তি কাল ছিল কিন্তু আজ নাই—পৃথিবীতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়। (১)

৭। মনুষ্য পরমুহূর্ত্তে জীবিত থাকিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু তাহার বাসনাগুলি দেখিলে বোধ হয় যে তাহাদের সংখ্যা বহু কোটী।

৮। পাখা বাহির হইবামাত্র পক্ষী-শাবক ভগ্ন ডিম্ব ছাড়িয়া উড়িয়া যায়। ইহাই দেহ ও আত্মার পারস্পরিক সম্বন্ধের নমুনা।

৯। মৃত্যু নিদ্রার সদৃশ, এবং জীবন সেই নিদ্রা হইতে জাগরণের ন্যায়।

১০। আত্মার কি কোনো নিজ নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই যে, সে অকিঞ্চিৎকর শরীরে আশ্রয় লয়?

(১) এখানে গীতা কথিত সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা বলা হয় নাই —স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উল্লেখ হইয়াছে। বরং অষ্টম ও নবম পদে গীতোক্ত বাক্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্যাগ

১। কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু ত্যাগ করিয়াছে। ঐ বস্তু হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সে মুক্ত হইয়াছে। (১)

২। যদি তুমি অধিক কাল সুখভোগ করিতে চাহ, তাহা হইলে শীঘ্র ত্যাগ অভ্যাস কর, কারণ ত্যাগে অনেক সুখ পাওয়া যায়।

৩। নিজ পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে দমন কর, এবং যে সকল বস্তু হইতে তুমি সুখ পাও তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন কর।

৪। নিজের নিকট কিছুই না রাখাই ব্রতধারীর নিয়ম। একটি বস্তুও নিজের নিকট রাখিলে, সেই-সকল বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ হইতে হইবে, যাহা একবার ছাড়া হইয়াছে।

---

(১) বাঞ্ছিত বস্তু-লাভের চিন্তা, তাহা হারাইবার আশঙ্কা, তাহার অপ্রাপ্তি-হেতু নিরাশা এবং তাহার ভোগাধিক্য-জনিত কষ্ট—এই সকল দুঃখ হইতে সে মুক্ত। ত্যাগই ইন্দ্রিয়দমন, তপ ও সংযমের প্রকৃত পথ। ভোগের দ্বারা শান্তি আসে না; ইন্দ্রিয়সংযম অর্থে ইন্দ্রিয়-দমন, ইন্দ্রিয়-বধ নহে।

৫। যাহারা পুনর্জ্জন্মের আবর্ত্তন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহে, তাহাদের পক্ষে এই শরীরও অনাবশ্যক। আচ্ছা, তাহা হইলে অন্য বন্ধন কত অনাবশ্যক ? (২)

৬। "আমি" ও "আমার" এই যে ভাব—ইহা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি এই ভাবকে দমন করিতে পারে, সে দেবলোক অপেক্ষাও উচ্চ লোক প্রাপ্ত হয়।

৭। দেখ, যে ব্যক্তি সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ, এবং তাহা হইতে বাহির হইতে চাহে না, তাহাকে চিন্তা ও দুঃখ আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিবে এবং মুক্ত হইতে দিবে না।

৮। যাহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা মুক্তির মার্গ গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু অন্য সকলে মোহজালে আবদ্ধ রহিয়াছে।

৯। যে মুহূর্ত্তে বন্ধন ছিন্ন হয়, তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জন্ম বন্ধ হইয়া যায়। যাহারা এই সকল বন্ধন কাটিয়া ফেলে না, তাহারা ভ্রমজালে আবদ্ধ থাকে।

১০। সেই ঈশ্বরে শরণাগত হও, যিনি সকল মোহ-বিজয়ী, এবং তাঁহারই আশ্রয় লও, যাঁহার আশ্রয় লইলে তোমার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে।

---

(২) মায়া, মোহ এবং অবিদ্যা।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যের অনুভূতি

১। মিথ্যা ও অনিত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করার ভ্রমই মনুষ্যকে দুঃখময় সংসারে লইয়া আসে।

২। যে ব্যক্তি ভ্রান্তভাব হইতে মুক্ত এবং যাহার দৃষ্টি মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ, তাহার অন্ধকারের অন্ত হইয়া যায় এবং সে আনন্দের অধিকারী হয়।

৩। যে ব্যক্তি অনিশ্চিত বস্তু হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়াছে এবং সত্য লাভ করিয়াছে, তাহার কাছে স্বর্গ পৃথিবী হইতেও নিকট।

৪। মনুষ্য-যোনির ন্যায় শ্রেষ্ঠ যোনি পাইলেও কোনো লাভ নাই, যদি আত্মা সত্যের আস্বাদন না করিয়া থাকে।

৫। যে কোনো বিষয়ই হউক না কেন, তাহাতে সত্য হইতে মিথ্যাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াই জ্ঞানের কার্য্য।

৬। সেই ব্যক্তি ধন্য, যে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে। সে এমন পথে চলিবে, যাহাতে পুনরায় তাহাকে এ পৃথিবীতে আসিতে না হয়।

৭। যে ব্যক্তি ধ্যান ও ধারণা দ্বারা সত্য পাইয়াছে, তাহার আর ভবিষ্যতে শরীর ধারণ করিবার ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

৮। যাহাতে পুনর্জ্জন্মের দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তদর্থে সম্পূর্ণতা ও সত্যের সাধনাই জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য।

৯। দেখ, যে ব্যক্তি মুক্তির সাধন জানে এবং সকল মোহ জয় করিবার প্রযত্ন করে, তাহার ভাবী দুঃখ দূরে যায়।

১০। কাম, ক্রোধ ও মোহকে যে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছে, তাহার সকল ক্লেশ নষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কামনা-বিজয়

১। কামনা এমন একটী বীজ, যাহা প্রত্যেক আত্মাকে অভ্রান্তরূপে অনবরত জন্মান্তররূপী ফসল প্রদান করে।

২। যদি তোমার কোনো বিষয়ের কামনা থাকে তো জন্মান্তরের আবর্ত্তন হইতে অব্যাহতি পাইবার কামনা কর, এবং যদি কামনা জয় করিতে আগ্রহান্বিত হও, তাহা হইলে সেই অব্যাহতি পাইবে।

৩। নিষ্কামনা হইতে শ্রেষ্ঠতর সম্পদ্ মর্ত্ত্যালোকে আর নাই, এবং যদি তুমি স্বর্গেও যাও, সেখানে এমন কোনো কোষাগার পাইবে না, যাহা ইহার সমকক্ষতা করিতে পারে।

৪। কামনা হইতে মুক্তি পাওয়া অপেক্ষা বড় আর কোনো পবিত্রতা নাই, এবং এই মুক্তি সত্যের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন পাওয়া যায় না।

৫। যাহারা স্বীয় বাসনা জয় করিয়াছে, তাহারাই মুক্ত, অবশিষ্ট লোক দেখিতে স্বাধীন, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা বন্ধনে আবদ্ধ।

৬। যদি তুমি সাধুতা চাও, তো কামনা হইতে দূরে থাক, কারণ কামনা এক প্রকারের জাল এবং নিরাশা মাত্র।

৭। যদি কোনো ব্যক্তি নিজ সমস্ত বাসনা সম্যক্‌রূপে নিষ্পেষিত করিতে পারে, তাহা হইলে মুক্তিকে সে যে পথ দিয়া আসিতে আজ্ঞা করিবে, মুক্তি সেই পথ দিয়াই তাহার নিকট উপস্থিত হইবে।

৮। যে ব্যক্তি কোন বিষয়েরই কামনা করে না, তাহার কোনো দুঃখই হয় না, কিন্তু যে কাম্যবস্তু পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়, তাহার উপর বিপদের পর বিপদ্‌ আসিয়া পড়ে।

৯। বাসনা অপেক্ষা বড় বিপদ্‌ নাই। যদি মনুষ্য সেই বাসনার ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে এখানেও স্থায়ী সুখ পাইতে পারে।

১০। বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বাসনা ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্য

১। যখন ভাগ্যলক্ষ্মী কোনো মনুষ্যের উপর প্রসন্ন হইয়া কৃপা করিতে চাহেন, তখন তাহার মধ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখা দেয়; কিন্তু যখন ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাকে ছাড়িতে চাহেন, তখন তাহার মধ্যে শিথিলতা আসিয়া পড়ে।

২। শক্তিসমূহকে দুর্ভাগ্যই নিস্তেজ করিয়া দেয়, কিন্তু যখন ভাগ্যলক্ষ্মী কৃপা করিতে চাহেন, তখন তিনি প্রথমেই বুদ্ধিকে স্ফূর্তি প্রদান করেন।

৩। বিদ্যা ও নানাবিধ চতুরতা থাকাতে লাভ কি? যখন (মন্দ) ভাগ্য ক্রিয়াশীল হয়, তখন দেখা যায় যে, স্বাভাবিক অন্ধতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়।

৪। সংসারে দুইশ্রেণীর বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নাই। জীবনের সফলতা এক বস্তু, কিন্তু সাধুতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। (১)

৫। যখন কাহারও মন্দ দিন আসে, তখন ভাল কাজও মন্দে পরিণত হয়, কিন্তু যখন স্রোত ফেরে তখন মন্দ বস্তুও ভাল হইয়া যায়।

---

(১) যীশুখ্রীষ্ট বলিযাছিলেন, সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গলিয়া যাওয়াও সম্ভব, কিন্তু ধনবান্ ব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব।

৬। ভবিতব্যতা তোমাকে যাহা ভোগ করিতে দিতে চায় না, তাহা তুমি নিতান্ত চেষ্টা করিলেও রাখিতে পারিবে না, এবং যে সকল বস্তু তোমার ভাগ্যে আছে, তাহা তুমি ফেলিয়া দিলেও তোমার নিকট হইতে যাইবে না।

৭। সেই মহান্ শাস্তার বিধানের বিরুদ্ধে, কোটী-পতিও নিজ সম্পত্তির সামান্য মাত্র ভোগ করিতে পারিবে না।

৮। দরিদ্র ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই মনকে ত্যাগের দিকে ফিরাইতে চাহে, কিন্তু যে সকল দুঃখ তাহাদের প্রাপ্য, ভবিতব্যতা তাহাদিগকে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

৯। যদি শুভ আসিলে সুখী হও, তবে অশুভ আসিলে দুঃখিত হইবে কেন? (২)

১০। ভবিতব্যতা অপেক্ষা বলবান্ আর কে আছে? কারণ উহার লক্ষ্য যখন উহাকে পরাজিত করিবার উপায় অন্বেষণ করে, ঠিক সেই সময়েই উহা লক্ষ্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়া লক্ষ্যকে নিপাতিত করে।

---

(২) সুখভোগ করিবে তুমি, আর দুঃখভোগ করিবে অপরে? যে ব্যক্তি সুখ চাহে তাহাকে দুঃখও ভোগ করিতে হইবে। সুখ-দুঃখ পরস্পরকে অনুসরণ করে।

দ্বিতীয় ভাগ

অর্থ

(রাজনীতি)

প্রথম খণ্ড

রাজা

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রাজার গুণ

১। যাঁহার নিকট সেনা, প্রজা, ধন, মন্ত্রিসমাজ, মিত্র-রাজন্যবর্গ এবং দুর্গসমূহ—এই ছয়টী বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তিনি রাজাদিগের মধ্যে সিংহ।

২। রাজার মধ্যে সাহস, উদারতা, দূরদর্শিতা ও কার্য্যক্ষমতা—এই সকল বস্তুর অভাব থাকা উচিত নয়।

৩। যে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে শাসন করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সতর্কতা, প্রবুদ্ধতা ও কর্ত্তব্যাবধারণের ক্ষিপ্রতা কখনো ত্যাগ করে না।

৪। রাজার পক্ষে ন্যায়পালন বিষয়ে ভ্রান্তি হওয়া অনুচিত এবং অধর্ম্মের তিরস্কার কর্ত্তব্য। তাঁহার পক্ষে দৃঢ়তাপূর্ব্বক আত্মগৌরব রক্ষা করা উচিত, কিন্তু পৌরুষের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দুরাচার করা কখনো কর্ত্তব্য নয়।

৫। রাজার জানা থাকা উচিত যে, নিজ রাজ্যের সাধন গুলির উন্নতি ও বৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে, এবং রাজ-

কোষ কিরূপে পূর্ণ করা যাইতে পারে, এবং কি প্রকারেই বা তাহার সদ্‌ব্যয় হইতে পারে।

৬। যদি রাজা সকল প্রজাকেই তাঁহার নিকট আসিবার অধিকার দেন এবং তাহাদের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

৭। দেখ, যে রাজা উদার হস্তে দান করেন এবং প্রেমের সহিত প্রজা শাসন করেন, তাঁহার নাম সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইবে ; এবং যে রাজ্যই তিনি জয় করিতে ইচ্ছুক হউন না কেন, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার করতল-ন্যস্ত হইবে।

৮। ধন্য সেই রাজা, যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া ন্যায় করেন এবং স্বীয় প্রজার রক্ষা করেন। তিনি মনুষ্য মধ্যে দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৯। দেখ, যে রাজার কর্ণের অপ্রিয় বাক্য সহ্য করার গুণ আছে, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার ছত্রছায়া ত্যাগ করিবে না।

১০। যে রাজা উদার, দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ, এবং যিনি প্রেমের সহিত স্বকীয় প্রজা পালন করেন, তিনি রাজাদিগরে মধ্যে জ্যোতিঃ স্বরূপ।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১। শিক্ষার উপযুক্ত যে জ্ঞান তাহা অর্জ্জন কর, এবং অর্জ্জনের পর তদনুসারে চল।

২। জীবের প্রত্যক্ষ দুইটী চক্ষু আছে—একটীর নাম সংখ্যা, দ্বিতীয়টীর নাম বর্ণ।

৩। শিক্ষিত ব্যক্তিরাই চক্ষুষ্মান বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন; অশিক্ষিতদের মস্তকে দুইটী ক্ষত মাত্র থাকে।

৪। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যেখানে সমবেত হন সেখানে আনন্দোৎসব হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করেন, তখন হৃদয় ব্যাকুল হয়।

৫। ভিক্ষুকেরা যেরূপে ধনবানের সমক্ষে অবনত হয়, সেইরূপে তুমি শিক্ষকের নিকট আত্মাভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক অবনত হইয়া বিদ্যার্জ্জন করিবে। যাহারা বিদ্যার্জ্জনে পরাঙ্মুখ তাহারাই মনুষ্যসমাজে অধম।

৬। জ্ঞান একটী উৎসের ন্যায়—যতই তুমি উহাকে খনন করিবে, ততই উহার প্রবাহ স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর হইবে।

৭। বিদ্বানের পক্ষে সকল স্থানই তাহার গৃহ, এবং সকল দেশই তাহার স্বদেশ। তবে লোকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিদ্যার্জ্জন করিতে উদাসীন হয় কেন?

৮। মনুষ্য এজন্মে যে বিদ্যালাভ করিয়াছে, তাহা তাহাকে সাত জীবন পর্য্যন্ত উচ্চ ও উন্নত করিতে থাকিবে।

৯। বিদ্বান্ ব্যক্তি দেখিতে পায় যে, যে বিদ্যা তাহাকে আনন্দ দেয় তাহা শ্রবণ করিয়া অন্য লোকেও আনন্দ পায়; অতএব সে আরো অধিক বিদ্যার্জ্জনের প্রেমী হয়।

১০। মনুষ্যের পক্ষে বিদ্যা দোষত্রুটিহীন ও অবিনাশী নিধি। ইহার তুলনায় অন্য ঐশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষার অবহেলা

১। প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন না হইয়া বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করা অষ্টাপদ (চতুষ্কবিশিষ্ট অক্ষফলক) না লইয়া পাশক্রীড়া করার সমান।

২। দেখ, যে অশিক্ষিত ব্যক্তি বাগ্মী নামে অভিহিত হইতে অভিলাষ করে, সে সেই ঊর্দ্ধাঙ্গবিহীন (১) নারীর ন্যায়, যে মনুষ্যমধ্যে সুন্দরী বলিয়া প্রশংসিত হইতে আকাঙ্ক্ষা করে।

৩। যদি মূর্খ ব্যক্তি বিদ্বৎসমাজে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেও জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৪। অশিক্ষিত ব্যক্তি যতই জ্ঞানী হউক না কেন, শিক্ষিত সমাজে তাহার মতামত আদৃত হয় না।

৫। দেখ, যে ব্যক্তি শিক্ষার অবহেলা করিয়াছে, এবং আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, সে সভায় মুখ খুলিবামাত্র অপ্রতিভ হইবে।

---

(১) 'ঊর্দ্ধাঙ্গ' শব্দের অর্থ bust—মনুষ্যদেহের কটির উপরের অংশ।

৬। যে ব্যক্তি শিক্ষার অবহেলা করিয়াছে, সে সেই উষর ভূমির ন্যায়, যাহাতে শস্য জন্মে না। সে জীবিত আছে, ইহা ছাড়া লোকে তাহার সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে পারে না।

৭। দেখ, যাহার বুদ্ধিবৃত্তিতে কোনো প্রকারের উচ্চ ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহার সুদর্শন আকৃতিতে মৃৎমূর্ত্তি অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্য নাই।

৮। বিদ্বানের দারিদ্র্য বরং ভাল, কিন্তু মূর্খের হাতে ধনসম্পদ থাকা কিছু নয়।

৯। অপেক্ষাকৃত নিম্ন কুলোদ্‌ভব বিদ্বান্ ব্যক্তির মত বিশাল-কুলসম্ভব মূর্খ ব্যক্তির সম্মান হয় না।

১০। পশু অপেক্ষা মনুষ্য কত শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ, যাহারা শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা বিদ্বানেরা কত শ্রেষ্ঠ।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জ্ঞানী ব্যক্তিগণের উপদেশ শ্রবণ

১। মূল্যবান্ ধনাগার সমূহ মধ্যে কর্ণরূপ ধনাগারই সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য। ইহা সকল প্রকার সম্পত্তির মুকুট স্বরূপ।

২। কাণের খাদ্যের সাময়িক অভাব ঘটিলে, পেটের খোরাক জোগান হইবে। (১)

৩। দেখ, যাঁহারা অনেক উপদেশ শুনিয়াছেন, তাঁহারা ধরাতলে দেবতা।

৪। যদি কোনো লোক শিক্ষা না পাইয়া থাকে, তাহাকে উপদেশ শুনিবার সুযোগ দাও ; কেননা যখন সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, তখন সেই সকল উপদেশ স্মরণ করিয়া সে সান্ত্বনা পাইবে।

৫। ধর্ম্মাত্মাদের উপদেশ এক গাছি দণ্ডের কাজ করে, কারণ যাহারা তদনুসারে চলে, তাহাদিগকে উহা পতন হইতে রক্ষা করে।

৬। ভাল কথার পরিমাণ অল্প হইলেও তাহা

---

(১) যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপদেশ শুনিবার সুবিধা আছে, ততক্ষণ আহারের চিন্তা করা অনুচিত।

মনোযোগের সহিত শুনিও, কেন না সেই অল্প কথাই তোমাকে যথাসম্ভব মর্য্যাদা দান করিবে।

৭। দেখ, যে ব্যক্তি অনেক মনন (চিন্তা) করিয়াছে, এবং জ্ঞানী লোকের বচন শুনিয়া অনেক উপদেশ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, সে ভ্রমেও কখনো নিরর্থক বাক্যালাপ করিবে না।

৮। যে কর্ণ উপদেশে অভ্যস্ত হয় নাই, তাহার শ্রবণশক্তি থাকিলেও সে বধির।

৯। যাহারা জ্ঞানী জনের বিচক্ষণ বাক্য শুনে নাই, তাহাদের পক্ষে বাক্যালাপের বিনয় লাভ করা কঠিন।

১০। যাহারা কেবল জিহ্বার আস্বাদন জানে, কিন্তু কর্ণের দ্বারা সুরস গ্রহণে অনভিজ্ঞ, তাহাদের জীবিত থাকায় বা না থাকায় লোকের কি যায় আসে?

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধি

১। বুদ্ধি সমস্ত আকস্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার কবচ। উহা এরূপ দুর্গ যে, শত্রুগণও উহাকে বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পারে না।

২। শিষ্ট বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণকে বিপথ-গমন হইতে রক্ষা করে, দুষ্প্রবৃত্তি হইতে দূরে রাখে এবং সততার দিকে প্রেরিত করে।

৩। বিবেচক বুদ্ধির কাজ এই যে, সে প্রত্যেক উক্তির মিথ্যা অংশকে সত্য হইতে বাছিয়া পৃথক্ করিতে পারিবে—সে উক্তির বক্তা যে কোনো ব্যক্তিই হউক না কেন।

৪। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাহা কিছু বলে তাহা এরূপে বলে যে, সকলেই তাহা বুঝিতে পারে। সে অপরের মুখের শব্দাবলীর সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম।

৫। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকলের সহিত অনুরাগে আবদ্ধ হয় এবং তাহার আচরণ সর্ব্বদা সমতা রক্ষা করে—অপরিমিত রূপে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয় না।

৬। লোকরীতি অনুসারে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। (১)

৭। বিচক্ষণ ব্যক্তি, পরে কি হইবে প্রথমেই বুঝিতে পারে, কিন্তু যে মূর্খ সে পরে কি ঘটিবে তাহা দেখিতে পায় না।

৮। দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া বিপদের দিকে ধাবিত হওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা। যাহা হইতে ভীত হওয়া উচিত তাহাকে ভয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৮। দূরবর্শী ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে। যে আঘাতে কম্পন উৎপন্ন করে, সে তাহা হইতে সুরক্ষিত। (২)

১০। যাহার বুদ্ধি আছে তাহার সকলই আছে, কিন্তু সকল দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও মূর্খের নিকট কিছুই নাই। (৩)

---

(১) এ নিয়ম সাধারণ লোক সম্বন্ধে প্রয়োজ্য; কিন্তু অসাধারণ লোকের পক্ষে ক্ষুণ্ণ মার্গ পরিত্যাগের প্রয়োজন হইতে পারে।

(২) দূরদর্শী লোকেরা প্রথম হইতেই ভাবী দুঃখের নিরাকরণ করিতে পারেন।

(৩) বুদ্ধির্য্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলম্।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দোষ সমূহের পরিহার

১। যে ব্যক্তি দর্প, ক্রোধ ও বিষয়-লালসা-শূন্য, তাহার মধ্যে সৌভাগ্যের ভূষণ স্বরূপ এক প্রকার মর্য্যাদা থাকে।

২। কৃপণতা, আত্মম্ভরিতা ও অতি-বিলাসিতা —এইগুলি রাজার বিশেষ দোষ।

৩। দেখ, যে সকল লোক প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী, তাহাদের নিজ দোস সর্ষপ-প্রমাণ ক্ষুদ্র হইলেও, তাহারা তাহা তালবৃক্ষ-প্রমাণ দেখে।

৪। আপনাকে সকল দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত রাখিতে সদা সতর্ক থাকিও, কেন না তাহারা এমন শত্রু যে তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িবে না।

৫। যে ব্যক্তি আপতনোন্মুখ আকস্মিক বিপদের জন্য প্রথম হইতেই প্রস্তত থাকে না, সে অঙ্গার-সম্মুখস্থ তৃণরাশি যেরূপে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপে নষ্ট হইবে।

৬। রাজা যদি স্বীয় দোষ সংশোধনান্তর অপরের দোষের প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে কোন্ অনিষ্ট তাঁহাকে স্পার্শ করিতে পারে ?

৭। কৃপণকে ধিক্, কারণ যেখানে ব্যয় করা উচিত সেখানে সে ব্যয় করে না। তাহার সঞ্চিত ধনের অযথা অপব্যয় হইবে।

৮। কৃপণতা অন্য অসদ্‌গুণের সহিত একপর্য্যায়-ভুক্ত হইতে পারে না। তাহার শ্রেণী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (১)

৯। কোনো সময়ে কোনো কারণে আনন্দে অতিশয় অধীর হইও না; এবং এরূপ কোনো কাজও করিও না যদ্দ্বারা তুমি লাভবান্ না হও।

১০। যে সকল বিষয়ে তোমার প্রবল অনুরাগ আছে, যদি শত্রুগণকে তাহাদের সন্ধান না দাও, তাহা হইলে শত্রুর ষড়্‌যন্ত্র বিফল হইয়া যাইবে। (২)

(১) কৃপণতাকে সাধারণ অসদ্‌গুণ বলা চলে না; উহা অসাধারণ অসদ্‌গুণ।

(২) শত্রুরা যদি রাজার দুর্ব্বলতা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সহজেই তাঁহা'ক বশে আনিতে পারিবে।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

যোগ্য ব্যক্তির সহিত মিত্রতা

১। যে ব্যক্তিরা ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের সম্মান করিও, এবং তাঁহাদের মিত্রতা লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হইও।

২। তুমি যে সকল সঙ্কটে পড়িয়াছ তাহা দূর করিতে, এবং ভাবী অমঙ্গল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে যাহারা সক্ষম, উৎসাহপূর্ব্বক তাহাদের মিত্রতা লাভ করিতে চেষ্টা কর।

৩। যদি কেহ যোগ্য পুরুষের প্রীতি ও ভক্তি প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়, তবে তাহা মহান্ হইতে মহত্তর লাভ।

৪। তোমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিরা যদি তোমার মিত্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি এত শক্তিশালী হইয়াছ বলিতে হইবে, যাহার তুলনায় তোমার অন্য সব শক্তি তুচ্ছ।

৫। যেহেতু মন্ত্রীরাই রাজার চক্ষু, তাহাদের নির্ব্বাচনে রাজার অনেক বিবেচনা ও সতর্কতার প্রয়োজন।

৬। যে ব্যক্তি গুণী ব্যক্তিদের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিতে পারে, তাহার বিরুদ্ধে শত্রুগণ শক্তি-হীন।

৭। যে লোক এরূপ গুণী ব্যক্তিদের সহিত মিত্রতার গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা তাহাকে তিরস্কার করিতে পারেন, তাহার ক্ষতি করা কাহার সাধ্য ? (১)

৮। সময় আসিলে যাহারা ভৎর্সনা করিতে পারে, এরূপ ব্যক্তিদের উপর যে রাজা নির্ভর করে না, তাহার শত্রু না থাকিলেও তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

৯। যাহার হাতে মূলধন নাই, সে লাভ পাইবে কিরূপে ? ঠিক সেই মত, যে মনুষ্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের নিঃসন্দেহ সাহায্যের উপর নির্ভর করে না, তাহার ভাগ্যে স্থায়িত্ব কোথায় ?

১০। অসংখ্য লোককে শত্রু করা মূর্খতার কাজ, কিন্তু ভাল লোকের বন্ধুত্ব ত্যাগ করা তদপেক্ষা দশগুণ গর্হিত।

(১) রাজারা প্রায়ই চাটুবাক্য-প্রিয়। এজন্য তাহাদের কাছে খোশামুদেও অনেক জোটে। এরূপ অবস্থায় স্পষ্টবাদী সন্মার্গ-প্রদর্শক বন্ধু ভাগ্যক্রমে পাওয়া যায়।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকা

১। সজ্জনেরা মন্দ সংসর্গ হইতে ভীত হন। কিন্তু হীনস্বভাব ব্যক্তিরা মন্দ লোকের সহিত এরূপ ভাবে মেশে যেন তাহারা তাহাদের পরমাত্মীয়।

২। জলের গুণের পরিবর্ত্তন হয়, এবং উহা যেরূপ ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। সেইরূপে, মন যে প্রকারের সংসর্গে পড়ে, সেই প্রকারের বর্ণে রঞ্জিত হয়।

৩। মনুষ্যের গুণের সম্বন্ধ, মস্তিষ্কের সহিত কিন্তু তাহার সুনামের নির্ভর সংসর্গের উপর।

৪। মনুষ্যের স্বভাব তাহার মনের মধ্যে বাস করে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহার বাস্তবিক নিবাস সেই গোষ্ঠীতে, যাহার সংসর্গে সে থাকে।

৫। মনের পবিত্রতা এবং কর্ম্মের পবিত্রতা মনুষ্যের সংসর্গের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে।

৬। পবিত্রচেতা ব্যক্তির সুসন্তান হইবে, এবং যে ভাল সংসর্গে থাকে, সে সর্ব্বপ্রকার ফলপুষ্পযুক্ত হইবে।

৭। মনের পবিত্রতা মনুষ্যের পক্ষে ধনাগার স্বরূপ, এবং সৎসঙ্গ তাহাকে সর্ব্বপ্রকার গৌরব প্রদান করে।

৮। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, স্বয়ং সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও গুণী লোকের সংসর্গকে শক্তির স্তম্ভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

৯। ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যের স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু মনুষ্যকে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করে সাধু পুরুষদের সঙ্গ।

১০। সৎসঙ্গ অপেক্ষা বড় সহায় মনুষ্যের আর নাই; এবং অসৎ সংসর্গের ন্যায় হানিকরও আর কিছু নাই।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কাজ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা

১। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেখিয়া লইও যে উহাতে কত ব্যয় হইবে, কত দ্রব্য নষ্ট হইবে এবং কত লাভ হইবে ; তবে কাজে হাত দিও।

২। দেখ, যে রাজা সুযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কোনো কার্য্যে হস্তার্পণ করে, তাহার পক্ষে এমন কোনো বিষয় নাই যাহা অসম্ভব।

৩। এমনও ব্যবসায় আছে যাহা লাভের প্রলোভন দেখাইয়া অবশেষে মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। বুদ্ধিমান লোকেরা তাহাতে হাত দেয় না।

৪। দেখ, যাহারা অপরের উপহাসের ভয় করে, তাহারা প্রথমেই ভাল করিয়া চিন্তা না করিয়া কোনো কাজ আরম্ভ করে না।

৫। তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয়ের পরিকল্পনা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি সযত্নে প্রস্তুত ক্ষেত্রে শত্রুকে আনিয়া স্থাপিত করিতেছ।

৬। এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা করা অনুচিত এবং যদি তুমি তাহা কর তাহা হইলে তুমি নষ্ট হইয়া যাইবে। আবার কতকগুলি কাজ এমন আছে, যাহা তোমার করিতেই হইবে, না করিলে তুমি নষ্ট হইবে।

৭। কোনো কাজ ভাল করিয়া চিন্তা না করিয়া করিবে বলিয়া স্থির করিও না। যে ব্যক্তি কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া মনে মনে বলে—"পরে ভাবিয়া দেখিব", সে নির্ব্বোধ।

৮। দেখ, যে ব্যক্তি ঠিকভাবে কাজ করে না, তাহাকে সাহায্য করিতে যত লোকই আসুক না কেন, তাহার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে।

৯। তুমি যাহার উপকারে প্রবৃত্ত, যদি তোমার সাহায্য তাহার প্রকৃতির অনুকূল না হয়, তাহা হইলে উপকার করিতে গিয়াও তোমার ভ্রম হইতে পারে।

১০। তুমি যে কাজ করিতে চাহ তাহা অনিন্দ্য হওয়া উচিত, কেন না, যে ব্যক্তি অযোগ্য কাজ করিয়া আপনাকে হীন করে, তাহাকে লোকে ঘৃণা করে।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শক্তির বিচার

১। যে কাজ তুমি সম্পন্ন করিতে চাহ, তাহাতে যে সকল কাঠিন্য আছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া লইও। তৎপরে নিজ শক্তির, বিরোধীর শক্তির, এবং নিজ ও বিরোধীর সহায়কগণের শক্তির কথা ভাবিয়া দেখিও, এবং তখন কাজটী আরম্ভ করিও।

২। যে রাজা নিজ শক্তি জানে ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে, এবং নিজ জ্ঞান ও শক্তির সীমা অতিক্রম করে না, তাহার আক্রমণ কদাপি ব্যর্থ হয় না।

৩। এমন অনেক রাজা হইয়া গিয়াছে, যাহারা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া ও নিজ শক্তির উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু মধ্য পথেই তাহাদের লীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

৪। যাহারা শান্তিতে থাকিতে জানে না, যাহাদের নিজ বলাবলের জ্ঞান নাই এবং যাহারা আত্মম্ভরিতা-পূর্ণ, শীঘ্রই তাহাদের অন্ত হইবে।

৫। অপরিমিত ভার দিলে মৌরপক্ষের সংযোগেও ধুরা ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১)

---

(১) অতি পরাক্রমী রাজাকেও অত্যধিক-সংখ্যক শত্রুর সহিত এক সময়ে যুদ্ধ করিতে হইলে অভিভূত হইতে হইবে, যদিও প্রত্যেকে একলা থাকিলে নগণ্য।

৬। যে ব্যক্তিরা বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহারা যদি তদপেক্ষা অধিক উচ্চে উঠিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা প্রাণ হারাইবে। (২)

৭। তোমার কাছে কত অর্থ আছে—এই কথাটী ভাবিয়া দেখিয়া তদনুসারে দান খয়রাৎ করিও। তোমার সম্পত্তির রক্ষা ও বণ্টন এই উপায়ে হইতে পারে।

৮। জলাশয় পূর্ণ করার নল যদি সঙ্কীর্ণও হয়, ক্ষতি নাই। তবে দেখিতে হইবে যে, খালি করার নলটী তদপেক্ষা অধিক প্রশস্ত না হয়। (৩)

৯। যে ব্যক্তি নিজ ধনের হিসাব রাখে না ও নিজ সামর্থ্য অনুসারে কাজ করে না, সে নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করিতেছে বলিয়া বোধ হইলেও, এরূপে নষ্ট হইবে যে, তাহার নাম বা চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না।

১০। যে ব্যক্তি নিজ অর্থের পরিমাণের চিন্তা না করিয়া তাহা মুক্তহস্তে বিতরণ করে, তাহার সম্পত্তি শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।

(২) সামর্থ্যের অধিক কোনো কাজ করিবে না।

(৩) আয় ও ব্যয়।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সু-অবসরের বিচার

১। কাক দিনের বেলায় পেচককে পরাভূত করে; তেমনই, যে রাজা নিজ শত্রুগণকে পরাজিত করিতে চাহে, তাহার পক্ষে উপযুক্ত অবসর একটী বড় জিনিষ।

২। অতি নিকটে থাকিয়া সময়ের অনুসরণ করিবে। ইহাই সেই রজ্জু, যাহা সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে তোমার সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিবে।

৩। যদি সু-অবসর আসিয়াছে জানিয়া এবং উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ কর, তাহা হইলে এমন কোন্ কাজ আছে যাহা অসম্ভব?

৪। যদি তুমি উপযুক্ত সুযোগ ও সাধন অবলম্বন করিতে পার, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীকেও জয় করিতে সক্ষম হইবে।

৫। যাহাদের হৃদয়ে বিজয়-কামনা আছে, তাহারা নীরবে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে, এবং ভয়-বিহ্বল হয় না বা ত্বরা করে না।

৬। সংজ্ঞা-লোপকারী-আঘাত দিবার পূর্ব্বে, মেড়া একবার পশ্চাতে সরিয়া যায়। কর্ম্মবীরের নিশ্চেষ্টতাও ঠিক সেই প্রকৃতির।

৭। বুদ্ধিমান্ লোকেরা সদ্য সদ্য ক্রোধ প্রকাশ করে না ; তাহারা উহা মনে মনে পোষণ করে এবং সুযোগের সন্ধানে থাকে।

৮। যত দিন শত্রু তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিমান থাকিবে, ততদিন তুমি তাহার সমক্ষে অবনত থাকিও ; কিন্তু যখন তাহার শক্তির হ্রাস হইতেছে দেখা যাইবে, তখন যদি তাহাকে আক্রমণ কর, তবে অনায়াসে তাহাকে নিপাতিত করিতে পারিবে।

৯। যখন বিশেষ সুযোগ আসিবে, তখন তুমি ইতস্ততঃ করিও না, প্রত্যুত, কাজটী অসম্ভব হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবৃত্ত হইও। (১)

১০। যখন সময় তোমার বিরুদ্ধে, তখন সারসের ন্যায় নিষ্কর্ম্মণ্যতার ছল করিবে ; কিন্তু সময় আসিলেই উহার ন্যায় বেগে আক্রমণ করিবে।

(১) অসাধারণ সুযোগ পাইলে তৎক্ষণাৎ দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইবে।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

কার্য্যক্ষেত্রের বিচার

১। কার্য্যক্ষেত্র ভাঁল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া যুদ্ধ বাধাইও না, বা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইও না।

২। দুর্গবেষ্টিত স্থানকে আধার করা শক্তিশালী ও বলবানের পক্ষেও প্রভূত লাভদায়ক।

৩। যদি উপযুক্ত স্থান মনোনীত হয় এবং সাবধানে যুদ্ধকার্য্য চালান হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বলও আত্মরক্ষা করিয়া শক্তিশালী শত্রুকে জয় করিতে পারে।

৪। যদি তুমি সুদৃঢ় স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া অটল থাক, তাহা হইলে তোমার শত্রুদের সকল পরিকল্পনা নিস্ফল প্রমাণিত হইবে।

৫। গভীর জলে মকর সর্ব্বশক্তিমান্, কিন্তু বাহিরে আসিলে শত্রুহস্তের ক্রীড়নক।

৬। দৃঢ়চক্রসম্পন্ন রথ সমুদ্রের উপর দৌড়িতে পারে না, এবং সাগরগামী জাহাজও শুষ্ক ভূমির উপর সন্তরণে অক্ষম।

৭। দেখ, যে রাজা প্রথম হইতেই সকল বিষয়ের পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়া ঠিক লক্ষ্যে আঘাত করে, নিজ বল ভিন্ন তাহার অপর সহায়ের প্রয়োজন হয় না।

৮। যে রাজার সেনা দুর্ব্বল, সে যদি উপযুক্ত রণস্থলে যাইয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে তাহার শত্রুদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে।

৯। যদি আত্মরক্ষার উপাদান ও অপরাপর সাধন না-ও থাকে, তথাপি কোনো জাতিকে তাহার নিজের দেশে পরাস্ত করা কঠিন।

১০। দেখ, ঐ মত্ত হস্তী বিচলিত না হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বর্শাধারী সমগ্র সেনার সম্মুখীন হইল। কিন্তু যখন সে পঙ্কিল ভূমিতে নিমগ্ন হইবে, তখন একটা শৃগালও তাহার উপর বিজয় লাভ করিবে।

একপঞ্চাশত্তম—পরিচ্ছেদ

বিশ্বাসি-ব্যক্তি-নির্ব্বাচন

১। কোনো ব্যক্তির ন্যায়ানুরাগ, অর্থলিপ্সা, ইচ্ছার গতি ও প্রাণের ভয়—এই চারিটীর পরীক্ষা করিলে তাহার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহারই উপর বিশ্বাস-স্থাপন করিবে। (১)

২। যে সৎকুলোৎপন্ন, যে নির্দ্দোষ এবং যে অপমানকে ভয় করে, সেই লোকই তোমার নির্ব্বাচনের উপযুক্ত।

৩। পরীক্ষা-কালে তুমি দেখিতে পাইবে যে, অতিশয় জ্ঞানী ও পবিত্রচেতা লোকেরাও নানা প্রকার অজ্ঞানতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

৪। কোনো ব্যক্তির সদ্‌গুণগুলি দেখ, এবং তাহার অসদ্‌গুণগুলিও লক্ষ্য কর; উভয়ের মধ্যে যেগুলি অধিক, তদনুসারে তাহার চরিত্র বুঝিয়া লইও।

৫। তুমি কি জানিতে চাহ যে, অমুক লোকটী উদার-হৃদয় অথবা ক্ষুদ্রচেতা? মনে রাখিও যে, আচরণই চরিত্রের কষ্ঠীপাথর।

---

(১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রথম ভাগের দশম পরিচ্ছেদে উপধদিগের পরীক্ষার বিষয় দেখ।

৬। যাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে কেহ নাই, সাবধান, দেখিয়া শুনিয়া সেই সকল ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও; কারণ তাহাদের মনে কোনো মমতা থাকিবে না এবং তাহারা লজ্জাকে ভয় করিবে না।

৭। তুমি কোনো ব্যক্তিকে কেবল ভালবাস বলিয়াই যদি তাহাকে তোমার বিশ্বস্ত পরামর্শ-দাতা করিতে চাহ, তবে মনে রাখিও যে, সে তোমাকে অসীম মূর্খতার পথে চালিত কবিবে।

৮। দেখ, যে ব্যক্তি পরীক্ষা না লইয়াই অপর ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে, সে নিজ বংশের জন্য অনেক বিপদের বীজ বপন করে।

৯। পরীক্ষা না লইয়াই কাহারো উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও না, এবং পরীক্ষা লওয়ার পর প্রত্যেককে তাহার উপযুক্ততানুসারে কাজ দিও।

১০। পরীক্ষা না লইয়া কাহারো উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, এবং পরীক্ষার পর উপযুক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহ করা—এই দুইটী কার্য্যই সমানভাবে অনন্ত বিপদের কারণ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মচারিগণের পরীক্ষা ও নিয়োগ

১। যে ব্যক্তি ভালও দেখিতেছে, মন্দও দেখিতেছে, কিন্তু যাহা ভাল তাহাই করে, সেই ব্যক্তিকেই তোমার সেবায় গ্রহণ করিও।

২। যে ব্যক্তি তোমার রাজ্যের অর্থাগমের অঙ্গগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে এবং বিপদ আসিলে রাজ্যকে রক্ষা করিতে সক্ষম, সেইরূপ লোকের হস্তেই স্বীয় রাজ্যের পরিচালন-ভার অর্পণ করিও।

৩। যাহার দয়া, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি আছে, বা যে প্রলোভন হইতে মুক্ত, সেই ব্যক্তিকেই নিজ সেবায় নিযুক্ত করিও।

৪। এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও, কর্ত্তব্য পালনের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

৫। লোকের বিশেষজ্ঞতা ও ধীর কার্য্যকরী-শক্তির বিবেচনা করিয়াই তাহাদের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করা উচিত—সে ব্যক্তিগত ভাবে তোমার প্রতি অনুরক্ত, এজন্য নহে।

৬। সুচতুর ব্যক্তিকে বাছিয়া, সে যে কার্য্যের উপযুক্ত,

তাহাকে সেই কাজই দাও। আবার, যখন কার্য্যের ঠিক সময় উপস্থিত হইবে, তাহা দ্বারা সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও।

৭। প্রথমে কর্ম্মচারীর শক্তির ও তাহার উপযুক্ত কার্য্যের নির্ণয় করিয়া লও, পরে তাহার উপর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার ন্যস্ত কর।

৮। যখন তুমি স্থির করিলে যে, এই ব্যক্তি এই পদের উপযুক্ত, তখন উহাকে সেই পদে উন্নীত কর। সেই পদ যাহাতে যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হয়, তৎসম্বন্ধে সুবিধা করিয়া দাও।

৯। দেখ, যে নিম্নস্থ কর্ম্মচারী নিজ কার্য্যে দক্ষ, সে যদি কখনো তাহার প্রভুর সহিত সমতাসূচক ব্যবহার করে এবং তজ্জন্য প্রভু যদি রুষ্ট হন, তাহা হইলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার উপর বিরূপ হইবেন।

১০। রাজার উচিত যে, তিনি প্রতিদিন প্রত্যেক কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করেন ; কেন না, যে পর্য্যন্ত কোনো রাজ্যের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসাধুতা উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোনো বিপদ আসিবে না।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

স্বজন পোষণ

১। আত্মীয়েরাই বিপৎকালে তাহাদের সাসক্তিতে অটল থাকে।

২। যে ব্যক্তির ভাগ্যে এমন আত্মীয় লাভ হয়, যাহার ভালবাসা অটুট থাকে, তাহার সৌভাগ্যের পথ কখনো রুদ্ধ হয় না।

৩। দেখ, যে ব্যক্তি তাহার আত্মীয় স্বজনের সহিত কখনো মেলামেশা করে না এবং তাহাদের ভালবাসা লাভে সমর্থ হয় না, সে বাঁধবিহীন পুষ্করিণীর ন্যায়--সৌভাগ্য-বারি তাহার নিকট হইতে বহিয়া চলিয়া যাইবে।

৪। আত্মীয় স্বজনকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করাই অভ্যুদয়ের উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য।

৫। যদি কোনো ব্যক্তি মিষ্টভাষী ও মুক্তহস্ত হয়, তাহার জ্ঞাতিবর্গ দলে দলে তাহাকে ঘিরিয়া থাকিবে।

৬। দেখ, যে ব্যক্তি মুক্তহস্তে দান করে এবং কখনো ক্রোধ করে না, তাহার আত্মীয়গণের ন্যায় অনুরক্ত আত্মীয়বর্গ আর কাহারও নাই।

৭। স্বার্থপর হইয়া কাক কখনো তাহার খাদ্য

স্বজাতীয়বর্গ হইতে লুকাইয়া রাখে না, বরং প্রীতিপূর্ব্বক তাহা বণ্টন করিয়া তাহাদের সহিত ভোজন করে। এই প্রকৃতির লোকের সহিতই সৌভাগ্য বসতি করে।

৮। যদি রাজা তাহার সকল আত্মীয়ের সহিত একরূপ ব্যবহার না করিয়া, প্রত্যেকের সহিত তাহার গুণানুযায়ী ব্যবহার করে, তবেই মঙ্গল ; কারণ তাহাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাহারা অন্যের অননুলব্ধ বিশেষ অনুগ্রহের প্রয়াসী।

৯। কোনো আত্মীয়ের বিরাগের প্রতিকার সহজেই হইতে পারে—বিরক্তির কারণ বিদূরিত করিলেই সে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।

১০। যদি তোমার কোনো আত্মীয় তোমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া, কোনো কারণে আবার তোমার নিকট আসে, তাহা হইলে তাহাকে গ্রহণ করিও, কিন্তু সাবধানতার সহিত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

ঔদাসীন্য পরিহার

১। আত্মপ্রসাদ হইতে যে অনবধানতার উৎপত্তি হয়, তাহা অতিক্রোধ অপেক্ষাও দূষনীয়।

২। যেমন দারিদ্র্য বুদ্ধিবৃত্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, তেমনই "আমি সুরক্ষিত আছি" বলিয়া যে মিছা ধারণা, তাহা প্রতিষ্ঠাকে বিনষ্ট করে।

৩। অনবধান ব্যক্তির ভাগ্যে গৌরব নাই। সকল মতাবলম্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই এই সিদ্ধান্ত।

৪। দুর্গনিচয় ভীরু ব্যক্তির, অথবা প্রচুর ধনজন অসাবধান ব্যক্তির, কি উপকারে আসে?

৫। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে সকল বিষয়ে সতর্ক হয় না, আকস্মিক বিপৎপাতে তাহাকে নিজ অবহেলার জন্য পরিতাপ করিতে হয়।

৬। যদি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বজন সম্বন্ধে তোমার সাবধানতার ত্রুটি না হয়, তাহা হইলে ইহার ন্যায় আর কি আছে?

৭। যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যে নিজ মনকে সদা জাগ্রত ও সাবধান রাখিতে পারে, তাহার পক্ষে কোনো কাজই অসম্ভব নয়।

৮। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে সকল কাজের প্রশংসা করেন, সেই সকল বিষয়ে রাজা উদ্যমের সহিত আত্ম-নিয়োগ করিবে। যদি সে অবহেলা করে, তবে সাত-জন্মেও দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

৯। যখন তোমার আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্ব অনুভব করিবার প্রলোভন হইবে,তখন যাহারা আলস্য ও অবহেলা বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে স্মরণ করিও।

১০। যদি কোনো ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্য অবিরত মনশ্চক্ষুর সম্মুখীন রাখিতে পারে, নিশ্চয়ই সে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারে।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

ন্যায়-শাসন

১। উত্তমরূপে বিবেচনা কর এবং কোনো দিকে ঝুঁকিও না; নিরপেক্ষ হও এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের মত লও। ন্যায় বিচার করিবার ইহাই রীতি।

২। জীবন লাভ করিবে বলিয়া জগৎ মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপে, ন্যায়বিচার পাইবে বলিয়া লোকে রাজদণ্ডের দিকে তাকাইয়া থাকে।

৩। রাজদণ্ডই ব্রহ্মবিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রধান সংরক্ষক।

৪। দেখ, যে রাজা নিজ রাজ্যের প্রজাবর্গকে প্রেমের সহিত শাসন করে, তাহা হইতে রাজলক্ষ্মী কখনো বিচ্ছিন্ন হইবে না।

৫। দেখ, যে রাজা নিয়মানুসারে রাজদণ্ড ধারণ করে, তাহার রাজ্য সময়ানুকূল বর্ষা ও প্রচুর শস্যের আবাসভূমি হইয়া যায়।

৬। রাজার বিজয়ের কারণ তাহার অস্ত্রশস্ত্র নয়, বরং তাহার কারণ—তাহার রাজদণ্ড, যদি তাহা সতত ঋজুভাবে রক্ষিত হয় এবং কখনো কোনো দিকে না ঝোঁকে।

৭। রাজা স্বীয় সমগ্র প্রজার রক্ষক। তাহার রাজদণ্ডই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবে, যদি তাহাকে কোনো দিকে ঝুঁকিতে না দেওয়া হয়।

৮। যে রাজার প্রজারা অনায়াসে তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে না, এবং যে মনোযোগ পূর্ব্বক ন্যায়বিচার করে না, সে নিজ পদ হইতে ভ্রষ্ট হইবে, এবং তাহার শত্রু না থাকিলেও সে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৯। দেখ, যে রাজা অন্তঃ-ও বহিঃ-শত্রুগণ হইতে প্রজার রক্ষা করে, সে যদি অপরাধের দণ্ডবিধান করে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না—ইহা তাহার কর্ত্তব্য।

১০। দুষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া শস্যক্ষেত্র হইতে আগাছা বাহির করিয়া দেওয়ার সমান।

ষট্পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

প্রজাপীড়ন

১। দেখ, ঐ রাজা নিজ প্রজাগণকে উৎপীড়িত করে এবং তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। সে ঘাতক অপেক্ষাও অধম।

২। (প্রজাপীড়নের জন্য) যে রাজদণ্ড ধারণ করে, তাহার অনুরোধেও "দাঁড়াও, যাহা কিছু আছে, সমর্পণ কর" এইরূপ দস্যু-বাক্যের ধ্বনি অনুভূত হয়।

৩। দেখ, যে রাজা প্রতিদিন রাজ্য-সঞ্চালন-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে না, এবং তাহাতে যে ত্রুটী আছে তাহা দূর করিতে যত্নবান হয় না, তাহার রাজত্ব দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

৪। সেই বিচারহীন রাজাকে দেখ, যে ন্যায়-মার্গ হইতে বিচ্যুত। সে নিজরাজ্য এবং যাহা কিছু তাহার সম্বল আছে, সকলই হারাইবে।

৫। নিশ্চয় জানিও যে, অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তি-গণের অশ্রুই ধীরে ধীরে রাজার সমৃদ্ধির ক্ষয় করিবে।

৬। ন্যায় শাসন দ্বারাই রাজার যশোলাভ হয়, এবং অন্যায় শাসন দ্বারাই তাহার গৌরব মলিন হয়।

৭। বর্ষাহীন আকাশের তলে পৃথিবীর কিরূপ দশা হয়? নির্দ্দয় রাজার শাসনাধীন প্রজাগণেরও ঠিক সেই দশা।

৮। অত্যাচারী রাজার শাসন দরিদ্রাপেক্ষা ধনীর অধিক মর্ম্মন্তুদ।

৯। যদি রাজা ন্যায় ও ধর্ম্মের পথ হইতে স্খলিত হয়, তবে যথাসময়ে আকাশের ধারা নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

১০। যদি রাজা ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন না করে, তাহা হইলে গাভীর স্তন শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং ব্রাহ্মণ তাহার শাস্ত্র বিস্মৃত হইবে।

সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

হৃৎকম্পোৎপাদক কার্য্য হইতে বিরতি

১। অপরাধের পরিমাণানুসারে রাজা অপরাধীর এরূপ শাস্তি বিধান করিবে যে, তাহার পক্ষে পুনর্ব্বার অপরাধ করা অসম্ভব হইবে; কিন্তু দেখিতে হইবে, যেন শাস্তি অতি কঠোর না হয়।

২। যাহারা স্বীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তাহারা রাজদণ্ড উগ্রভাবে চালিত করুক, কিন্তু প্রয়োগ-কালে উহা যেন মৃদুভাবে পতিত হয়।

৩। দেখ, যে রাজা কঠোর ভাবে রাজ্য শাসন করিয়া লোকের হৃদয়ে আতঙ্ক উৎপাদন করে, সে বন্ধুহীন হইয়া সত্বর নিধন প্রাপ্ত হইবে।

৪। দেখ, যে রাজার নিষ্ঠুরতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার রাজ্য অচিরে হস্তচ্যুত, এবং আয়ুষ্কাল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইবে।

৫। ঐ বিষণ্ণবদন দুরধিগম্য রাজাকে দেখ। উহার অধিকৃত ধন দৈত্য-রক্ষিত কোষাগারের ন্যায়।

৬। রাজা যদি পরুষভাষী ও ক্ষমাবিরহিত হয়, তাহার বিভব যতই বিপুল হউক না কেন, অচিরে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।

৭। পরুষ ভাষা ও অতি কঠোর দণ্ড ব্রশ্চনের (উকার) ন্যায় শক্তিরূপ লৌহের ক্ষয় সাধন করে।

৮। যে রাজা মন্ত্রীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করে না, কিন্তু স্বীয় সঙ্কল্প বিফল হইলে ক্রোধে অধীর হয়, তাহার সমৃদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

৯। দেখ, যে রাজা সময় থাকিতে তাহার প্রাকার-পরিখাদির রক্ষা বিষয়ে মনোযোগ করে না, সহসা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সে হৃৎকম্পাভিভূত হয় এবং অচিরে নিধন প্রাপ্ত হয়।

১০। যদি অত্যাচারের সহিত মূর্খতা ও কপটতা মৈত্রী করে, তবে তাহা হইতে উৎপন্ন একমাত্র ভারেই পৃথিবী আর্ত্তনাদ করিতে থাকে— আর কিছুতেই নয়।

অষ্টপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সহৃদয়তা

১। কে ঐ মোহিনী সুন্দরী ? উহার নাম সহৃদয়তা। এই জগৎ যে নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে, তাহা উহারই প্রসাদাৎ।

২। জীবনের যাহা কিছু রমণীয়তা, তাহা সমস্তই সহৃদয়তা হইতে লব্ধ। যাহাদের উহা নাই, তাহারা পৃথিবীর ভার স্বরূপ।

৩। সেই গানের মূল্য কি, যাহা গীত হইতে পারে না ? সেই চক্ষুর শোভা কি, যাহা হইতে করুণা ঝরে না ?

৪। সে চক্ষুর প্রয়োজন কি, যাহা বদনমণ্ডলে অবস্থিত থাকে, কিন্তু অন্যের প্রতি যথাশক্তি সহৃদয়তা প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ ?

৫। সহৃদয়তা চক্ষুর ভূষণ। যে চক্ষুতে উহার অভাব, তাহা ক্ষতমাত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। দেখ, চক্ষু থাকিতেও কেহ কেহ অন্যের প্রতি সহৃদয়তা দেখাইতে পারে না। নিশ্চয়ই তাহারা নিশ্চল দারুমূর্ত্তি।

৭। যাহারা অপরের সম্বন্ধে বিবেচনাহীন, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধ; এবং যাহারা অপরের দোষ ক্ষমার চক্ষে দেখে, তাহাদের দৃষ্টিই যথার্থ দৃষ্টি।

৮। ঐ ব্যক্তিকে দেখ, যে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট না হইয়া অন্যের প্রতি সহৃদয়তা দেখাইতে সক্ষম। ঐ ব্যক্তিই এই ধরাধামের (যথার্থ) উত্তরাধিকারী হইবে।

৯। যে তোমার ক্ষতি করিয়াছে, তাহাকে যদি তুমি ক্ষমা করিতে, এবং তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে পার, তাহা হইলে ইহা তোমার উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচায়ক।

১০। যাহারা সৌজন্যে অগ্রণী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাহে, তাহারা তাহাদের চক্ষুর সমক্ষে মিশ্রিত বিষপান করিতেও ইতস্ততঃ করিবে না।

ঊনষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

চর-নিয়োগ

১। রাজাকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, রাজনীতি-শাস্ত্র ও গুপ্ত-বার্ত্তাবহ-সংসদ—এই দুইটী চক্ষু দ্বারাই তিনি দেখেন। (১)

২। যথাসময়ে প্রত্যেক মনুষ্যের প্রত্যেক ঘটনার দৈনিক সংবাদ রাখা রাজার কর্ত্তব্য। (২)

৩। যে রাজা গুপ্তচর ও দূত দ্বারা নিজের চতুর্দ্দিকে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহার সংবাদ রাখেন না, তাঁহার পক্ষে অন্য-রাজ্য-জয় সম্ভব নয়।

৪। নিজ কর্ম্মচারিগণের, (৩) বন্ধুবান্ধবদিগের ও শত্রুগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য রাজা চর নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন। (৪)

৫। যে ব্যক্তি নিজ আকৃতিতে এমন ভাব ধারণ করিতে পারে, যাহাতে কাহারো মনে তাহার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জন্মে না, যে কখনো কাহারো নিকট অপ্রতিভ হয়

(১) কামন্দক ১২।৩০ ; মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, ৮৩।

(২) শুক্রনীতি ১।২৬২-৫।

(৩) পূর্ব্বোক্ত ৫২০ পদ দেখ।

(৪) কামন্দক ১২।৩।

না এবং যে নিজ গুপ্তকথা কোনরূপে প্রকাশ হইতে দেয় না, সেই চর-কার্য্যের উপযুক্ত।

৬। গুপ্তচর ও দূতদিগকে (অনেক সময়ে) সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া অনুসন্ধান দ্বারা যথার্থ ভেদ অবগত হইতে হইবে, এবং যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাদের অন্তরের কথা কিছুতেই ব্যক্ত হইবে না। (৫)

৭। যে অন্যের পেটের কথা বাহির করিতে পারে, এবং যাহার অনুসন্ধান সকল সময়ে অভ্রান্ত ও অসংদিগ্ধ, সেই গুপ্তচরের কাজ করিতে পারে।

৮। এক দূতের দ্বারা যে সন্ধান পাওয়া গেল, তাহা অপর দূতের অনুসন্ধানের সহিত মিলাইয়া দেখা উচিত।

৯। সদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, যেন একই কার্য্যে নিযুক্ত একজন দূতের সন্ধান আর একজন দূত না পায়। যখন তিনজন দূতের আনিত সংবাদ পরস্পর মিলিয়া যাইবে, তখনই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পার। (৬)

১০। নিজ চরসংসদের কর্ম্মচারিগণকে প্রকাশ্য-ভাবে পুরস্কৃত করিও না ; কেন না, যদি তুমি এরূপ কর, তাহা হইলে ইহা দ্বারা নিজ গোপন কার্য্যাবলীই প্রকাশ করিয়া ফেলা হইবে।

---

(৫) কামন্দক ১২।২৯ ; অর্থশাস্ত্র ২।১৩।

(৬) অর্থশাস্ত্র ২।১৩ ; অগ্নিপুরাণ ২২০।২২।

ষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

কার্য্যক্ষমতা

১। যাহাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারাই যথার্থ ধনী ; এবং যাহাদের সে শক্তি নাই, তাহারা কি নিজ নিজ অধিকারস্থ বস্তুসমূহের যথার্থ অধিকারী ? . .

২। কার্য্য করিবার শক্তিই মনুষ্যের প্রকৃত ধন, কেন না, বিভব চিরস্থায়ী নয়, তাঁহা একদিন না একদিন চলিয়া যাইবে।

৩। দেখ, যে সকল ব্যক্তির অধিকারে অবিরাম কার্য্য করিবার শক্তি নামক সাধন আছে, তাহারা কখনো হতাশ হইয়া বলিবে না "আমাদের সর্ব্বনাশ হইল।"

৪। সেই পুরুষই ধন্য, যে কার্য্য হইতে বিরত হয় না। ভাগ্যলক্ষ্মী পথ অনুসন্ধান করিয়া সেই পুরুষের গৃহে প্রবেশ করেন।

৫। পাদপের সিঞ্চনের জন্য যে জল ঢালা হয়, তাহা হইতেই তাহার পুষ্পের সমৃদ্ধি পরিমিত হয়। ঠিক সেই-রূপে, কোনো ব্যক্তির উৎসাহের পরিমাণ হইতেই তাহার ভাগ্যের পরিমাণ বোঝা যায়

৬। তোমার উদ্দেশ্য যেন মহৎ হয় ; কেননা উহা নিষ্ফল হইলেও, তোমার গৌরব কখনো ম্লান হইবে না।

৭। উৎসাহী ব্যক্তি হারিয়া গিয়া কখনো ভগ্নোৎসাহ হয় না। হস্তীর দেহে যখন গভীর ভাবে তীর বিদ্ধ হয়, তখন সে আরো দৃঢ়ভাবে ভূমির উপর স্বীয় পদ স্থাপন করে।

৮। যাহাদের কার্য্যদক্ষতা নাই তাহাদিগকে দেখ। অক্ষয় উদাবতার গৌরব তাহাদিগের ভাগ্যে নাই।

৯। হস্তীর বৃহদায়তন ও ক্রমসূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা থাকাতে লাভ কি? ব্যাঘ্রকে তাহার উপর পতনোন্মুখ দেখিলেই তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে।

১০। একমাত্র প্রচুর কার্য্যক্ষমতাই তো শক্তি। যাহাদের তাহা নাই তাহারা স্থাণু ভিন্ন আর কিছু নয়—মনুষ্য-শরীর থাকাতেই যাহা কিছু প্রভেদ।

একষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

আলস্য পরিহার

১। বংশ বলিয়া যে অক্ষয় আলোক কথিত হয়, তাহা কার্য্যবিমুখতা-রূপ বাষ্পদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইবে।

২। যাহারা নিজ বংশকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী, তাহারা যেন নিরুদ্যমতাকে তাহার প্রকৃত নামে অভিহিত করিয়া বর্জ্জন করে।

৩। দেখ, যে মূর্খ নিরুদ্যমতারূপ ঘাতককে হৃদয়ে লগ্ন করে, তাহার আয়ুর অবসানের পূর্ব্বেই তাহার বংশ অধঃপতিত হইবে।

৪। যাহারা নিষ্ক্রিয়তাতে নিমজ্জিত, এবং কোনো উন্নত ও মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাদের বংশ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের দুষ্কৃতি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

৫। দীর্ঘসূত্রতা, বিস্মৃতি, আলস্য ও নিদ্রা--এই চারিটী, সেই সকল লোকের সুখের তরী, যাহাদের ভাগ্যে নষ্ট হওয়া লেখা আছে।

৬। নিরুদ্যমী ব্যক্তিরা রাজানুগ্রহ পাইলেও কখনো উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

৭। দেখ, যাহারা আলস্যপরায়ণ এবং কখনো কোনো মহৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না, তাহাদিগকে অনেক অবজ্ঞা ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে।

৮। যদি নিষ্ক্রিয়তা কোনো বংশে আবাসস্থান করে, তাহা হইলে ঐ বংশ শীঘ্রই উহার শত্রুর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে।

৯। যে সকল ক্লেশ কোনো ব্যক্তির বংশে নিপতিত হইয়াছে, তাহাদের অবসান সেই মুহূর্ত্তেই হইবে, যে মুহূর্ত্তে উহা আলস্য ত্যাগ করিবে।

১০। যে রাজা আলস্য কাহাকে বলে জানে না, সে ত্রিবিক্রম বামন দ্বারা পরিমিত সমগ্র পৃথিবীকে নিজ ছত্রছায়ার নীচে আনিবে।

দ্বিষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

পুরুষোচিত পরিশ্রম

১। "ইহা অসম্ভব" বলিয়া কোনো কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হইও না; কারণ, পরিশ্রমই তোমাকে সকল কার্য্য করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করিবে।

২। সাবধান, কোনো কার্য্য অসমাপ্ত রাখিও না। কারণ যাহারা আরম্ভ-করা কাজ অসমাপ্ত রাখে, তাহাদিগকে পৃথিবীর লোকে গ্রাহ্য করে না।

৩। যে মহত্ত্ব কোনোরূপ পরিশ্রমে কাতর নয়, তাহাই সকল মনুষ্য-সেবার গৌরবময় আনন্দ অনুভব করিবার অধিকারী।

৪। কার্য্যবিমুখ ব্যক্তির উদারতা নপুংসক ব্যক্তির হস্তস্থিত অসির সদৃশ। উহা স্থায়ী হইবে না।

৫। যে ব্যক্তি আমোদে আকৃষ্ট না হইয়া কার্য্যে অনুরক্ত হয়, সে নিজ বন্ধুগণের পক্ষে শক্তির স্তম্ভ স্বরূপ, এবং তাহাদের চক্ষু হইতে শোকাশ্রু বিদূরিত করিবে।

৬। পরিশ্রম সম্পদের জনক; কিন্তু তন্দ্রিলতা দারিদ্র্য ও অভাবের উৎপত্তির কারণ।

৭। আলস্যের মধ্যেই দুর্দ্দশা-দানবের নিবাস; কিন্তু যে ব্যক্তি তন্দ্রার বশীভূত হয় না, তাহারই উদ্যমশীলতার মধ্যে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বাসস্থান।

৮। যদি কেহ ভাগ্য-লক্ষ্মীর উপেক্ষিত হয়, তাহাতে লজ্জার কারণ নাই; কিন্তু যদি সে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকে, তবে তাহা তাহার কলঙ্কের কথা।

৯। দেবতারা বিরুদ্ধ হইলেও, পরিশ্রমের পুরস্কার আসিতে বাধ্য।

১০। যাহারা দৈবের বশীভূত না হইয়া, উহার বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও অবিরত পরিশ্রম করিয়া যায়, তাহারা উহার প্রতি অঙ্গুলি-স্ফোটন করিবে।

ত্রিষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

বিপদে নির্ভীকতা

১। তোমার উপর কোনো দুরবস্থা আসিয়া পড়িলে, তুমি হাসিতে হাসিতে তাহার সম্মুখীন হইবে ; কেননা বিপদ হইতে ত্রাণ করিতে হাসি অপেক্ষা ফলপ্রদ আর কোনো বস্তু নাই।

২। অনিশ্চিতমনা ব্যক্তিও যখন মনকে একাগ্র করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন বীচিবিক্ষুব্ধ বিপদ-সাগরও সঙ্কুচিত হইয়া প্রশমিত হয়।

৩। বিপদ্‌কে যাহারা বিপদ্ জ্ঞান করে না, তাহারা বিপদ্‌কেই বিপদে ফেলিয়া ফিরাইয়া দেয়।

৪। যে ব্যক্তি পুংমহিষের ন্যায় বিপদরূপ কর্দ্দম পার হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ; তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ আসিলেও, সে তাহাদিগকে ভগ্নমনোরথ করিয়া ফিরাইয়া দিবে।

৫। বিপদের একটী সম্পূর্ণ সেনা নিজের বিরুদ্ধে সুসজ্জিত দেখিয়াও যাহার মন ভগ্নোৎসাহ হয় না, তাহার নিকট আসিতে বাধাসমূহও বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

৬। সৌভাগ্যের সময় যাহারা হর্ষোৎফুল্ল হয় না, তাহারা কি কখনো কষ্টের সময় বলিয়া বেড়াইবে, "হায় আমার সর্ব্বনাশ হইল ?"

৭। বুদ্ধিমান লোকেরা জানে যে, এই শরীর দুর্দ্দশার লক্ষ্যস্থল—লক্ষ্য অভ্যাস করিবার ফলকস্বরূপ ; অতএব তাহাদের উপর যখন কোনো বিপদ আসিয়া পড়ে, তখন তাহারা কোনো মতে বিহ্বল হয় না।

৮। দেখ, যে ব্যক্তি আমোদ ভালবাসে না এবং জানে যে, বিপদও সৃষ্টিনিয়মের অন্তর্ভুক্ত, সে বাধা পাইলে কখনো বিহ্বল হয় না।

৯। সাফল্যের সময় যে আমোদ আহ্লাদের পশ্চাতে ধাবিত হয় না, অসফলতার সময়ও তাহার ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না।

১০। দেখ, যে ব্যক্তি পরিশ্রমের ভার ও চাপকে যথার্থ আনন্দ বলিয়া ভাবে, তাহার শত্রুরাও তাহার প্রশংসা করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

রাজতন্ত্রের অঙ্গসমূহ

চতুঃষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র-সচিব

১। দেখ, যে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টাসমূহ সফলতা-পূর্ব্বক সম্পাদন করিবার উপায় ও সাধন জানে, এবং সেগুলি আরম্ভ করিবার সুযোগ সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিই পরামর্শ দিবার উপযুক্ত পাত্র।

২। স্বাধ্যায়, দৃঢ়নিশ্চয়, পুরুষাকার, এবং প্রজাবর্গের হিতের নিমিত্ত সপ্রেম চেষ্টা—এইগুলিই মন্ত্রীর প্রকৃত গুণ।

৩। যে শত্রুমধ্যে ভেদ সঙ্ঘটিত করিবার শক্তি সম্পন্ন, যে বর্ত্তমান মিত্রতা-সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম, এবং যাহারা শত্রু হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে যে পুনর্মিলিত করিতে পারে, সেই যোগ্য মন্ত্রী।

৪। উপযুক্ত কার্য্য নির্ণয় করিবার এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে-সকল সাধন আবশ্যক তাহা নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা, এবং মত দিবার সময় দৃঢ়তা—এইগুলি পরামর্শদাতার প্রয়োজনীয় গুণ।

৫। দেখ, যে নীতিজ্ঞ ও সম্পূর্ণ জ্ঞানী, যে বুঝিয়া-সুঝিয়া কথা কয় এবং যে সুবিধা-অসুবিধার সময় বুঝিতে পারে, সেই তোমার উপযুক্ত মন্ত্রী।

৬। যাহারা পঠিত বিদ্যা দ্বারা নিজ স্বাভাবিক বুদ্ধি পরিমার্জিত করিয়া লয়, তাহাদের নিকট এমন কোন্ বস্তু উপস্থিত হইতে পারে, যাহা তাহারা বুঝিতে অক্ষম ?

৭। যদিও পুস্তকের জ্ঞানে তুমি দক্ষ, তথাপি তোমার উচিত যে, তুমি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জ্জন কর, এবং তদনুসারে চল।

৮। সম্ভবতঃ রাজা মূর্খ, এবং পদে পদে মন্ত্রীর কাজে বাধা দেয়, তথাপি মন্ত্রীর কর্ত্তব্য এই যে, সে রাজাকে সেই পথ দেখাইয়া দিবে, যাহা ন্যায্য এবং যুক্তিযুক্ত।

৯। দেখ, যে মন্ত্রী মন্ত্রণা-গৃহে বসিয়া নিজ রাজার সর্ব্বনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করে, সে সাত কোটী শত্রু অপেক্ষাও ভয়াবহ।

১০। অস্থির-চিত্ত ব্যক্তিরা যদি নিপুণ পরিকল্পনা করিতেও সক্ষম হয়, তথাপি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় তাহারা ইতস্ততঃ করিবে এবং নিজ অভিপ্রায় কখনো পূর্ণ করিতে পারিবে না।

পঞ্চষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

বাক্‌পটুতা

১। বাক্‌শক্তি নিঃসন্দেহই ভগবদ্দত্ত বর। উহা অন্য কোনো বরের অংশ নহে—উহা একটী স্বতন্ত্র বর।

২। জীবন ও মৃত্যু (১) জিহ্বার অধীন। অতএব মনে রাখিও, যেন তোমার মুখ দিয়া কোনো অনুচিত বাক্য নির্গত না হয়।

৩। দেখ, যে বাক্য মিত্রগণকে আরো ঘনিষ্টতা-সূত্রে আবদ্ধ করে, এবং শত্রুগণকে বক্তার দিকে আকৃষ্ট করে, তাহাই যথার্থ বাক্য-পদ-বাচ্য।

৪। প্রত্যেক ঘটনা ভাল করিয়া ওজন করিয়া দেখ এবং তাহার পর যাহা বলা উচিত তাহা বল। সাধুতা-বৃদ্ধি ও লাভের দৃষ্টিতে ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বস্তু তোমার পক্ষে আর নাই।

৫। তোমার বক্তৃতা এরূপ হউক যে, অন্যের বক্তৃতা দ্বারা উহা নিরুত্তর হইতে না পারে।

৬। শ্রোতৃবর্গের চিত্ত অধিকার করিয়া লইতে পারার মত বক্তৃতা করিতে সক্ষম হওয়া, এবং অন্যের বক্তৃতার

---

(১) ভাল-মন্দ ; সম্পদ-বিপদ।

মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিতে পারা—নিপুণ নীতিজ্ঞের শক্তি।

৭। দেখ, যে ব্যক্তি সুবক্তা, এবং হতবুদ্ধি বা ভীত হয় না, তাহাকে বিচারে পরাস্ত করা অসম্ভব।

৮। যাহার বক্তৃতা সুবিন্যস্ত এবং বিশ্বাসোৎপাদক ভাষায় সম্বদ্ধ, তাহার সঙ্কেতে সমগ্র জগৎ চালিত হইবে।

৯। যাহারা অল্প ও নির্ব্বাচিত শব্দে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে না, তাহাদের অধিক কথা বলিবার প্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ।

১০। দেখ, যাহারা অর্জ্জিত জ্ঞান অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারে না, তাহারা সেই ফুলের মত, যাহা প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু সৌরভ দেয় না।

ষট্‌ষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

কার্য্যের পবিত্রতা

১। মিত্রতা হইতে মনুষ্যের সফলতা লাভ হয়। কিন্তু আচরণের পবিত্রতা হইতে তাহার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

২। যে সকল কার্য্য হইতে স্থায়ী লাভ হয় না বা সুকীর্ত্তি অর্জ্জন করা যায় না, তাহা হইতে সর্ব্বদা বিমুখ থাকিবে।

৩। যাহারা সংসারে থাকিয়া উন্নতি করিতে চাহে, তাহাদের এরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকা উচিত, যাহা দ্বারা তাহাদিগের যশঃ মলিন হইতে পারে।

৪। যাহাদের বস্তুসমূহের যথার্থ পরিমাণের জ্ঞান আছে, তাহারা দুঃসময়ে পতিত হইলেও অযশস্কর ও কদর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া নীচতা দেখাইবে না।

৫। কোনো ব্যক্তি যেন এমন কোনো কাজ না করে যাহা করিয়া তাহাকে বলিতে হয় "আমি কি কাজ করিলাম?" যদি সে এমন কোনো কাজ করিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে পুনরায় সেরূপ কার্য্য না করাই উচিত।

৬। ভাল লোকেরা যে সকল কার্য্য গর্হিত বিবেচনা করেন, জন্মদাত্রী মাতাকে অনশন হইতে রক্ষা করিবার জন্যও তাহা করা উচিত নয়।

৭। সদাচারী পুরুষের পক্ষে নিন্দ্য কর্ম্মের দ্বারা সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা দারিদ্র্যও অনেক ভাল।

৮। সুনীতি যে সকল বিষয়কে গর্হিত বলে, তাহা যাহারা পরিত্যাগ না করে, তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইলেও তাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে।

৯। অপরকে কাঁদাইয়া নিষ্পীড়ন দ্বারা যাহা সংগৃহীত হয়, তাহা ক্রন্দনের মধ্য দিয়াই তিরোহিত হয়; কিন্তু যাহা সদুপায়ে অর্জ্জিত হয়, তাহা কিছুকালের জন্য ক্ষীণ হইয়া গেলেও শেষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

১০। প্রতারণা দ্বারা ধন-সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করা, কাঁচা মৃৎপাত্রে জল রাখিবার চেষ্টা করার সমান।

সপ্তষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

চরিত্রের দৃঢ়তা

১। কোনো কার্য্যে সফলতা প্রাপ্ত হওয়ার মহত্ত্ব, উহা নিষ্পন্ন করিবার জন্য মহান্ ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগের মহত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নয়।

২। যে সকল কার্য্যে অসফলতা অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইতে দূরে থাকা, এবং বাধাবিঘ্ন হইতে ভীত না হইয়া নিজ কার্য্যে অবিচলিত থাকা—এই দুইটী জ্ঞানী ব্যক্তিদের পথপ্রদর্শক নীতি বলিয়া কথিত হয়।

৩। কার্য্যকুশল ব্যক্তি কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, কারণ অকালে উহা ব্যক্ত হইলে এমন সকল বাধা উপস্থিত হইতে পারে, যাহা অনতিক্রমণীয়।

৪। লোকের পক্ষে কোনো কার্য্য সম্বন্ধে কথা বলা সহজ; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উহা সম্পন্ন করিতে পারা বিরল ঘটনা।

৫। যে সকল ব্যক্তি মহৎ কার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের সাহায্য রাজা দ্বারা প্রার্থিত হইবে, এবং সকলের দ্বারা সমাদৃত হইবে।

৬। তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে, লোকে তাহা ঠিক সেই ভাবেই ইচ্ছা করিবে, যদি তাহারা সমগ্র শক্তি দ্বারা তাহা ইচ্ছা করে।

৭। আকার দেখিয়া কাহাকেও হেয়-জ্ঞান করিও না, কারণ ধরাতলে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা ধাবমান বৃহৎ রথের ধুরীর কীলকের ন্যায় ক্ষুদ্র।

৮। যখন তুমি বুদ্ধি ঠিক রাখিয়া কোনো কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছ, তখন দ্বিধা বোধ না করিয়া সবলে তোমার উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিবে।

৯। যে সকল কার্য্য দ্বারা (মনুষ্যজাতির) সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হও, এবং তাহা সম্পন্ন করিতে যদি দারুণ নিগ্রহ ভোগও করিতে হয়, তবু হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে অভিনিবিষ্ট থাক।

১০। যাহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা নাই, তাহারা অন্য দিকে যত বড়ই হউক না কেন, জগতের নিকট সমাদর পাইবে না।

অষ্টষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

কার্য্য-পরিচালন

১। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বিচারের উদ্দেশ্য; এবং যখন কোনো বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল; তখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করা ভুল।

২। যে সকল কার্য্য অবসর মত করা উচিত, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক করিও। কিন্তু যে সকল কার্য্য অবিলম্বে করা আবশ্যক, তাহা ক্ষণমাত্রের জন্যও ফেলিয়া রাখিও না।

৩। যদি অবস্থা অনুকূল হয়, তাহা হইলে সোজাসুজী নিজ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হও। যদি অবস্থা অনুকূল না হয়, তবে সেই পথে চল, যাহাতে কম বাধা পাইবার সম্ভাবনা।

৪। অর্দ্ধ-সম্পন্ন কার্য্য ও অপরাজিত শত্রু অনির্ব্বাপিত অগ্নি-সদৃশ। তাহারা সত্বর বাড়িয়া উঠিবে এবং সেই অনবহিত ব্যক্তিকে অভিভূত করিবে।

৫। প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় পাঁচটী কথা মনে রাখিতে হইবে—উপস্থিত উপায়, সাধন, কার্য্যটীর স্বরূপ, উপযুক্ত সময় এবং ঐ কার্য্য করিবার উপযুক্ত স্থান।

৬। কার্য্যটী করিতে কিরূপ পরিশ্রম আবশ্যক, কি কি বাধা উপস্থিত হইবে এবং কি পরিমাণ ফল-লাভের আশা করা যাইতে পারে—এই সকল কথা প্রথমে চিন্তা করিয়া, তবে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে।

৭। কোনো কার্য্যে ফল-লাভ করিবার পথ এই যে ব্যক্তি ঐ কার্য্যে দক্ষ তাহার নিকট হইতে উহার রহস্য জানিয়া লওয়া।

৮। লোকে এক হস্তীর সাহায্যে অন্য হস্তীকে পাশবদ্ধ করে। ঠিক সেইরূপেই এক দুষ্কর কার্য্যকে অন্য দুষ্কর কার্য্যের সাধন করিয়া লওয়া উচিত।

৯। মিত্রগণকে পারিতোষিক দেওয়া অপেক্ষা শত্রুগণকে শান্ত করিতে ও বন্ধু করিয়া লইতে অধিক ক্ষিপ্রতা দেখাও।

১০। যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের জীবন সর্ব্বদা নিরাপদ রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এবং সুবিধা পাইলেই যাহারা বলবান হইতে পারে তাহাদের সহিত মিত্রতা করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ঊনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

রাজ-দূত (১)

১। অনুরাগী প্রকৃতি, উচ্চ কুল ও রাজ-হৃদয়-হারী আচরণ—এইগুলিই রাজদূতের গুণ।

২। রাজভক্তি, ক্ষিপ্র অনুধাবন-শক্তি ও বাক্‌পটুতা—এই তিনটী রাজদূতের অপরিহার্য্য গুণ।

৩। যে ব্যক্তি রাজন্যবর্গের সমক্ষে স্বীয় প্রভুর হিতকারী কথা বলিবার ভার গ্রহণ করে, তাহার শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হওয়া আবশ্যক।

৪। যে ব্যক্তি ব্যবহারিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন, বিদ্বান্ এবং সম্ভ্রমোৎপাদক-আকৃতি-বিশিষ্ট, (২) তাহারই রাজদূতের কার্য্যে যাওয়া উচিত।

৫। সংযত ভাষা, বাঙ্-মাধুর্য্য ও অপ্রিয় বাক্য সযত্নে বর্জ্জন—এই উপায়গুলি দ্বারা রাজদূত নিজ প্রভুর উপকার সাধন করিবে।

---

(১) প্রথম সাতটী পদে সেই সকল রাজদূতের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের নিজ দায়িত্বে কাজ করিবার অধিকার আছে। শেষের তিনটী পদে সেই সকল রাজদূতের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা রাজার সন্দেশ বাহক মাত্র।

(২) সম্ভ্রমোৎপাদক আকৃতির লক্ষণ মনুস্মৃতি ৭.৬৪তে এবং শুক্রনীতির ১.১৭৪ ও ১.১৭৫তে উক্ত হইয়াছে।

৬। পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা, প্রভাবশালী ভাষা, এবং কোন্ অবস্থায় কি করা উচিত্ তাহা নির্দ্ধারণ করার স্বাভাবিক জ্ঞান—এইগুলি রাজদূতের প্রয়োজনীয় গুণ।

৭। সেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত রাজদূত, যাহার স্থান ও কাল নির্ব্বাচন-বিষয়ে সম্যক্ দৃষ্টি আছে, যে স্বীয় কর্ত্তব্য জানে, এবং যে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা কি প্রকারে ব্যক্ত করিবে ভাবিয়া লয়।

৮। যে ব্যক্তি দৌত্যে প্রেরিত হয়, তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পবিত্র হৃদয় এবং চিত্তাকর্ষক আচরণ থাকা প্রয়োজন।

৯। যে দৃঢ়-সঙ্কল্প ব্যক্তি নিজ মুখ হইতে নিস্তেজ ও অযথা কথা বাহির হইতে দেয় না, সেই-ই বিদেশী রাজ-সভায় রাজ-সন্দেশ নিবেদন করার যোগ্য পাত্র।

১০। মৃত্যু সম্মুখীন হইলেও প্রবীণ রাজ-দূত নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইবে না, এবং নিজ প্রভুর হিত-সাধনে যত্নবান্ হইবে।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

রাজ-সকাশে আচরণ

১। যে কেহ রাজ-সংসর্গে থাকিতে চাহে, তাহার সেই ব্যক্তির মত ব্যবহার করা উচিত, যে অগ্নির সম্মুখে বসিয়া অগ্নি-সেবন করে। সে যেন অতি নিকটে উপস্থিত না হয়, অথবা অতি দূরেও অবস্থান না করে।

২। রাজার যে সকল বস্তু ভাল লাগে, সে সকল বস্তুতে যেন তোমার লোভ না হয়—ইহাই রাজার স্থায়ী প্রসাদ লাভ করিবার এবং সমৃদ্ধিশালী হইবার মূলমন্ত্র।

৩। যদি তুমি রাজার বিরাগভাজন হইতে না চাও, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার গুরু দোষ হইতে দূরে থাক, কেন না যদি একবার তাঁহার মনে সন্দেহের উদ্ভব হয়, তাহা দূর করার সাধ্য কাহারো হইবে না।

৪। বড় লোকের সমক্ষে কাহারো সহিত কানাকানি করিও না, অথবা যখন তাঁহারা নিকটে থাকিবেন তখন কাহারো মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাস্য করিও না।

৫। গোপনে কোনো কথাবার্ত্তা শুনিবার চেষ্টা করিও না, এবং যে কথা তোমাকে বলা হয় নাই, তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিও না। যখন তোমাকে বলা হইবে তখনই রহস্যটী জানিতে পারিবে।

৬। রাজার চিত্তের গতি এ-সময়ে কিরূপ, এবং এখন সুযোগ আছে কি না, ইহা প্রথমে দেখিয়া লও, এবং তাহার পর মধুর ভাবে এমন শব্দ ব্যবহার কর যাহাতে তাঁহার সন্তোষ হয়।

৭। রাজার নিকট সেই সকল প্রসঙ্গের উত্থাপন করিবে, যাহা তাঁহার ভাল লাগে, কিন্তু যে সকল প্রসঙ্গে কোনো লাভ নাই, রাজা ইচ্ছা করিলেও, সে সকল কথায় থাকিও না।

৮। রাজা যুবা, এবং তোমার আত্মীয় বা কুটুম্ব বলিয়া তাঁহার প্রতি যেন তোমার সম্ভ্রমের ত্রুটি না হয়; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে মর্য্যাদা বিদ্যমান, তাহার সম্মুখে তুমি সসম্ভ্রমে গমনাগমন করিবে।

৯। যাহাদের দৃষ্টি স্পষ্ট ও নির্ম্মল, তাহারা আপনাদিগকে রাজার প্রিয়পাত্র জানিয়াও তাঁহার অপ্রীতিকর কোনো কার্য্য করে না।

১০। যে ব্যক্তি রাজার সহিত তাহার ঘনিষ্টতার উপর নির্ভর করিয়া অযোগ্য কাজ করিয়া বসে, তাহাকে বিনষ্ট হইতে হইবে।

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

মুখাকৃতি হইতে মনোভাব নিরূপণ

১। দেখ, যে ব্যক্তি জিহ্বা দ্বারা ব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বেই মনোভাব বুঝিয়া লয়, সে সমগ্র জগতের ভূষণ-স্বরূপ।

২। মনে যে কথা আছে, তাহা যে ব্যক্তি নিশ্চয়তা পূর্ব্বক অনুমান করিয়া লইতে পারে, তাহাকে দেবতা বলিয়া জানিও।

৩। যে ব্যক্তিরা আকৃতি দেখিয়া লোকের উদ্দেশ্য অনুমান করিতে পারে, তাহাদিগকে যে-কোনো প্রকারে হউক অবশ্য তুমি তোমার পরামর্শদাতা করিয়া লইও।

৪। যাহারা না বলিতেই মনোভাব বুঝিতে পারে এবং যাহারা পারে না, উভয়েই একই প্রকার আকৃতি-বিশিষ্ট হইলেও, প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের শ্রেণী পৃথক্।

৫। এক দৃষ্টিপাতেই যদি চক্ষু মনের কথা বুঝিতে না পারে, তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ মধ্যে তাহার বিশেষত্ব কোথায় ?

৬। যেমন স্ফটিক নিজের রং বদলাইয়া পার্শ্বস্থ বস্তুর রং গ্রহণ করে, ঠিক সেই প্রকারেই মুখ নিজ ভাব

বদলাইয়া মন যে ভাবে পরিপ্লুত আছে, সেই ভাব গ্রহণ করে।

৭। মুখাকৃতি অপেক্ষা অধিক ভাব-ব্যঞ্জক বস্তু আর কি আছে? কেন না, মন তুষ্টই থাকুক অথবা রুষ্ট, সর্ব্বপ্রথমে মুখাকৃতিই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়।

৮। যদি তুমি এমন কোনো ব্যক্তি পাও, যে না বলিতেই মনোভাব বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতি তোমার একবার চাওয়াই যথেষ্ঠ—তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া যাইবে।

৯। যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে যে হাব-ভাব, ধরণ-ধারণ বুঝিতে সক্ষম, তবে একমাত্র চক্ষুই তাহাকে বলিয়া দিবে যে হৃদয়ে প্রেম আছে বা ঘৃণা।

১০। যাহারা আপনাদিগকে চতুর বলে, তাহাদের মানদণ্ড চক্ষু ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রোতৃবর্গ সম্মুখে আত্ম-বিশ্বাস

১। হে মহোদয়গণ! যাহারা বাগ্মিতার আলোচনা করিয়াছ ও সুরুচি শিক্ষা করিয়াছ, শ্রোতৃবর্গকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তোমার বক্তৃতা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী করিয়া গঠিত কর।

২। হে বাগ্মিতাগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! প্রথমে তোমাদের শ্রোতাগণের মানসিক অবস্থা বুঝিয়া লও এবং তৎপরে বিবেচনা পূর্ব্বক ভাষণ আরম্ভ কর।

৩। যাহারা শ্রোতৃমণ্ডলের প্রকৃতির পরিচয় না লইয়াই বক্তৃতা দিতে অগ্রসর হয়, তাহারা বক্তৃতা-কলা বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং অন্যান্য বিষয়েও অকর্ম্মণ্য।

৪। বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সভাতেই জ্ঞান ও বিদ্যার আলোচনা করিও। মূর্খ ব্যক্তিদের নিকট পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত সরল কথা ব্যবহার করিবে।

৫। সেই আত্ম-সংযমই ধন্য, যাহা মনুষ্যকে প্রাচীন-দের সভায় নেতৃত্ব গ্রহণে বিরত করে। এই গুণ অন্যান্য গুণের ঔজ্জ্বল্যকে অতিক্রম করে।

৬। জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমক্ষে যে ব্যক্তি অনবহিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলে,

সে নিজেকে সাধু-মার্গ হইতে পতিত বলিয়া অনুভব করিবে।

৭। বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্বত্তা সুনিপুণ সমালোচক-সমাজেই পূর্ণতেজে প্রভান্বিত হয়।

৮। ধীমান্ ব্যক্তিদের সমক্ষে উপদেশপূর্ণ ব্যাখ্যান দেওয়া, জীবিত বৃক্ষমূলে জল-সেচন-তুল্য।

৯। যাহারা গুণী-সমাজে স্বীয় ভাষণ অনুমোদিত হউক ইচ্ছা করে, তাহারা যেন ভ্রমক্রমেও কখনো নির্ব্বোধ শ্রোতৃমণ্ডলের সম্মুখে বক্তৃতা না করে।

১০। যাহারা তোমার প্রতিকূল, তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়া, মল-দূষিত ভূমির উপর অমৃত নিক্ষেপ করার তুল্য।

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রোতৃগণ সম্মুখে আত্ম-নির্ভরতা

১। যাহারা বাক্-পটুতা অনুশীলন ও সুরুচি শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা তাহাদের ভাষণ সুবিন্যস্ত করিতে জানে এবং বিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের নিকট কখনো অপ্রতিভ হয় না।

২। যে ব্যক্তি বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পারে, সে বিদ্বান্ অপেক্ষাও বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার লোক অনেক আছে; কিন্তু জনতার সম্মুখে ব্যাখ্যানমঞ্চের উপর অকম্পিত হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইবার লোক বিরল।

৪। যে জ্ঞান তুমি আয়ত্ত করিয়াছ তাহা বিদ্বৎ-সমাজে নির্ভয়ে ব্যক্ত কর; এবং যাহা তুমি জান না, তাহা পারদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট শিখিয়া লও।

৫। তর্ক-শাস্ত্রে নিপুণ হও। তাহা হইলে, যে সমাজেই তুমি যাও না কেন, নির্ভয়ে কথা কহিতে পারিবে।

৬। যাহাদের সাহস নাই, তাহাদের কৃপাণের

আবশ্যকতা কি ? যাহারা জ্ঞানী-সমাজের সম্মুখীন হইতে ভয় করে, তাহাদের পুস্তকের আবশ্যকতা কি ?

৭। রণক্ষেত্রে নপুংসকের হস্তে তরবারী থাকারও যে ফল, আর বিদ্বৎ-সমাজের সম্মুখীন হইয়া যে ভয় পায়, তাহার বিদ্যা থাকারও সেই ফল।

৮। যে ব্যক্তিরা বিদ্বৎ-সমাজে নিজেদের মতের তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রবেশ করাইতে পারে না, তাহাদের নানা-বিষয়িনী বিদ্যা থাকিলেও, তাহারা অকর্ম্মণ্য।

৯। যাহারা বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও গুণীগণের সম্মুখীন হইতে ভীত, তাহারা মূর্খাপেক্ষাও হীন।

১০। যাহারা জনতার সম্মুখে গিয়া ভীত হয়, এবং যাহা তাহারা অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহা বুঝাইতে অক্ষম, তাহারা শ্বাস গ্রহণ করে বটে, কিন্তু মৃত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নয়।

চতুঃসপ্ততিম পরিচ্ছেদ

রাজ্য

১। যে দেশে শস্যোৎপত্তির ত্রুটি নাই, এবং যে দেশে জ্ঞানী সাধুগণের ও গুণী ধনীদের বাস, সেই দেশই মহান্ দেশ।

২। ধনের প্রচুরতা বশতঃ মনুষ্যগণ যে দেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়, শস্যের হানিকর নৈসর্গিক উৎপাত হইতে মুক্ত বলিয়া যে দেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সেই দেশই মহান্।

৩। সেই মহতী জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যাহার স্কন্ধে ভারের উপর ভার পড়িলেও সে সধৈর্য্যে তাহা সহ্য করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেয় কর পূর্ণমাত্রায় শোধ করে।

৪। যে দেশ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতে মুক্ত, এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত, সেই দেশই মহান্।

৫। যে জাতি পরস্পর বিবদমান দলে বিভক্ত নয়, যাহা জিঘাংসু বিপ্লবীদল হইতে মুক্ত, যাহার মধ্যে সর্ব্বনাশ-সাধক দেশদ্রোহী নাই, সেই জাতিই মহান্।

৬। দেখ, যে দেশ কখনো শত্রুহস্তে বিধ্বস্ত হয় নাই, এবং যদি বা কখনো হইয়াও যায়, তবুও তাহার

শস্যোৎপাদনের অনুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না, সেই দেশ সকল দেশের রত্ন নামে অভিহিত হইবে।

৭। ধরাপৃষ্ঠস্থ জল, ভূগর্ভস্থ সলিল, কালোচিত বর্ষণ, সুসংস্থিত পর্ব্বতমালা এবং সুদৃঢ় দুর্গনিচয়—এই সকল বস্তু প্রত্যেক দেশের পক্ষে অপরিহার্য্য।

৮। ধনসম্পত্তি, প্রচুর শস্যোৎপত্তি, প্রজাবর্গের স্বচ্ছন্দ অবস্থা, নীরোগিতা, শত্রু-আক্রমণ হইতে অভয়—এই পাঁচটী বিষয় রাজ্যের ভূষণ।

৯। সেই দেশই দেশপদবাচ্য, যেখানে বিনা আয়াসে প্রচুর শস্য জন্মে। কিন্তু যে দেশের শস্যোৎপত্তি পরিশ্রম-সাপেক্ষ তাহা ঐ নামের যোগ্য নয়।

১০। দেশে এই সকল সুখ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উহা মূল্যহীন, যদি উহা যোগ্য রাজার সুশাসন-সুখে বঞ্চিত হয়।

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

দুর্গ

১। যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদের আত্মরক্ষাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। তাহাদের পক্ষে দুর্গ অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু বলবান্ শক্তিশালী ব্যক্তিদেরও উহা কম উপকারী নয়।

২। জল-স্রোত, মরুভূমি ও সঘন বন—এগুলিও রক্ষাত্মক প্রতিবন্ধকের কাজ করে। (১)

৩। উচ্চতা, ঘনতা, দৃঢ়তা ও অজেয়তা—এই চারিটী, স্থাপত্য-বিজ্ঞানানুসারে দুর্গসমূহের অত্যাবশ্যক গুণ।

৪। সেই দুর্গই সর্ব্বোত্তম, যাহাতে দুর্ব্বল অংশ অতি বিরল, এবং তৎসঙ্গে যাহা বিস্তার-বিশিষ্ট, এবং যাহা অধিকারাকাঙ্ক্ষী শত্রুদলের প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করিতে সক্ষম।

৫। অজেয়ত্ব, দুর্গে অবস্থিত সৈন্যের আত্মরক্ষার সুবিধা এবং খাদ্য ও প্রসাধনের প্রাচুর্য্য—এইগুলি দুর্গের পক্ষে অত্যাবশ্যক বস্তু।

---

(১) কামন্দক ১১.৫৬।

৬। সেই দুর্গ ই দুর্গ, যাহাতে নানাপ্রকারের অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান—যাহা এরূপ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সংরক্ষণে আছে, যাঁহারা দুর্গ-রক্ষা-কল্পে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিবে।

৭। নিঃসন্দেহ তাহাই প্রকৃত দুর্গ, যাহা কেহ ঘিরিয়া ফেলিয়া, বা অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া বা সুড়ঙ্গ কাটিয়া অধিকার করিতে পারে না।

৮। নিঃসন্দেহ তাহাই যথার্থ দুর্গ, যেখানে অবরোধ-কারিগণের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও, দুর্গস্থ সৈনিকগণ শত্রু-গণকে পরাজিত করিতে সক্ষম হয়।

৯। নিঃসন্দেহ তাহাই দুর্গ, যাহা নানাবিধ পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা অজেয় হইয়া রহিয়াছে, এবং যাহা রক্ষকগণকে এরূপ সুদক্ষ করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা শত্রুদিগকে দুর্গের সুদূর সীমাতেই পরাজিত করিতে সক্ষম।

১০। কিন্তু দুর্গ যতই দৃঢ় হউক না কেন, উহা কোনো কাজেরই হইবে না, যদি সংরক্ষকগণ যথাসময়ে ত্বরান্বিত হইয়া উদ্যম প্রদর্শন না করে।

ষষ্ঠসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

ধনোপার্জ্জন

১। অপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে ধনের সমান আর কিছুই নাই।

২। দরিদ্রকে ঘৃণার চক্ষে সকলেই দেখে, কিন্তু বিত্তশালী ব্যক্তির আদর সর্ব্বত্র হয়।

৩। সেই নিষ্কম্প আলোক-শিখা যাহাকে লোকে ধন বলে, স্বীয় অধিকারীর সকল অন্ধকারময় (১) স্থানকে আলোকপূর্ণ করে।

৪। দেখ, যে-ধন নিষ্কলঙ্ক উপায়ে লব্ধ হয়, তাহা হইতে সাধুতা ও আনন্দের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়।

৫। যে-ধন দয়া ও মমতা-বর্জ্জিত, তুমি কখনো তাহার প্রয়াসী হইও না এবং স্বহস্তে তাহা স্পর্শ করিও না।

---

(১) অন্ধকার শব্দ দ্বারা মূলের যে শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ অপকার এবং শত্রুতাও হয়। পরিমলেলকর এই পদের অর্থ বলেন—ধন থাকিলে রাজা যে কোনো রাজ্য আক্রমণ করিতে ও শত্রুদমন করিতে পারে।

৬। রাজ-কবলিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত ধন, পণ্য-শুল্ক এবং যুদ্ধে গৃহীত দ্রব্য—এইগুলি রাজকোষ বর্দ্ধনে সহায়তা করে।

৭। প্রেমের দয়ারূপী সন্ততির পালন-পোষণের জন্য ধনরূপিণী দয়ার্দ্র-হৃদয়া ধাত্রীর প্রয়োজন।

৮। যখন ধনবান্ ব্যক্তি কোনো উদ্যমে নিযুক্ত হয়, তখন সে সেই ব্যক্তির ন্যায় অনুমিত হয়, যে উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে হস্তী-যুদ্ধ দেখে। (২)

৯। ধন-সঞ্চয় কর ; কারণ শত্রুর দম্ভ-চ্ছেদন করিতে ধনাপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র আর নাই।

১০। যে ব্যক্তি সদুপায়ে বহু ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, অপর দুইটী পুরুষার্থ—ধর্ম্ম ও কাম—তাহার করতলগত।

(২) কেন না নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া সে নিজের কাজ করিতে পারে।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

সেনার লক্ষণ

১। রাজাধিকার-ভুক্ত পদার্থ-সমূহ মধ্যে সুগঠিত, বলবান ও বিপদে নির্ভীক সেনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২। বহুদর্শী রণকুশল যোদ্ধারাই (১) নিরাশাপ্রদ অবস্থায় উৎকট প্রতিজ্ঞা দ্বারা অগণিত সৈন্য-ক্ষয়কারী আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়া অবিজিত থাকিতে পারে।

৩। যদি তাহারা সমুদ্রের ন্যায় গর্জন করিতে থাকে, তাহাতে কি? কৃষ্ণসর্পের একটী মাত্র নিঃশ্বাসে মূষিক-সেনা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

৪। যে সেনা কখনো হারিতে জানে না, যাহা কখনো উৎকোচের প্রলোভনে কলুষিত হয় না, যাহার পশ্চাতে বিক্রমের সুদীর্ঘ খ্যাতি আছে, সেই সেনাই সেনা নামের যোগ্য।

৫। সেনা নাম যথার্থ তাহারই শোভা পায়, যাহা সবিক্রমে যমরাজের সম্মুখীন হইতে পারে, যখন তিনি পূর্ণ প্রচণ্ডতার সহিত তাহার বিপক্ষে অগ্রসর হন।

(১) পরিমলেলকর "তোল পড়ই" শব্দের অর্থ বলেন-যে সকল সৈন্য পুরুষানুক্রমে রাজবংশানুরাগী।

৬। বীরত্ব, আত্মসম্মান-জ্ঞান, বিশৃঙ্খলার মধ্যেও মতি স্থির রাখা, (২) এবং শৌর্য্যের নিষ্কলঙ্ক নীতির প্রতি অনুরাগ—এই চারিটাই সেনার রক্ষাকবচ।

৭। যাহা সেনা নামের প্রকৃত অধিকারী তাহা শত্রু-আক্রমণে সদা প্রস্তুত, কারণ তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, যদি কোনো শত্রু তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চয়ই বিজয়ী হইবে।

৮। প্রবল আক্রমণের অক্ষমতা বা দৃঢ়সঙ্কল্পের অভাব থাকিলেও যুদ্ধোপকরণের শ্রেষ্ঠতার জন্য জয়-লাভ হইতে পারে।

৯। সেনা অবশ্য জয়লাভ করিবে, যদি সে সংখ্যায় হীনতর না হয়, যদি তাহার মধ্যে অপ্রশমনীয় ঈর্ষা বা দ্বেষ না থাকে এবং যদি তাহাকে বেতনাভাবে অনাহারে মরিতে না হয়।

১০। পদাতি-সৈন্যের অভাব না থাকিলেও, পরি-চালনক্ষম জন্য নায়কের অভাব থাকিলে সেনা সেনা-পদ-বাচ্য হয় না।

(২) পরিমলেলকর "তেত্রম" শব্দের অর্থ বলেন—বিশ্বাসিত।

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

বীর যোদ্ধার আত্মোৎসর্গ

১। রে শত্রুগণ, আমার প্রভুর সম্মুখীন হইস্ না, কেননা অনেক লোকে ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহারা সমাধি-প্রস্তর-খণ্ডের (১) নিম্নে অবস্থিত।

২। হস্তীর প্রতি নিক্ষিপ্ত ভল্ল লক্ষভ্রষ্ট হইলেও শশকের উপর চালিত লক্ষভেদী ভল্লাপেক্ষা অধিক গৌরবপ্রদ। (২)

৩। যে প্রচণ্ড সাহস প্রবল আঘাত করে, তাহাকেই বীরত্ব বলে; কিন্তু যখন তাহা শত্রুর প্রতি সৌজন্যপূর্ণ উদারতা দেখাইত সমর্থ হয়, তখনই তাহার মহত্ত্ব।

(১) তামিল দেশে বীরপুরুষদের চিতা ও গোরের উপর কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ একখানি পাথর পুতিয়া দেওয়া হয়।

(২) Higher aims are in themselves more valuable even if unfulfilled than lower ones quite attained.

How far high failure overleaps the board of low successes.—Morris.

৪। যোদ্ধা নিজের ভল্ল কোনো হস্তীর উপর নিক্ষেপ করিয়া যেমন অপর একটী ভল্ল খুঁজিতেছে, অমনি দেখিল যে, একটী ভল্ল তাঁহার নিজ শরীরে বিদ্ধ হইয়া আছে, এবং তাহা বাহির করিতে করিতে আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিল। (৩)

৫। বীরপুরুষের উপর ভল্ল নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাঁহার চক্ষু ক্ষণকালের জন্য সঙ্কুচিত হইল। ইহা কি তাঁহার পক্ষে লজ্জার কথা নয়?

৬। বীরপুরুষ যে সব দিনে স্বীয় দেহে গভীর ক্ষত প্রাপ্ত না হন, তিনি সে দিনগুলি বৃথা নষ্ট হইয়া গেল বলিয়া মনে করেন।

৭। নিজ প্রাণের মায়া না করিয়া যাহারা ভুবন-বিশ্রুত খ্যাতির জন্য ব্যগ্র, তাহাদের পক্ষে (বামপদে) পরিহিত লৌহ-বেষ্টন তাহাদের চক্ষুর আনন্দবর্দ্ধক। (৪)

৮। দেখ, যে বীরপুরুষেরা রণ-প্রাঙ্গণে গিয়া প্রাণের ভয় করে না, তাহাদের নায়কেরা তাহাদের প্রতি

(৩) যন্ত্রণা বোধ না করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইল। ইহার একটী কারণ এই যে, সে একটী ভল্ল হাতের কাছে পাইল—খুঁজিবার কষ্ট করিতে হইল না।

(৪) যখন তামিল দেশ স্বাধীন ছিল, তখন অবিজিত বীর যোদ্ধারা বামপদে লৌহ-বেষ্টন পরিধান করিত।

কঠোরতা দেখাইলেও তাহারা সৈন্যজনোচিত নিয়মানু-বর্ত্তিতা বিস্মৃত হয় না। (৫)

৯। যে-কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সম্পন্ন করার উদ্যোগে যাহারা প্রাণপাত করে, তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিবার অধিকার কাহার আছে? (৬)

১০। যদি কোনো ব্যক্তি এমন ভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে যে, তাহাতে তাহার প্রভুর চক্ষে জল আসে, তবে সেরূপ মৃত্যুর জন্য অনেকে প্রার্থী হইতে পারে।

(৫) তাহারা তাহাদের নায়কদের কঠিন নিষেধ সত্ত্বেও নিঃসঙ্কোচে আপনাদিগকে বিপদে ফেলে।

(৬) সেনেকা বলিয়াছেন, "কেহ বলে না যে ঐ তিনশত ফেবিয়াই সেনা বিজিত হইয়াছিল; লোকে বলে যে তাহারা হত হইয়াছিল।"

উনাশীতিতম পরিচ্ছেদ

মিত্রতা

১। পৃথিবীতে এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহা মিত্রতা-লাভ করার ন্যায় কঠিন? এবং শত্রু-চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিতে ইহার সমান আর কোন্ সুদৃঢ় কবচ আছে?

২। গুণী ব্যক্তির মিত্রতা বর্দ্ধনশীল শশিকলার ন্যায়, এবং অল্প-মতি ব্যক্তির মিত্রতা অপচীয়মান চন্দ্র-লেখায় ন্যায়।

৩। যোগ্য ব্যক্তিদের মিত্রতা উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাধ্যয়ন-সদৃশ; যতই তাহাদের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ততই তাহাদের রমণীয়তা প্রতীয়মান হইবে।

৪। মিত্রতার উদ্দেশ্য হাস্য-পরিহাস নয়; বরং যখন পরস্পরের মধ্যে কেহ স্খলিত-চরিত্র হয়, তখন তাহাকে নিরস্ত ও ভৎর্সনা করা।

৫। মিত্রতার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ দেখা-সাক্ষাৎ ও সাহচর্য্য বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। হৃদয়ের সংযোগই মিত্রতার বন্ধনকে সুদৃঢ় কবে।

৬। যে সাহচর্য্যে দর্শনমাত্রই মুখে হাসি দেখা দেয় তাহার নাম মিত্রতা নয়, প্রত্যুত যে প্রেম হৃদয়কে হর্ষোৎফুল্ল করে, সেই প্রেমই যথার্থ মিত্রতা।

৭। যে ব্যক্তি তোমাকে অন্যায় হইতে নিবৃত্ত করে, সৎপথে চালিত করে, এবং দুরবস্থায় তোমার সঙ্গী হয়, সেই তোমার মিত্র।

৮। দেখ, যে ব্যক্তির বসন বায়ু-সঞ্চালন বশতঃ দেহ-ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার হাত যেমন ব্যস্ততার সহিত দেহকে পুনরাবৃত করিবার জন্য তৎপর হয়, তেমনই দুর্দ্দশায় পতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য যে জন ধাবিত হয়, তাহার কার্য্যেই যথার্থ বন্ধুত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়।

৯। মিত্রতার বিচারাসন কোথা? ঠিক সেইস্থানে, যেখানে দুইটী হৃদয় সমভাবে স্পন্দিত হয়, এবং একযোগে পরস্পরকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিতে নিযুক্ত থাকে।

১০। "আমি উহাকে এত ভালবাসি," "সে আমাকে এত ভালবাসে,"—এই বলিয়া যতই শ্লাঘা করা হউক না কেন, যে বন্ধুত্বের এরূপ পরিমাণ করা চলে, তাহাতে এক প্রকার দৈন্যই প্রকাশ পায়।

আশীতিতম পরিচ্ছেদ

মিত্রতার উপযুক্ত পাত্র নির্ণয়

১। পরীক্ষা না করিয়া যাহার-তাহার সহিত মিত্রতা করা অপেক্ষা হানিকর কার্য্য আর নাই, কেন না একবার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে সহৃদয় ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করে না।

২। দেখ, যে ব্যক্তি প্রথমে পরীক্ষা না করিয়া কোন লোককে বন্ধু করিয়া লয়, সে নিজে মস্তকোপরি এমন সকল বিপদ ডাকিয়া আনে, যাহা তাহার মৃত্যুকালে তাহাকে ত্যাগ করে।

৩। যে ব্যক্তিকে তুমি স্বীয় মিত্র করিয়া লইতে চাহ, তাহার কুলের, দোষগুণের, সঙ্গীদের ও আত্মীয়দের বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, এবং তৎপরে, সে যদি মিত্রতার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাকে মিত্র করিয়া লও।

৪। দেখ, যে ব্যক্তি উচ্চকুলে জন্ম-লাভ করিয়াছে এবং অপমানের ভয় করে, তাহার সহিত, যদি প্রয়োজন হয়, মূল্য দিয়াও, বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত।

৫। যাহারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের রীতি জানে, এবং তুমি বিপথগামী হইলে তোমাকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিতে

পারে, তাহাদের অনুসন্ধান কর এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর।

৬। দুরবস্থারও একটী গুণ আছে—উহা এমন একটী মানদণ্ড, যদ্দারা তুমি তোমার মিত্রগণের অনুরাগের পরিমাণ করিতে পার।

৭। কি হইতে মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে? নিঃসন্দেহ নির্ব্বোধ ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইলে।

৮। এরূপ কার্য্যে কখনো হস্তক্ষেপ করিও না যাহার নিস্ফলতায় তোমাকে ভগ্নোৎসাহ হইতে হইবে, এবং এরূপ লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিও না যে, তুমি দুরবস্থায় পতিত হইলেই, তোমাকে ত্যাগ করিবে।

৯। যে ব্যক্তিরা দুঃসময়ে বঞ্চনা করে, তাহাদের মিত্রতা মৃত্যুকালেও মনে জ্বালা উৎপন্ন করে।

১০। পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত কর; কিন্তু যাহারা অযোগ্য তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দাও; যদি তজ্জন্য কিছু উপহারও দিতে হয় তাহাও স্বীকার।

একাশীতিতম পরিচ্ছেদ

প্রগাঢ় সৌহৃদ্য

১। সেই বন্ধুত্বই প্রগাঢ় সৌহৃদ্য, যাহা থাকিলে মনুষ্য বিরক্ত না হইয়া প্রিয়জনের সকল শিষ্টাচার-লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে।

২। পরস্পরের মধ্যে অব্যাহত ব্যবহার প্রকৃত বন্ধুত্বের আত্মা; এবং গুণশালী ব্যক্তিরা এরূপ মাখা-মাখিতে বিরক্ত হয় না।

৩। দীর্ঘ সৌহৃদ্যের সার্থকতা কি, যদি উহার বলে যে সব অধিকারের দাবী করা হয় তাহা উপেক্ষিত হয়?

৪। পরস্পরের গভীর বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিয়া, যখন কোনো বন্ধু বিনা অনুমতিতে কোনো কাজ করে; তখন স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিরা তাহাদের প্রণয়ের কথা চিন্তা করিয়া তাহা ভালভাবে গ্রহণ করে।

৫। যখন তোমার বন্ধুরা এমন কোনো কাজ করে, যাহাতে তোমার ক্লেশ হয়, তখন ভাবিও যে, তোমাদের অভিন্ন-হৃদয়তা বা তাহার অজ্ঞতাই উহার কারণ।

৬। যদি প্রাণপ্রিয় বন্ধু সর্ব্বনাশেরও কারণ হয়, তথাপি অকৃত্রিম সুহৃৎ তাহাকে ত্যাগ করিবে না।

৭। দেখ, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হৃদয়ের সহিত ভালবাসিয়া আসিয়াছে, সে অনেক ক্ষতির কারণ হইলেও, তাহার ভালবাসার হ্রাস হয় না।

৮। দেখ, যে সকল ব্যক্তি প্রাণপ্রিয় বন্ধুর নিন্দা শুনিতে অসমর্থ, তাহারা সেদিনটীকে আনন্দের দিন বলিয়া জ্ঞান করে, যেদিন সে তাহাদের কোনো ক্ষতি করিতে পারে। (১)

৯। দেখ, যদি কোনো ব্যক্তির অপর কোনো ব্যক্তির প্রতি এমন ভালবাসা থাকে যে তাহার নাশ নাই, তবে সে সমগ্র পৃথিবীর প্রিয় হইবে।

১০। দেখ, পুরাতন বন্ধুদের প্রতি যাহাদের প্রেমের বিকার হয় না, তাহাদের শত্রুরাও তাহাদের প্রতি কোমল দৃষ্টিতে দেখিবে।

---

(১) কারণ, সেদিন বন্ধুর প্রতি কোনো পরুষ-বাক্য প্রয়োগ না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবার সুযোগ পায়।

দ্ব্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

অনিষ্টকারী বন্ধুত্ব

১। দেখ, যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রতি ব্যবহারে এমন ভাব দেখায় যে, তাহারা স্নেহ দ্বারা তোমাকে গিলিয়া ফেলিবে, কিন্তু হৃদয়ে স্নেহের ভাব মোটেই পোষণ করে না, তাহাদের স্নেহের বৃদ্ধি অপেক্ষা হ্রাসই অধিক মধুর।

২। দেখ, যে সকল নির্গুণ দুরাত্মা স্বীয় লাভের আশায় চাটুবচন দ্বারা তোমার আরাধনা করে, কিন্তু লাভের প্রত্যাশা অন্তর্হিত হইলে তোমাকে পরিত্যাগ করে, তুমি তাহাদের বন্ধুত্ব পাও বা না পাও, তাহাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি ?

৩। দেখ, যে সব লোক বন্ধুর নিকট কি পরিমাণ লাভ হইবে গণনা করিয়া দেখে, তাহারা বেশ্যা ও চোরের সমপর্য্যায়-বিশিষ্ট।

৪। অবশীকৃত ঘোটক আরোহীকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া পলায়। এমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা এইরূপ ঘোটকের মত। এরূপ ব্যক্তিগণকে বন্ধুরূপে পাওয়া অপেক্ষা একাকী থাকা ভাল।

৫। দেখ, যে সকল নীচ ব্যক্তি নির্ভরশীল বন্ধুকে তাহার প্রয়োজনের সময় ত্যাগ করে, তাহাদের বন্ধুত্ব লাভ করা অপেক্ষা বন্ধুহীনতা ভাল।

৬। নির্ব্বোধের মিত্রতা অপেক্ষা বুদ্ধিমানের শত্রুতা কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ।

৭। মদ্যপানে সহচর, ও চাটুবাক্যে নিপুণ, ব্যক্তির মিত্রতা অপেক্ষা শত্রুগণের ঘৃণা দশকোটীগুণ উৎকৃষ্ট।

৮। দেখ, যখন তুমি এমন একটী গুরু কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছ, যাহা তুমি সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম, সে সময়ে তোমাকে যাহারা বাধা দেয়, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের বন্ধুত্ব পরিহার কর।

৯। দেখ. যাহাদের উক্তি তাহাদের কার্য্যাবলী দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহাদের সাহচর্য্য স্বপ্নেও পরিহার্য্য।

১০। দেখ, যে সকল ব্যক্তি নিভৃত কক্ষে মধুর সম্ভাষণ করে, কিন্তু সভায় অপদস্থ করে, সামান্য ভাবেও তাহাদের সমীপস্থ হইও না।

ত্র্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

কপট মিত্রতা

১। শত্রুতে যে মিত্রতার ছল দৃষ্ট হয় তাহা স্থূণা (নেহাই) সদৃশ। সুবিধা পাইলেই শত্রু তাহার সাহায্যে তোমাকে ঘন (হাতুড়ি) দ্বারা চূর্ণ করিবে।

২। যে সকল লোক বাহিরে বন্ধু বলিয়া দেখায়, অথচ অন্তরে ভালবাসে না, তাহাদের বন্ধুত্ব, নারীর হৃদয়ের ন্যায়,—অচিরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

৩। উচ্চ ও স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ গ্রন্থসমূহ অধীত থাকিলেও শত্রুর পক্ষে আত্ম-হৃদয়স্থ বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ করা অসম্ভব।

৪। সেই দুর্ব্বৃত্ত প্রতারকগণকে ভয় করিও, যাহারা মুখোমুখী হইলে হাসে, কিন্তু হৃদয়ে শত্রুতা পোষণ করে।

৫। যাহাদের হৃদয় তোমার প্রতি আসক্ত নয়, তাহাদের বাক্য তোমাকে প্রলোভিত করিলেও তাহাদিগকে অনুমাত্র বিশ্বাস করিও না।

৬। যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের কোমল ভাষা প্রয়োগ করে, সে শত্রু কিনা মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

৭। শত্রু যদিও অবনত হইয়া কথা কহে, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস করিও না, কারণ নমিত ধনুক অনিষ্টেরই পূর্ব্বসূচনা দেয়।

৮। শত্রুর যুক্তকরেও কোনো অস্ত্র লুক্কায়িত থাকিতে পারে; এমন কি তাহার অশ্রুপাতেও বিশ্বাস করিও না।

৯। দেখ, যে সকল ব্যক্তি প্রকাশ্যে তোমার গুণের ব্যাখ্যা করে কিন্তু গোপনে তোমাকে অবজ্ঞা করে, প্রকাশ্যে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিও, কিন্তু এমন কি আলিঙ্গন কালেও তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিও।

১০। যদি শত্রু তোমার সহিত বন্ধুত্বের ভাণ করে, এবং যদি তাহার সহিত তোমার প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে প্রকাশ্যে তাহার সহিত বন্ধুত্বের অভিনয় করিও, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদা তাহাকে দূরে রাখিও।

চতুরশীতিতম পরিচ্ছেদ

মূর্খতা

১। নির্ব্বুদ্ধিতা কাহাকে বলে তুমি কি জানিতে চাহ? যাহা লাভজনক তাহা ত্যাগ করা এবং যাহা হানিকর তাহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা—ঠিক ইহাই নির্ব্বুদ্ধিতা।

২। যে সকল বস্তু অযোগ্য ও হেয়, তৎপ্রতি হৃদয়কে ধাবিত করাই সর্ব্বপ্রধান নির্ব্বুদ্ধিতা।

৩। নির্ব্বোধ নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় এবং জিহ্বা দ্বারা রূঢ় কথা বাহির করে। সে লজ্জানুভূতি-শূন্য, এবং যাহা সযত্নে রক্ষা করা উচিত তাহা রক্ষা করে না।

৪। কোনো ব্যক্তি মহা বিদ্বান্ ও তীক্ষ্ণধী, এবং অন্য লোকের শিক্ষক; ইহা সত্ত্বেও সে সদা ইন্দ্রিয়ের দাস। এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ কে?

৫। নির্ব্বোধের একটী প্রকৃতি-দত্ত গুণ এই যে, সে নরকের মলপূর্ণ হ্রদে নিজের সাতজন্মের বাস-স্থান একজন্মেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে।

৬। দেখ, নির্ব্বোধ ব্যক্তি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে লইয়া তাহা তো নষ্ট করিয়া ফেলিবেই ফেলিবে, প্রত্যুত নিজেকে বন্ধনের জন্যও যোগ্য করিবে।

৭। যদি নির্ব্বোধ ব্যক্তি দৈবযোগে বহু অর্থ লাভ করে, তাহার অর্থ বাজে লোকেই উপভোগ করিবে এবং আত্মীয়-স্বজন ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

৮। যদি নির্ব্বোধ ব্যক্তি কোনো মূল্যবান বস্তু লাভ করে, সে সেই ক্ষিপ্তব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিবে, যে কিয়ৎ পরিমাণে সুরামত্তও হইয়াছে।

৯। নির্ব্বোধ ব্যক্তির বন্ধুত্ব অতি সুখের, কারণ তাহার বিচ্ছেদে বিয়োগ-দুঃখ অনুভূত হয় না।

১০। গুণী-সমাজে নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রবেশ ঠিক সেইরূপ, যেমন অমল ধবল পর্য্যঙ্কে মলিন পদস্থাপন।

পঞ্চাশীতিতম পরিচ্ছেদ

আত্মম্ভরী মূঢ়তা

১। বুদ্ধির দৈন্যই প্রকৃত দৈন্য। অন্যপ্রকার দৈন্যকে জগৎ দৈন্য বলিয়াই বিবেচনা করে না।

২। যখন নির্ব্বোধ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো বস্তু দান করে, উহা দান-গ্রাহীর সৌভাগ্য ভিন্ন আর কিছু নহে।

৩। মূর্খ নিজের মাথার উপর যে সকল দুর্দ্দশা আনিয়া ফেলে, সেরূপ দুর্দ্দশা তাহার শত্রুদের পক্ষেও তাহার উপর আনা কঠিন।

৪। নির্ব্বোধ কাহাকে বলে তুমি কি জানিতে চাহ? নির্ব্বোধ সেই অহঙ্কারী ব্যক্তিকে বলে, যে মনে মনে ভাবে যে আমি বড় বুদ্ধিমান্।

৫। দেখ, যখন নির্ব্বোধ ব্যক্তি যাহা জানে না তাহা জানে বলিয়া কপটতা করে, তখন যে সকল বিষয় সে সত্য সত্যই জানে, তাহাদের সম্বন্ধেও লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

৬। মূর্খ ব্যক্তি যদি নিজ মনের কদর্য্যতাই না ঢাকিতে পারিল, তবে বস্ত্রদ্বারা নিজ অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া তাহার লাভ কি?

৭। দেখ, যে অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি গোপনীয় কথা নিজ অন্তরে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, সে স্ব-মস্তকোপরি মহান্ বিপদ্-সমূহ আনয়ন করিবে।

৮। দেখ, যে ব্যক্তি ভাল-মন্দ নিজে বুঝিতে পারেনা, অথচ অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করে না, সে সারা জীবন সুহৃদ্‌গণের কণ্টক হইয়া থাকিবে।

৯। যে ব্যক্তি মূর্খের চক্ষু উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করে, সে নিজেই নির্বোধ; কারণ মূর্খের দৃষ্টি এক দিকেই আবদ্ধ থাকে—সেই দিক্‌টাতে কোনো দোষ আছে বলিয়া সে ভাবে না।

১০। দেখ, সমগ্র পৃথিবীর লোকে যাহা ভাল বলে, তাহা যে ব্যক্তি ভাল বলিয়া স্বীকার করে না, সে পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রেত বলিয়া গণ্য হইবে।

ষড়শীতিতম পরিচ্ছেদ

ঔদ্ধত্যসূচক চিত্তবৃত্তি

১। যে দূষিত রস (প্রবৃত্তি) মনুষ্য-মধ্যে ঘৃণা নামক ব্যাধির সৃজন ও বর্দ্ধন করে, তাহাকেই স্পর্দ্ধা বা তুচ্ছ জ্ঞান করার মনোভাব বলে।

২। যখন তোমার প্রতিবাসী তোমার সহিত কলহ বাধাইবার সুবিবেচিত অভিপ্রায়ে তোমার অনিষ্ট করে, তখনো প্রতিশোধ লইবার বা অনিষ্ট ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছাকে আশ্রয় না দেওয়াই সর্ব্বোত্তম।

৩। অন্যের সহিত কলহ বাধাইবার অভ্যাস একটী দারুণ ব্যাধি। যদি কেহ ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে অশেষ গৌরব অর্জ্জন করিবে।

৪। স্পর্দ্ধা নামক অতি গর্হিত প্রবৃত্তিকে যদি তুমি হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে পার, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ আনন্দ তোমার করায়ত্ত।

৫। যে ব্যক্তি বিবাদ পরিহার করিবার কৌশল জানে, কে তাহার পরাভব অভিলাষ করিতে পারে?

৬। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিবাসীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে আনন্দ পায়, তাহার পদস্খলন ও পতনের বিলম্ব নাই।

৭। দেখ, যে রাজা বিদ্বেষ বশতঃ সর্ব্বদা বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, সে জাতি-সমূহের উন্নতি-বিধায়ক নীতির প্রতি অন্ধ।

৮। কলহ-পরিহার সম্পদের মূল। কিন্তু যদি তুমি কলহকে দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতে দাও, তবে তোমার বিনাশের বিলম্ব নাই।

৯। যখন কোনো ব্যক্তির ভাগ্য-দেবী প্রসন্ন হইবার উপক্রম করেন, তখন সে বিরোধের নানা উত্তেজনা উপেক্ষা করে, কিন্তু ঐ দেবী যখন তাহার বিনাশে কৃত-নিশ্চয়, তখন প্রতিবাসীদের প্রতি তাহার ঔদ্ধত্যের সীমা থাকে না।

১০। ঔদ্ধত্য সকল মর্ম্মপীড়ার আকর, কিন্তু সদ্ভাব হইতে শান্তি ও ঐক্য-রূপ উৎকৃষ্ট ফল প্রসূত হয়।

সপ্তাশীতিতম পরিচ্ছেদ

শত্রুর বিশিষ্টতা

১। বলবানের সহিত বিরোধ করিও না; কিন্তু যাহারা তোমা অপেক্ষা দুর্ব্বল তাহাদের সহিত মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম না করিয়া সংগ্রাম চালাইতে থাক।

২। দেখ, যে রাজা দয়াশূন্য, যাহার সহায়তা করিবার অন্য কোনো রাজা নাই, এবং যাহার একলা দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, সে কি প্রকারে শত্রুর বলের প্রতিরোধ করিবে?

৩। যে রাজার সাহস নাই, বুদ্ধি নাই বা উদারতা নাই, অথচ প্রতিবাসী রাজাদের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে চাহে না, সে অনায়াসেই তাহার শত্রুগণ দ্বারা গ্রস্ত হইবে।

৪। যে রাজা সদাই রূক্ষ-স্বভাব এবং নিজ জিহ্বাকে সংযত করিতে পারে না, সে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে প্রত্যেক ব্যক্তির কবলে পতিত হইবে।

৫। যে রাজা কৌশলী নয়, যাহার আত্ম-মর্য্যাদার জ্ঞান নাই, এবং যে রাজনীতির নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করে, সে তাহার শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধক।

৬। দেখ, যে রাজা কামের দাস এবং রাগান্ধ হইয়া বিচার-শক্তি হারায়, তাহার শত্রুগণ দ্বারা তাহার বৈরিতা সাদরে অভ্যর্থিত হইবে।

৭। দেখ, যে রাজা কোনো দুরূহ ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া এমন কাজ করে যাহা উহার সফলতার অনুযায়ী নয়, তাহার সহিত, প্রয়োজন হইলে কিছু মূল্য দিয়াও, শত্রুতার চেষ্টা করা উচিত।

৮। যদি কোনো রাজাতে গুণ না থাকিয়া অনেক দোষ থাকে, তবে অন্য কোনো রাজা তাহার সহায় হইবে না, এবং তাহার শত্রুরা আনন্দ করিবে।

৯। যদি নির্ব্বোধ ও ভীরুর সহিত বিরোধ করিতে হয়, তাহা হইলে শত্রুগণের আনন্দের সীমা থাকে না।

১০। দেখ, যে রাজা নির্ব্বাধে প্রতিবাসীর সহিত যুদ্ধ করিয়া সহজে জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক নয়, গৌরব তাহাকে চিরদিনের জন্য পরিহার করিবে।

অষ্টাশীতিতম পরিচ্ছেদ

শত্রুর সহিত ব্যবহার

১। যে ঘাতক বস্তুকে লোকে শত্রুতা বলে, জানিয়া শুনিয়া, এমন কি পরিহাসচ্ছলে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইও না।

২। যাহাদের আয়ুধ ধনুর্ব্বাণ মাত্র, তাহাদের সহিত যদিও বা শত্রুতা করিতে পার, তথাপি যাহাদের আয়ুধ জিহ্বা তাহাদিগকে কখনো বিরক্ত করিও না।

৩। দেখ, যে রাজা কোনো সহায় না থাকা সত্ত্বেও, বহু সৈন্যকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, সে পাগলের পাগল।

৪। যে রাজার শত্রুদিগকে মিত্র করিয়া লইবার কৌশল জানা আছে, তাহার শক্তি চিরকাল অটল থাকিবে।

৫। যদি সহায়হীন অবস্থায় একলা তোমাকে দুই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একটীকে নিজের সহিত মিলিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিও।

৬। যদি তুমি তোমার প্রতিবাসী রাজাকে হয় শত্রু নয় মিত্র করিবে বলিয়া স্থির করিয়া থাক, এবং যদি ইতিমধ্যে কোনো বাহ্য আক্রমণ ঘটে, তখন তাহাকে

শত্রু বা মিত্র কিছুই না করিয়া যেমন আছে তেমনই রাখিও।

৭। যে সকল লোক এখনো তোমার অপরিচিত, তাহাদের নিকট তোমার শত্রুদের পরিচয় দিও না, এবং নিজের দুর্ব্বলতা শত্রুদিগকে জানিতে দিও না।

৮। কোনো কৌশলপূর্ণ উপায় উদ্‌ভাবন কর, নিজের সাধন-সমূহ সুদৃঢ় ও সুসঙ্গঠিত কর এবং নিজ রক্ষার সম্পূর্ণ উদ্যোগ কর। যদি তুমি ইহা করিয়া তুলিতে পার; তবে তোমার শত্রুগণের দর্প চূর্ণ হইয়া ধুলায় মিশাইতে বিলম্ব হইবে না।

৯। কণ্টক-বৃক্ষ সমূহকে ছোট অবস্থাতেই কাটিয়া ফেলা উচিত, কারণ যখন তাহারা বড় হইয়া পড়িবে, তখন সেই হাতকেই আঘাত করিবে যাহা তাহাদিগকে কাটিবার চেষ্টা করিবে।

১০। যাহারা নিজ অবমাননাকারীর গর্ব্ব নষ্ট না করে, তাহারা অধিককাল টিকিবে না।

উননবতিতম পরিচ্ছেদ

ঘরের রহস্যভেদী

১। নিকুঞ্জ ও নির্ঝর আনন্দপ্রদ হয় না, যদি তাহা হইতে রোগের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ স্বজনগণও আদরণীয় হয় না, যদি তাহারা সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত থাকে।

২। সে-শত্রু হইতে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নাই, যে উন্মুক্ত অসির ন্যায়, কিন্তু সেই শত্রু হইতে সাবধান থাকিও, যে মিত্র সাজিয়া তোমার নিকট আসে।

৩। নিজ গুপ্ত শত্রু হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিও ; কেন না দুরবস্থার সময় সে, কুম্ভকারের সূত্রের ন্যায়, তোমাকে পরিষ্কার কাটিয়া ফেলিবে।

৪। যদি তোমার এমন কোনো শত্রু থাকে, যে তোমার মিত্ররূপে চলা ফেরা করে, তাহা হইলে সে অচিরাৎ তোমার সঙ্গীদের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করিবে, এবং তোমার মস্তকোপরি শত শত বিপদ্ আনিয়া ফেলিবে।

৫। যখন তোমার কোনো আত্মীয় বিশ্বাসঘাতক হয়, তখন সে তোমার উপর অসংখ্য বিপদ্ আনিবে, এমন কি তোমার জীবনকেও বিপন্ন করিবে।

৬। যখন কোনো রাজার অনুচরবর্গের মধ্যে বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রবেশ করে, তখন ইহা অসম্ভব নয় যে, রাজা কোনো না কোনো দিন তাহাদের জালে পড়িবেন।

৭। যে গৃহে বিশ্বাসঘাতক আশ্রয় পায় তাহা ঢাকনাযুক্ত পাত্রের সমান। ভিতরের বস্তুনিচয়ের ভিন্নতা বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া না গেলেও, তাহাদের সমগ্রতা নাই।

৮। যে গৃহ মধ্যে বিশ্বাসঘাতক আশ্রয় পায় তাহা উকা দ্বারা ঘৃষ্ট লৌহের ন্যায় ধূলিবৎ হইয়া যাইবে।

৯। যে গৃহে বিশ্বাসঘাতক বিদ্যমান, তাহার অভ্যন্তরের ফাট, তিলমধ্যস্থ রন্ধ্রের ন্যায় সামান্য হইলেও, তাহার সর্ব্বনাশ আসন্ন।

১০। দেখ, যে ব্যক্তি এমন লোকের সহিত নিঃসঙ্কোচে মেশে যে তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করে, সে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে কৃষ্ণ সর্পকে সহচর করিয়া একই কুটিরে বাস করে।

নবতিতম পরিচ্ছেদ

মহাপুরুষগণের প্রতি অসদ্‌ব্যবহার

১। যে নিজ হিতাভিলাষী, তাহার দ্বারা যাহাতে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের অসন্তোষ না হয় তদ্বিষয়ে তাহার সাবধান ও যত্নবান থাকা উচিত।

২। যদি কোনো ব্যক্তি মহাত্মাগণের অনাদর করে, তাহা হইলে তাঁহাদের শক্তি হইতে তাহার উপর এমন অনন্ত বিপদ্‌রাশি আসিয়া পড়িবে যাহার প্রতিকার হয় না।

৩। তুমি কি নিজের সর্ব্বনাশ করিতে চাহ? তবে যাও, কাহারো পরামর্শ না লইয়া সেই সকল ব্যক্তিকে বিরক্ত কর, যাঁহাদের ইচ্ছা-মাত্রেই তোমাকে নষ্ট করিবার শক্তি আছে।

৪। দেখ, যে দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবান্ এবং শক্তিশালী পুরুষদিগের অবমাননা করে, সে যেন যমরাজকে নিজের কাছে আসিতে সঙ্কেত করে।

৫। দেখ, যে ব্যক্তিরা শক্তিশালী মহাপুরুষদিগের ও রাজগণের ক্রোধ উদ্রিক্ত করে, তাহারা যেখানেই যাউক না কেন, স্বচ্ছন্দ অবস্থায় থাকিবে না।

৬। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পতিত মনুষ্যেরা যদিও বা রক্ষা পায়, তথাপি যাহারা শক্তিশালী পুরুষদিগের প্রতি অসদাচরণ করে, তাহাদের রক্ষার কোনো উপায় নাই।

৭। যদি অধ্যাত্ম-বল-সম্পন্ন ঋষিগণ তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন, তবে তোমার জীবনের নানা আনন্দোচ্ছ্বাস এবং ধনের নানা আড়ম্বর কোথায় থাকিবে ?

৮। দেখ, যে সকল রাজার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হয়, তাহারাও সমস্ত আত্মীয়-স্বজন সহ নষ্ট হইয়া যাইবে, যদি পর্ব্বত-পরিমাণ শক্তিশালী মহর্ষিরা তাহাদের সর্ব্বনাশের অণুমাত্র অভিলাষী হন।

৯। অন্যের কথা কি, স্বয়ং দেবেন্দ্রও স্বীয় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবেন এবং স্বীয় প্রভুত্ব হারাইয়া বসিবেন, যদি পবিত্র প্রতিজ্ঞা-বিশিষ্ট সাধুরা ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার উপর তাকান।

১০। যদি প্রবল আত্মশক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রুষ্ট হইয়া পড়েন, তাহা হইলে, যে সকল ব্যক্তিরা দৃঢ় হইতে দৃঢ় আশ্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারাও রক্ষা পাইবে না।

একনবতিতম পরিচ্ছেদ

অবলা-শাসন

১। যে ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্ত্রীর চরণার্চ্চনায় রত থাকে, তাহারা কখনো মহত্ত্ব লাভ করে না, এবং যাহারা মহৎকার্য্য করিবার অভিলাষী, তাহারা এরূপ অযথা মোহিনী-মায়ায় আবদ্ধ হয় না।

২। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সমক্ষে অবনত হইয়া চলে, সে সাধু-সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পাইবে।

৪। সেই স্বাধীনতাহীন হতভাগ্য ব্যক্তিকে ধিক্, যে নিজ স্ত্রীর সমক্ষে কাঁপে। কেহ কখনো তাহার গুণের আদর করিবে না।

৫। যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ভয় করে, তাহার সজ্জনগণের উপকার করিবার সাহস হয় না।

৬। যে সকল ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সুকুমার বাহুকে ভয় করে, তাহারা যদি দেবতার ন্যায় জীবন অতিবাহিত করে, তথাপি কেহ তাহাদের সম্মান করিবে না।

৭। দেখ যে ব্যক্তি অবলা-শাসন স্বীকার করে, তাহার তুলনায় একটী লজ্জাশীলা কুমারীও মর্য্যাদা-বিশিষ্ট।

৮। দেখ, যাহারা স্বীয় স্ত্রীর শাসনাধীন, তাহারা না নিজ বন্ধুগণের অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে, না কোনো ভাল কাজ করিতে সমর্থ হইবে।

৯। দেখ, যে ব্যক্তিরা অবলা-শাসন স্বীকার করে, তাহারা সাধুতাও অর্জ্জন করিবে না, ধনও পাইবে না; তাহাদের ভাগ্যে স্নেহের মাধুর্য্য আস্বাদন করাও ঘটিবে না।

১০। দেখ, যাহাদের চিন্তা মহৎ-কার্য্যে রত, এবং যাহারা সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপাপাত্র, তাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় নিজ স্ত্রীর মোহ-জালে আবদ্ধ হয় না।

দ্বিনবতিতম পরিচ্ছেদ

বার-বণিতা

১। দেখ, যে রমণীরা ভাল না বাসিয়া কেবল ধনলোভে কোনো পুরুষের কামনা করে, তাহাদের মন-ভোলান কথা কেবল দুর্দ্দশার দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

২। দেখ, যে সকল রমণী ভালবাসার ভাণ করে অথচ যাহাদের মন লাভের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহাদের আচরণের কথা মনে করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিবে।

৩। বেশ্যা যখন তাহার প্রেম-প্রার্থীকে বক্ষঃসংলগ্ন করে, তখন সে প্রকাশ্যে ভালবাসা দেখায় বটে, কিন্তু অন্ধকার ঘরে অজ্ঞাত ব্যক্তির শবদেহ স্পর্শ করিলে যে রূপ অনুভূতি হয়, তখন তাহার সেইরূপ অনুভূতি হয়।

৪। দেখ, যে সকল লোকের মনের প্রবণতা পবিত্র কার্য্যের দিকে, তাহারা অসতী রমণীগণের স্পর্শ দ্বারা নিজ শরীর কলুষিত করে না।

৫। যাহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল এবং জ্ঞান অগাধ, তাহারা সেই সকল রমণীর স্পর্শ দ্বারা নিজ শরীর অপবিত্র করে না, যাহাদের রূপ-লাবণ্য সকল লোকের জন্য উন্মুক্ত।

৬। নিজ কল্যাণের প্রতি যাহাদের দৃষ্টি আছে,

তাহারা সেই সকল নির্লজ্জ রমণীর হস্ত স্পর্শ করে না, যাহারা নিজেদের অপবিত্র সৌন্দর্য্য বেচিয়া বেড়ায়।

৭। যাহাদের চিত্ত লঘু, তাহারাই সেই সকল স্ত্রীলোক অন্বেষণ করিবে, যাহারা কেবল শরীর দ্বারা আলিঙ্গন করে কিন্তু মন অন্যত্র রাখে।

৮। যাহাদের চিন্তা করিবার বা বুঝিবার বুদ্ধি নাই, তাহাদের পক্ষে ধূর্ত্তা কামিনীগণের আলিঙ্গন নিভৃতে বিচরণকারী অপ্সরোগণের মোহিনীর ন্যায়। (১)

৯। সুন্দর বেশ-বিন্যাস ও সাজ-সজ্জাযুক্তা বার-বণিতার কোমল বাহু একপ্রকার পূতিগন্ধময় নারকী কুণ্ড, যাহাতে ঘৃণিত মূর্খেরা আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দেয়।

১০। ভাগ্য-লক্ষ্মী যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, দ্বি-মনবিশিষ্টা নারী, মদিরা ও দ্যূত তাহাদেরই আনন্দের উপকরণ। (২)

(১) সাইরেন নামক কাল্পনিক জীবদের বিবরণ ইউলিসিসের ভ্রমণ-কাহিনীতে পাওয়া যায়। তাহাদের অধিকারে পড়িলে মনুষ্য কামে বিহ্বল হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করে।

(২) কামন্দকের নীতি-সূত্রে (১১. ১২৪) ইহাদিগকে "বিধাণের" অন্তর্গত করা হইয়াছে।

ত্রিনবতিতম পরিচ্ছেদ

মদ্যে ঘৃণা

১। দেখ, যাহাদের মদ্যপানের অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের শত্রুরা তাহাদিগকে কখনো ভয় করিবে না, এবং যে সকল গৌরব তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাও চলিয়া যাইবে।

২। কেহই যেন মদ্যপান না করে; কিন্তু কেহ যদি পান করিতে চাহে, সেই পান করুক, যে গুণী ব্যক্তিদের সম্মান অগ্রাহ্য করে।

৩। যে ব্যক্তি নেশায় অজ্ঞান, তাহার আকৃতি তাহার মাতার নিকটও ঘৃণার্হ। তবে, ভদ্রসমাজে তাহার আকৃতি কিরূপ বোধ হইবে?

৪। যে ব্যক্তি নিন্দনীয় মদ্যপানে অভ্যস্ত, লজ্জা-সুন্দরী তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৫। নিজ অর্থব্যয় করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কেবল লুপ্তচৈতন্যতা লাভ করিব—ইহা অতি নিম্ন শ্রেণীর মূর্খতা ও বাতুলতা।

৬। দেখ, যাহারা সেই বিষ নিত্য পান করে, যাহাকে তাড়ি (বা মদ) বলে, তাহারা যেন মহানিদ্রায় অভিভূত। শব ও তাহাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই।

৭। যাহারা গোপনে নেশা করে এবং নিজ সময় অচৈতন্যতার দশায় অতিবাহিত করে, তাহাদের প্রতিবাসীরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে।

৮। মদ্যপায়ী যেন এরূপ প্রতারণা-বাক্য না বলে যে, নেশা কাহাকে বলে সে জানে না ; কেন না, ইহাদ্বারা সে নিজ দুরাচারের সহিত মিথ্যা বলার পাপ সংযুক্ত করার ভাগী হইবে।

৯। যে ব্যক্তি নেশায় উন্মত্ত, তাহাকে মদ্যপানের দোষ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া নিমজ্জিত ব্যক্তিকে মশাল দিয়া অন্বেষণ করার সমান।

১০। যখন মদ্যপায়ী সজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া অন্য কোনো হতচৈতন্য মদ্যপায়ীর দুর্গতি দেখিতে পায়, তখন কি সে নিজে কিছু অনুমান করিতে পারে না যে, সে যখন নেশায় থাকে তখন তাহার কিরূপ অবস্থা ঘটে ?

চতুর্ণবতিতম পরিচ্ছেদ

দ্যূত

১। জিত হইলেও দ্যূতে আসক্ত হইও না; কারণ, তোমার লাভের দানগুলি মৎস্যদ্বারা গিলিত হইবার জন্য যে সকল টোপযুক্ত বড়্‌সী ফেলা হয়, তৎ সদৃশ।

২। দেখ, দ্যূতপরায়ণ ব্যক্তিরা যেখানে এক টাকা জিতে, সেখানে একশত টাকা হারে। জগতে তাহাদের কি সমৃদ্ধ হইবার কোনো উপায় আছে?

৩। যাহারা সর্ব্বদা দ্যূত-ক্রীড়ায় রত থাকে, তাহাদের ধন কেবল অজ্ঞাত ব্যক্তিদের হস্তে চলিয়া যায়।

৪। দ্যূত যত দুর্দ্দশার কারণ তত আর কিছুই নয়, কারণ, ইহা হইতে মনুষ্যের সুনাম নষ্ট হয়, এবং হৃদয় নীচ কর্ম্মের প্রতি ধাবিত হয়।

৫। এমন অনেক লোক জন্মিয়া গিয়াছে, যাহারা পাশায় অতি দক্ষ বলিয়া গর্ব্ব করিত, এবং ক্ষিপ্তের ন্যায় জুয়ার আড্ডার দিকে দৌড়িত; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন একজনকেও দেখাইতে পারিবে না, যে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হয় নাই।

৬। দেখ, জুয়ার নেশার আকারে আসিয়া দুর্দ্দশার অপদেবতা যে সকল ব্যক্তিকে অন্ধ করিয়া ফেলে,

তাহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে এবং সর্ব্ববিধ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

৭। যদি জুয়ার আড্ডায় সময় ক্ষেপন কর, তাহা হইলে তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এবং তোমার সুনামও নষ্ট হইবে।

৮। দ্যূত তোমার সম্পত্তি নষ্ট করিবে এবং সাধুতাকে কলুষিত করিবে; উহা তোমার হৃদয়কে কঠিন করিবে এবং তোমাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবে।

৯। যে ব্যক্তি দ্যূতে আসক্ত, তাহাকে গৌরব, বিদ্যা ও ধন পরিত্যাগ করিবে; এমন কি অন্নবস্ত্রের জন্য তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইবে।

১০। বাজি-হারের সঙ্গে সঙ্গে জুয়ার নেশা বাড়িতে থাকে। সেইরূপ যতই দুঃখভোগ বাড়িতে থাকে ততই আত্মার জীবনের আসক্তি বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চনবতিতম পরিচ্ছেদ

রোগের কারণ ও প্রতিকার

১। বাতাদি (১) যে তিনটী গুণের কথা ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোনোটী যদি সীমার নীচে বা উপরে যায়, তাহা হইলে উহা রোগের কারণ হইবে।

২। শরীরের জন্য কোনো ঔষধেরই প্রয়োজন হয় না, যদি ভুক্ত খাদ্য পরিপাক হইয়া যাওয়ার পর নূতন খাদ্য গ্রহণ করা যায়।

৩। সর্ব্বদা সংযমের সহিত ভোজন করিবে, এবং ভুক্ত খাদ্য পরিপাক হইয়া যাওয়ার পর পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করিবে। দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির ইহাই একমাত্র পথ।

৪। যে পর্য্যন্ত তোমার ভুক্ত খাদ্যের পরিপাক না হয় এবং তীব্র ক্ষুধাবোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, এবং তাহার পর সংযমের সহিত সেই খাদ্য গ্রহণ কর যাহা তোমার প্রকৃতির অনুকূল।

৫। যে খাদ্য তোমার রুচির অনুকূল, সেই খাদ্যই যদি তুমি সংযমের সহিত গ্রহণ কর, তবে তোমার শরীরে কোনো প্রকারের ক্লেশ হইবে না।

৬। যেমন স্বাস্থ্য সেই ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে, যে পেট খালি হইবার পর আহার করে; ঠিক সেইরূপ, রোগ

(১) বাত, পিত্ত ও কফ

সেই ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বেড়ায় যে সীমা ছাড়াইয়া ভোজন করে।

৭। দেখ, যে ব্যক্তি মূর্খের ন্যায় জঠরাগ্নিকে অতিক্রম করিয়া গাদিয়া গাদিয়া পেট বোঝাই করে, তাহার রোগের সীমা থাকিবে না।

৮। রোগটী কি? প্রথমে উহার উৎপত্তি ও নিদানের বিচার কর, এবং তৎপরে সাবধানে উহা দূর করিতে নিযুক্ত হও।

৯। বৈদ্যের কর্ত্তব্য যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়ার ও ঋতুর বিষয়ে চিন্তা করিবার পর ঔষধি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিবে।

১০। রোগী, বৈদ্য, ঔষধি এবং ঔষধি-প্রস্তুত-কারক এই চারিটী বিষয়ের উপর সমস্ত চিকিৎসা নির্ভর করে। তন্মধ্যে আবার প্রত্যেকের চারিটী করিয়া গুণ আছে। (২)

---

(২) পরিমলেলকর প্রত্যেকের গুণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন—(ক) রোগী নিজ রোগের লক্ষণগুলি বুঝাইতে সক্ষম হইবে, তাহার কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে, সে ব্যয়ভার বহনে সমর্থ হইবে, এবং যথানিয়ম চিকিৎসকের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিবে। (খ) বৈদ্যের গুণ—বিচক্ষণতা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞান; সকল রোগের চিকিৎসা হাতে লইবার সাহস; চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের বিশুদ্ধতা; এবং সুদৈব। (গ) ঔষধের গুণ—ফলোৎপাদিকা শক্তি; স্বাদ, শক্তি ও ফলাত্মিকা প্রভাব; অনায়াস-লব্ধতা; এবং অন্যান্য উপাদানের সহিত ও খাদ্যের সহিত মিলিত হইবার সুসাধ্যতা। (ঘ) ঔষধনির্ম্মাতার গুণ—রোগীর সহিত সহানুভূতি ও তাহার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার; চিন্তাধারা, বাক্য ও কার্য্যের বিশুদ্ধতা; ঔষধ সংমিশ্রণে দক্ষতা, এবং কাণ্ডজ্ঞান।

তৃতীয় খণ্ড

বিবিধ বিষয়

ষণ্ণবতিতম পরিচ্ছেদ

১। সত্যবাদিতা ও কোমল প্রকৃতি স্বভাবতঃ সেই সকল লোকের মধ্যেই থাকে, যাহারা সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করে।

২। সদাচার, সত্যপ্রিয়তা ও মৃদু প্রকৃতি—এই তিনটী বিষয় হইতে উচ্চবংশ-সম্ভূত ব্যক্তি কখনো পদ-স্খলিত হয় না।

৩। প্রকৃত সদ্বংশ-জাত ব্যক্তির মধ্যে এই চারিটী গুণ বর্ত্তমান—সহাস্য বদন, মুক্ত হস্ত, মৃদু ভাষণ ও নিরভিমান।

৪। সদ্বংশ-জাত ব্যক্তি কোটি টাকা পাইলেও নিজ নামকে কলঙ্কিত করিবে না।

৫। ঐ প্রাচীন কুলোদ্‌ভব ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি কর। ঐশ্বর্য্য ক্ষীণ হইয়া গেলেও উহারা নিজ উদারতা ত্যাগ করে না।

৬। দেখ, যাহারা নিজ কুলগত আচার পবিত্র রাখিতে চাহে, তাহারা প্রতারণা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ করিবে না, অথবা কুকার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবে না।

৭। প্রতিষ্ঠিত বংশোৎপন্ন ব্যক্তিদের দোষের উপর চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় সকলের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে।

৮। উত্তম বংশে উৎপন্ন ব্যক্তির জিহ্বা হইতে যদি অনুচিত ও অসংযত বাক্য নির্গত হয়, তাহা হইলে লোকে তাহার জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করিবে।

৯। কোনো ভূমির বিশিষ্টতার পরিচয়, তদুৎপন্ন শস্য হইতে পাওয়া যায়; ঠিক সেইরূপ, মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হয়, তাহা হইতে বক্তার বংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

১০। যদি তুমি সাধুতা ও সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে চাও, তাহা হইলে তোমার কোমল ভাব অর্জ্জন করা উচিত। যদি তুমি নিজ বংশকে সম্মানিত করিতে চাও, তবে তুমি সকল লোকের সহিত সসম্মান ব্যবহার করিবে।

সপ্তনবতিতম পরিচ্ছেদ

আত্ম-সম্মান

১। যে সকল কার্য্য তোমাকে অধঃপাতিত করিয়া দিতে পারে, তাহা যদি প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অনিবার্য্যরূপে আবশ্যক হয়, তথাপি তাহা হইতে বিরত থাকিও।

২। যে সকল লোক পশ্চাতে যশস্বী নাম রাখিয়া যাইতে ইচ্ছুক, তাহারা নিজ গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত অনুচিত কার্য্য করিবে না।

৩। সমৃদ্ধাবস্থায় তো বিনয় ও নম্রতার অভ্যাস করিবেই; কিন্তু হীনাবস্থাতেও মান ও মর্য্যাদাকে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়া থাকিবে।

৪। দেখ, যে সকল ব্যক্তি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত নাম দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা কর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত অলকগুচ্ছের ন্যায়।

৫। পর্ব্বত-প্রমাণ গৌরবের অধিকারী ব্যক্তিরাও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবে, যদি তাহারা কুঁচ পরিমাণ দুষ্কর্ম্মও করে।

৬। যাহাদের নিকট ঘৃণা পাওয়া যায়, তাহাদের তোষামোদ করিয়া যে জীবিত থাকিতে চাহে, তাহার যশোবৃদ্ধিও হয় না, স্বর্গপ্রাপ্তিও হয় না।

৭। যাহাদের নিকট ঘৃণা পাওয়া যায়, তাহাদের চরণে নিপতিত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু অনেক শ্রেয়ঃ।

৮। অহো! এই চর্ম্ম কি সত্য সত্যই অবিনশ্বর বস্তু যে লোকে নিজ সম্মান বিক্রয় করিয়াও ইহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক।

৯। যখন চমরী গাভীর লোম কাটিয়া লওয়া হয়, তখন সে প্রাণত্যাগ করে। কতক লোক এত মানী যে, তাহারা যখন আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, তখন তাহারা জীবন-লীলা সমাপ্ত করিয়া ফেলে।

১০। দেখ, যে মানী ব্যক্তি নিজ সুনাম চলিয়া যাওয়ার পর জীবিত থাকিতে চাহে না, সমগ্র জগৎ যুক্ত কবে তাহার সুযশ-মণ্ডিত বেদীতে ভক্তির অর্ঘ্য উৎসর্গ করিবে।

অষ্টনবতিতম পরিচ্ছেদ

মহত্ত্ব

১। মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার আকাঙ্খাকেই লোকে মহত্ত্ব নামে অভিহিত করে, এবং যে মনোভাব ঐরূপ কিছু না করিয়া থাকিতে চাহে, তাহাকেই ক্ষুদ্রতা বলে।

২। জন্ম তো সকল লোকের একই প্রকারে হয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিষ্ঠার ভিন্নতা এই কারণে হয় যে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে জীবন অতিবাহিত করে।

৩। ভদ্রবংশ-সম্ভূত হইয়াও যে ভদ্র না হয়, ভদ্র বলিয়া সে অভিহিত হইতে পারে না; এবং নীচ বংশে জন্মিয়াও যে নীচ নয়, সে নীচ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

৪। রমণীর সতীত্বের ন্যায় কেবল আত্ম-সম্মানদ্বারা মহত্ত্বের রক্ষা হইতে পারে।

৫। মহাপুরুষদিগের মধ্যে উপযুক্ত সাধন-ব্যবহারের ও অনন্যসাধ্য কার্য্য-সম্পাদনের শক্তি থাকে।

৬। মহাপুরুষদের প্রতি সম্মান, এবং তাহাদের প্রসন্নতা ও অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা, ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের স্বভাবে পাওয়া যায় না।

৭। যদি কোনো হীনচেতা ব্যক্তির ভাগ্যে সম্পদলাভ ঘটে, তাহা হইলে তাহার আর গরিমার সীমা থাকে না।

৮। মহত্ত্ব সর্ব্বদা সবিনয় ও অনাড়ম্বর, কিন্তু ক্ষুদ্রতা সমস্ত জগতে নিজগুণের ঢক্কা নিনাদিত করিয়া বেড়ায়।

৯। মহত্ত্ব আপনা হইতেই ছোটদের সহিত মৃদু ও সদয় ব্যবহার করে; কিন্তু ক্ষুদ্রতা অহঙ্কারের পরাকাষ্ঠা দেখায়।

১০। মহত্ত্ব সর্ব্বদা অন্যের দুর্ব্বলতা গোপন করিতে যত্নবান্; কিন্তু ক্ষুদ্রতা অন্যের ছিদ্রান্বেষণ ভিন্ন আর কিছুই জানে না।

নবনবতিতম পরিচ্ছেদ

যোগ্যতা

১। দেখ, যে সকল ব্যক্তির কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে, এবং নিজ উৎকর্ষ-সাধন করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের দৃষ্টিতে সকল ভাল কাজই কর্ত্তব্য-স্বরূপ।

২। আচরণের উৎকর্ষই যোগ্য ব্যক্তিদের যথার্থ উৎকর্ষ। অন্যবিধ উৎকর্ষ কোনো মতেই তাহাদের গুণের উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারে না।

৩। সার্ব্বজনীন প্রেম, কোমল ভাব, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার, অপরের দোষ-গোপন ও সত্যপ্রিয়তা—এই পাঁচটী স্তম্ভের উপর মহৎ চরিত্রের সৌধ প্রতিষ্ঠিত।

৪। সাধু ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম অহিংসা; এবং সদ্‌গুণ-শালী ব্যক্তিদের ধর্ম্ম অন্যের নিন্দাবাদ হইতে বিরত থাকা।

৫। নম্রতাই বলবান্ ব্যক্তিদের শক্তি; এবং গুণশালী ব্যক্তিদের পক্ষে উহা শত্রু-সম্মুখে কবচের কাজ করে।

৬। সদ্‌গুণের কষ্ঠিপাথর কি? তাহা এই যে, নিম্ন পদস্থ লোকের মধ্যে যদি নিজ অপেক্ষা অধিক গুণ থাকে, তাহা স্বীকার করা।

৭°। গুণীব্যক্তির মহত্ত্ব কোথায়, যদি সে তাহার অনিষ্টকারীর উপকার না করিতে পারে ?

৮। মনুষ্যের পক্ষে নির্ধনতা অসম্মানের কারণ হয় না, যদি তাহার নিকট সেই সম্পত্তি থাকে, যাহাকে লোকে সাধু-চরিত্র বলে।

৯। দেখ, প্রলয়-কালে অন্য সকল বস্তু পরিভ্রষ্ট হইয়া গেলেও মহানুভব ব্যক্তিরা সন্মার্গ হইতে বিচ্যুত হন না।

১০। যদি সাধু ব্যক্তিরা সদ্‌গুণভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তাহা হইলে স্বয়ং ধরিত্রীও মনুষ্যগণের জীবন-ভার বহনে অসমর্থ হইবেন।

শততম পরিচ্ছেদ

সৌজন্য

১। কথিত হয় যে সৌজন্য সেই সকল লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অকপটে সকল লোককে আপনার করিয়া লইতে পারে।

২। মনুষ্যত্ব ও শিষ্টতা এই দুইটী গুণের সংমিশ্রণেই সৌজন্যের উৎপত্তি।

৩। বাহ্য চিহ্নদ্বারা মনুষ্য মধ্যে সাদৃশ্যের অনুভব হয় না, বরং শিষ্টতার সমতা দ্বারাই তাহারা এক সূত্রে গ্রথিত হয়।

৪। দেখ; যে ব্যক্তিরা ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতা ভালবাসে, এবং পরের হিতসাধন করিতে ইচ্ছা করে, জগৎ তাহাদের আচরণের অতিশয় আদর করে।

৫। দেখ, পরিহাস-কালের কঠিন কথাও মানুষের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে পারে। অতএব সজ্জনেরা শত্রুর সহিতও অসদ্‌ব্যবহার করে না।

৬। সৌজন্য-বিশিষ্ট মনুষ্যদের কারণেই পৃথিবীর কার্য্যাবলী নিরুপদ্রবে চলিতেছে। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, যদি ঐ সকল লোক না থাকিত, তাহা হইলে

এই অক্ষুণ্ণ শৃঙ্খলা লুপ্ত হইয়া ধুলির সহিত মিশাইয়া যাইত।

৭। যে সকল লোক আচারহীন, তাহারা ব্রশ্চনের (উখার) ন্যায় তীক্ষ্ণ হইলেও কাঠের কুঁদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়।

৮। অবিনয় অন্যায়ী ও বিপক্ষের প্রতি প্রদর্শিত হইলেও অশোভন।

৯। দেখ, যাহাদের মুখে হাস্যরেখা দেখা দেয় না, তাহারা এই বিশাল জগতে দিবাভাগেও অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইবে না।

১০। দেখ, মন্দ-প্রকৃতি ব্যক্তির হস্তে যে ধন থাকে, তাহা অপরিষ্কৃত মলিন পাত্রে রক্ষিত দুগ্ধের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়।

একাধিক শততম পরিচ্ছেদ

অব্যবহৃত ধন

১। দেখ, যে ব্যক্তি নিজ গৃহে রাশি রাশি ধন একত্রিত করিয়া রাখিয়াছে, অথচ তাহা সদ্ব্যবহারে আনে না, সে মৃত ব্যক্তির সমান, কেন না সে তাহা হইতে কোনো উপকার পায় না।

২। যে কৃপণ ব্যক্তি ভাবে যে পৃথিবীতে ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, এবং কাহাকেও কিছু না দিয়া উহা রাশীকৃত করিয়া রাখে, সে পরজন্মে পিশাচ হইবে।

৩। দেখ, যাহারা ধন পুঞ্জীকৃত করিতে যত্নবান্ কিন্তু যশকে গ্রাহ্য করে না, তাহাদের অস্তিত্ব পৃথিবীর ভার-স্বরূপ।

৪। দেখ, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীদের ভালবাসা পাইতে চেষ্টা করে না, সে মৃত্যুর পর নিজ পশ্চাতে কি রাখিয়া যাইবার আশা করে? (১)

৫। দেখ, যে ব্যক্তিরা অপরকে দেয় না এবং নিজেও ধনের উপভোগ করে না, তাহারা কোটিপতি হইলেও তাহাদের যথার্থ কিছু নাই।

(১, উদারভাবে প্রতিবাসীগণের হিতসাধন করিলে তাহাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায়। এইরূপ কৃতজ্ঞতাই মনুষ্যের মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকে।

৬। পৃথিবীতে এমনও কতকগুলি লোক আছে, যাহারা নিজেও ধন উপভোগ করে না, এবং উদারতাপূর্ব্বক উপযুক্ত পাত্রেও দান করে না, তাহারা নিজ অগাধ সম্পত্তির শাস্তি ও ব্যাধি স্বরূপ।

৭। যে ব্যক্তিরা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান করে না, তাহাদের ধন সেই লাবণ্যময়ী ললনার সমান, যে নির্জ্জনে থাকিয়া নিজ যৌবন বৃথা অতিবাহিত করে।

৮। যাহাকে কেহ ভালবাসে না, তাহার সমৃদ্ধি গ্রাম মধ্যে ফলবান্ বিষবৃক্ষের সমান।

৯। দেখ, ধর্ম্মাধর্ম্মের চিন্তা না করিয়া, এবং শরীর ও হৃদয়কে ক্ষুধায় মারিয়া, যে ব্যক্তি অর্থ স্তূপীকৃত করে, তাহার অর্থ কেবল অপরের উপভোগের জন্য সঞ্চিত হয়।

১০। যে ধনবান্ ব্যক্তি নিয়ত দান করিয়া নিজ কোষ শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে, জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় তাহার দুঃসময় অধিক কাল স্থায়ী হইবে না।

দ্ব্যধিকশততম পরিচ্ছেদ

লজ্জানুভূতি

১। যদি মানী ব্যক্তিরা কোনো অযোগ্য কার্য্য করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের কপোলে লজ্জার অরুণিমা দেখা দেয়। এ লজ্জা সুন্দরীগণের লজ্জা-রাগ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

২। আহার, বস্ত্র ও সন্তান—এই সকল বিষয়ে সকলেরই সমতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু কেবল লজ্জার অনুভূতির বৈষম্যই এক মানুষকে অপর মানুষ হইতে পৃথক্ করে।

৩। সকল প্রাণের নিবাস শরীর মধ্যে, কিন্তু সদ্‌-গুণের আবাস-স্থান সাত্ত্বিক লজ্জার আরক্তিমার মধ্যে।

৪। সলজ্জভাব কি মানী ব্যক্তির মণি নয়? কিন্তু যখন তাহার সেই ভাবটীর অন্যথা হয়, তখন তাহার দম্ভ কি দর্শকের চক্ষু-পীড়া-দায়ক হয় না?

৫। দেখ, যাহারা নিজ অপমানে যেরূপ লজ্জিত হয়, অন্যের অপমানেও ঠিক সেইরূপ লজ্জাবোধ করে, তাহারা লজ্জা ও সঙ্কোচের আবাস-ভূমি বলিয়া কথিত হইবার যোগ্য।

৬। যে সকল সাধন অবলম্বন করিলে লজ্জিত হইতে হয় না, তদ্ব্যতীত অন্য সাধন দ্বারা মানী ব্যক্তিরা যদি রাজ্যও পায় তথাপি তাহা গ্রহণ করিবে না।

৭। যে সকল ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-সম্মান-জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান, তাহারা আপনাদিগকে অসম্মান হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিবে, এবং প্রাণ যাইলেও লজ্জা ত্যাগ করিবে না।

৮। অন্যেরা যাহাতে লজ্জিত হয়, এরূপ বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি লজ্জাবোধ না করে, তবে তাহাকে দেখিয়া সাধুতাকেও লজ্জাবোধ করিতে হয়।

৯। কুলাচার ভুলিয়া গেলে মনুষ্য কেবল নিজ কুল হইতেই ভ্রষ্ট হয়, কিন্তু যখন সে লজ্জা ভুলিয়া নির্লজ্জ হইয়া যায়, তখন সকল প্রকারের সাধুতা তাহাকে ত্যাগ করে।

১০। যে সকল লোকের লজ্জার ভাব লোপ পাইয়াছে, তাহারা প্রাণহীন—রজ্জুদ্বারা চালিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায়; তাহারা কেবল জীবনের ভাণ করে।

ত্র্যধিকশততম পরিচ্ছেদ

কুলোন্নতি

১। "আমি স্বহস্তের পরিশ্রমে কখনো শ্রান্ত হইব না," এরূপ প্রতিজ্ঞার দ্বারা স্ব-কুলের যত উন্নতি হইতে পারে, এত আর কিছুতেই নয়।

২। মনুষ্যের শ্রমশীলতা ও বুদ্ধির বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহার বংশের উন্নতি নিশ্চিত।

৩। যখন কোনো ব্যক্তি এই বলিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করে যে, আমি আমার বংশের উন্নতি করিবই করিব, তখন স্বয়ং দেবতারা বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার অগ্রগামী হন।

৪। দেখ, যে ব্যক্তিরা নিজ বংশের উন্নতি করিতে কখনো বিরত হয় না, তাহারা তজ্জন্য কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা না করিলেও. তাহাদের কৃত কর্ম্ম উন্নতিলাভ করিবে।

৫। দেখ, যে ব্যক্তি কোনো অনাচার না করিয়া নিজ বংশকে উন্নত করে, তাহাকে সমগ্র পৃথিবী নিজ আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিবে।

৬। যে বংশে কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে উন্নত করাতে তাহার শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব।

৭। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণের প্রকোপ যেমন বীর যোদ্ধার উপরই পতিত হয়, ঠিক সেইরূপ পরিবার রক্ষার ভার তাহারই স্কন্ধে পতিত হয়, যে ভার বহনে সক্ষম।

৮। যাহারা নিজ বংশের উন্নতিকামী, তাহাদের পক্ষে কালাকাল নাই; কিন্তু যদি তাহারা ব্রতে অবহেলা দেখায় এবং নিজের বৃথা-গৌরব লইয়া ব্যস্ত থাকে, তবে তাহাদের কুল অবনত হইয়া পড়িবে।

৯। যে ব্যক্তি নিজ পরিবারকে সর্ববিধ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, সত্যই কি তাহার শরীর শ্রম ও কষ্টের আধার হইয়া থাকিবে? (১)

১০। দেখ, যে-ঘরকে সামলাইবার জন্য কোনো ভাল লোক নাই, বিপদ্ তাহার মূল কাটিয়া ফেলিবে, এবং তাহা ভূমিসাৎ হইবে।

(১) সাধু ব্যক্তি বিরক্তি না দেখাইয়া ধীরভাবে সর্ব্ববিধ ভার বহন করেন। কবি তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছেন।

চতুরধিকশততম পরিচ্ছেদ

কৃষিকার্য্য

১। মনুষ্য যেখানেই ইচ্ছা বিচরণ করুক না কেন, আহারের নিমিত্ত তাহাকে হলের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। অতএব নানা ক্লেশ-সমন্বিত হইলেও কৃষিই সর্ব্বপ্রধান উত্তম।

২। কৃষকগণ সমাজ-চক্রের ধুরা-স্বরূপ, কেন না হল-চালনার অসমর্থতা হেতু যাহারা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, কৃষকেরা তাহাদের অন্নদাতা।

৩। যাহারা হল চালনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের জীবনই সার্থক জীবন। অন্যেরা তো অন্নের জন্য তাহাদের অধীন।

৪। দেখ, যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্র লক্‌লকে শস্যের শ্যামল ছায়াতলে শায়িত, তাহারা অন্য রাজাদের ছত্র-সমূহ স্বদেশের রাজার রাজছত্রের সম্মুখে অবনত হইতে দেখিবে।

৫। দেখ, যে সকল লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা স্বয়ং তো কখনো ভিক্ষা করিবেই না, বরং যাহারা ভিক্ষাজীবী তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া ভিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে।

৬। কৃষক যদি হাতের উপর হাঁত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে, যে-সকল ব্যক্তি সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদেরও কষ্ট হইবে।

৭। যদি তোমার ভূমি এমন শুখাইয়া ফেল যে, এক সের মাটী এক পোয়ায় পরিণত হইয়া যায়, তাহা হইলে এক মুঠা সারও আবশ্যক হইবে না এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইবে।

৮। কর্ষণ অপেক্ষা সারের ব্যবহারে অধিক উপকার, এবং নিড়ান শেষ হইলে, জল সেচ অপেক্ষা রক্ষা কার্য্য অধিক লাভদায়ক। (১)

৯। যদি কোনো ক্ষেত্রস্বামী ক্ষেত দেখিতে না গিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভূমিও নারীর ন্যায়, তাহাকে তর্জ্জন করিবে।

১০। সেই সুন্দরী, যাহাকে ধরণী বলে, মনে মনে হাসেন, যখন তিনি কোনো অলস ব্যক্তিকে এই বলিয়া কাঁদিতে দেখেন, "হায়. আমার খাইবার কিছুই নাই।"

(১) ইহার অর্থ এই যে, কর্ষণ, সার দেওয়া, নিড়ান, জল সিঞ্চন ও রক্ষাকার্য্য এই পাঁচটী বিষয়ই অত্যন্ত আবশ্যক।

পঞ্চাধিকশততম পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্য

১। তুমি কি জানিতে চাহ যে, দারিদ্র্য অপেক্ষা মর্ম্মপীড়াদায়ক আর কোনো বস্তু আছে কি না? তবে শুন, দারিদ্র্যই কেবল দারিদ্র্য অপেক্ষা অধিক দুঃখদায়ক।

২। হতভাগা দারিদ্র্য তো এ জীবনের সুখের বৈরী বটেই, কিন্তু পরজন্মের সুখোপভোগেরও হন্তারক।

৩। যে ব্যাধি দারিদ্র্য নামে অভিহিত হয়, তাহা বংশগত আচরণের মর্য্যাদা ও ভাষার শ্লীলতা পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে।

৪। অভাব উচ্চবংশজ পুরুষদিগেরও আত্ম-মর্য্যাদা ভুলাইয়া দিয়া অতি নিকৃষ্ট ও হীন দাসত্বের ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য করে।

৫। দারিদ্র্য-নামক অভিশাপের অন্তরালে সহস্র প্রকার মর্ম্মপীড়া লুক্কায়িত থাকে।

৬। দরিদ্র ব্যক্তি অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও অভ্রান্ত জ্ঞানপূর্ণ অগাধ সত্যের মীমাংসা করুক না কেন, কেহ তাহার কথার আদর করিবে না।

৭। একে তো দরিদ্র, তাহার উপর ধর্ম্মহীন—এরূপ অভাগা ব্যক্তি হইতে তাহার গর্ভধারিণী মাতাও বিমুখ হইবেন।

৮। দারিদ্র্য কি আজও আমার সঙ্গ ছাড়িবে না? কালই তো সে আমাকে যন্ত্রণা দিয়া আধমরা করিয়া ফেলিয়াছিল। (১)

৯। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখার মধ্যে নিদ্রা যাওয়াও সম্ভব, কিন্তু দারিদ্র্য-দশার মধ্যে চক্ষের পাতা বোঁজাও অসম্ভব।

১০। (২) দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে একটী পথ মুক্ত আছে—সেটী জীবন বিসর্জ্জন করা। তাহা না করাতে কেবল লবণ ও আমানীর ধ্বংস হয়। (৩)

(১) ইহা কোনো দীন দুঃখী নারীর আর্ত্ত উক্তি।

(২) এই পদের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোনো টীকাকার বলেন যে, দরিদ্র ব্যক্তির সংসার ত্যাগ করা উচিত এবং অপর টীকাকারদের মত, তাহাদের প্রাণত্যাগ করা উচিত। মূলে "তুরবামাপ" শব্দ আছে। তাহার অর্থ মৃত্যু ও ত্যাগ দুইই হয়। ভাবার্থ এই যে, গরিব ব্যক্তিদের জীবন নিতান্ত অসার ও বৃথা। তাহারা যাহা কিছু পান ভোজন করে, তাহা বৃথা নষ্ট হয়।

(৩) মাদ্রাজ প্রদেশে লোকে রাত্রিতে ভাতে জল দিয়া রাখে। প্রাতঃকালে জল ও লবণ দিয়া সেই ঠাণ্ডা ভাত খায়। তাহারা বলে ইহা বড় উপকারী।

ষড়ধিকশততম পরিচ্ছেদ

ভিক্ষাবৃত্তি

১। দান করিতে সক্ষম এমন লোক যদি পাও, তবেই তাহাদের নিকট ভিক্ষা করিতে পার। যদি তাহারা সামর্থ্যহীনতার ছল করে, সে দোষ তাহাদের, তোমাদের নয়।

২। তোমার প্রার্থিত বস্তু পাইতে যদি অপমান সহ্য করিতে না হয়, তাহা হইলে ভিক্ষাতে আনন্দ আছে।

৩। যাহারা কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্পন্ন এবং অসমর্থতার ছলনা করে না, তাহাদের নিকট যাচ্ঞা করার একটী মাধুর্য্য আছে।

৪। দেখ, যে ব্যক্তি স্বপ্নেও অনুরোধের প্রত্যাখ্যান করে না, তাহার নিকট প্রার্থনা করা দান করার ন্যায় সম্মানার্হ।

৫। যদি জীবিকার্জ্জনের জন্য কেহ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ধরাতলে এমন সব লোকও আছে যাহারা ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃত নয়।

৬। দেখ, যাহারা দান করিতে অস্বীকৃত হইয়া অভদ্রতা দেখায় না, তাহাদের দর্শন মাত্র দারিদ্র্যের ক্লেশ দূরীভূত হয়।

৭। দেখ, যাহারা ভৎর্সনা বা দম্ভোক্তি না করিয়া দান করে, তাহাদিগকে দেখিয়া ভিক্ষুকের হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হয়।

৮। যদি যাচ্ঞা করিবার কেহ না থাকিত, তাহা হইলে পুত্‌লো নাচ অপেক্ষা সংসারের অধিক অর্থ থাকিত না। (১)

৯। যদি পৃথিবীতে যাচক না থাকিত, তাহা হইলে উদারতার গৌরব কি প্রকারে থাকিত ?

১০। যখন কোনো ব্যক্তি দান করিবার অক্ষমতা জানায়, তখন প্রার্থী ভ্রূকুঞ্চিত করিবে না, কারণ নিজ অভাব হইতেই প্রার্থীর বোঝা উচিত যে, অন্যেরও তাহারই মত অবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়।

(১) কারণ, দানের আনন্দ ও গৌরব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইত

সপ্তাধিকশততম পরিচ্ছেদ

ভিক্ষাবৃত্তির ভীতি

১। যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং হৃদয়ের সহিত দান করে, এরূপ ব্যক্তির নিকট যাচ্ঞা করিতে পারিলেও, যে ভিক্ষা করে তদপেক্ষা যে ভিক্ষা করে না, সে কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ।

২। যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার যদি এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ভিক্ষুকের অবস্থায় পতিত হইয়া মনুষ্য জীবিত থাকুক, তবে তাঁহাকে যেন স্বয়ং নিপীড়িত হইয়া পৃথিবীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

৩। যে বলে যে আমি যাচ্ঞা করিয়া নিজ দারিদ্র্য দূর করিব, তাহা অপেক্ষা নির্লজ্জ মনুষ্য আর কেহ নাই।

৪। বলিহারি সেই চরিত্রের, যে নিতান্ত দরিদ্র দশাতেও কাহারও নিকট হস্তপ্রসারণ করিতে সম্মত হয় না। অখিল বিশ্ব তাহার গৌরব ধারণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৫। যে-খাদ্য নিজ হস্তের পরিশ্রমের দ্বারা অর্জ্জন করা যায়, তাহা জলের ন্যায় পাতলা ফেন হইলেও তদপেক্ষা অধিক সুস্বাদু অন্য কোনো বস্তু নাই।

৬। যাহা তুমি ভিক্ষা করিতেছ, তাহা যদি গো-সেবার জন্য জলমাত্র হয়, তথাপি জিহ্বা দ্বারা এই যাচ্ঞাসূচক শব্দ উচ্চারণ করার ন্যায় অপমানজনক কার্য্য আর নাই।

৭। যাহারা ভিক্ষা করে, আমি তাহাদের নিকট কেবল একটী ভিক্ষা চাই—"যদি তোমার ভিক্ষা না করিলে নয়, তবে এমন লোকের নিকট ভিক্ষা করিও না, যে এড়াইতে চায়।"

৮। ভিক্ষারূপ ভাগ্যহীন পোত সেই মুহূর্ত্তেই খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, যখন সে চাতুরীর পাষাণে আঘাত করিবে।

৯। ভিখারীর ভাগ্যের কথার চিন্তামাত্রেই হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, কিন্তু তাহাকে যে সকল কঠোর বাক্য শুনিতে হয়, যখন তাহা মনে পড়ে, তখন মর্ম্মে মরিয়া যাইতে হয়।

১০। যখন প্রত্যাখ্যানকারী "না" বলে, তখন তাহার প্রাণ কোথায় লুকায়? কটুবাক্যের শব্দ শুনিবামাত্রই তো ভিখারীর প্রাণ শুকাইয়া যায়। (১)

(১) রহীমের দোহা স্মরণ করুন—

রহীম বে নর মর চুকে যে কহুঁ
মাঁগন চাহি।
উনতে পহলে বে মরে,
জিন মুখ নিকসত 'নাহি'॥

কবির বক্তব্য এই যে, যখন প্রত্যাখ্যানের তীব্রতা হইতে প্রার্থীর মৃত্যুর ন্যায় অনুভূতি হয়, তখন যে কপটাচারী ঐ মারাত্মক "না" শব্দ হৃদয়ে পুষিয়া রাখে, তাহার ঘৃণায় মরিয়া যাওয়া উচিত।

অষ্টাধিকশততম পরিচ্ছেদ

ভ্রষ্ট জীবন

১। মনুষ্যের সহিত ভ্রষ্ট ও পতিত জীবগণের কি সাদৃশ্য! আমরা এরূপ পূর্ণ সাদৃশ্য কখনো দেখি নাই।

২। শুদ্ধ-হৃদয় মনুষ্য অপেক্ষা এই হেয় জীবগণ কত সুখী! কেননা, ইহারা হৃদয়ে কোনো গ্লানি অনুভব করে না।

৩। দেবতাদের সহিত এই নীচ ব্যক্তিদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, কারণ ইহারাও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত—নিজ ইচ্ছামত চলে।

৪। যখন কোনো নীচ ব্যক্তি কোনো দুর্ব্বৃত্তের সহিত মিলিত হয়, তখন সে পাপকর্ম্মে দুর্ব্বৃত্তকে অতিক্রম করিয়া যায়, এবং সগর্ব্বে নিজ অধিকতর সাফল্যের ব্যাখ্যা করে।

৫। নীচ লোকেরা কেবল ভয়-বশতঃ সন্মার্গে চলে। যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকেও, সেটী উদর-সংক্রান্ত, এবং সে বিষয়ে সে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হয়।

৬। নীচ লোকেরা ঢ্যাঁড়া-পিটাইবার ঢোলের মত, কেননা তাহাদিগকে যে গোপনীয় কথা বলা হয়, তাহা

অপর লোকের নিকট প্রকাশ না করিলে তাহারা স্থির থাকিতে পারে না।

৭। নীচ ব্যক্তিদিগকে ঘুসী মারিয়া যে ব্যক্তি চোয়াল ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, তাহাকে ভিন্ন তাহারা, উপকার পাইয়াও, কৃতজ্ঞতাসূচক অভিবাদন করিবে না।

৮। সজ্জনকে একটী শব্দ দ্বারা বশে আনা যায়, কিন্তু যে নীচ তাহাকে আকের মত না ছেঁচিলে; তাহা হইতে কিছু পাওয়া যাইবে না।

৯। দুষ্ট ব্যক্তি প্রতিবাসীকে খাইয়া পরিয়া থাকিতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার চরিত্রে দোষ বাহির করিতে পারে।

১০। দুষ্ট ব্যক্তির উপর দুরবস্থা আসিয়া পড়িলে তাহার উদ্ধারের উপায় কি ? একটী মাত্র উপায় আছে, তাহা এই যে, সে যত শীঘ্র সম্ভব আপনাকে ক্রীতদাসরূপে বেচিয়া ফেলুক।

তৃতীয় ভাগ

কাম

[দাম্পত্য প্রেম]

তৃতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড

গুপ্ত বিবাহ

নবাধিক শততম পরিচ্ছেদ

সৌন্দর্য্যের আঘাত

(নায়কের উক্তি)

১। ঐ রত্ন-বিভূষিতা মূর্ত্তি কি বিজনবাসিনী কোনো মায়াবিনী, না স্বজাতিশ্রেষ্ঠা ময়ূরিণী, না লাবণ্যময়ী মনুজ-কুমারী? আমার সংজ্ঞাহীন চিত্ত নির্ণয় করিতে অসমর্থ।

২। ঐ নিভৃত-চারিণী কঞ্চুকিনী যদি উহার সমগ্র সেনা লইয়া কোনো পুরুষকে আক্রমণ করে, তাহার কি দশা হয়? আমার দশাও অনুমান করা যাইতে পারে, যেহেতু সুন্দরী আমার দৃষ্টির প্রতিদান করে।

৩। কে যম আমি জানিতাম না। এখন জানিলাম যে, সে দুটী বিশাল রণকুশল নয়নবিশিষ্টা রমণীর আকার ধারণ করে।

৪। সে সরলা ও সদয়া হইলেও তাহার চক্ষুর্দ্বয় রণে দুর্দ্ধর্ষ, কারণ যে তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করে, তাহারই জীবন শোষিত হয়।

৫। আমি কি যমকে দেখিতেছি, না যুগ্ম-নেত্র,

না কুরঙ্গের নয়ন-ভঙ্গী? কারণ, এই সরলার কটাক্ষে তিনেরই সমাবেশ লক্ষিত হয়।

৬। যে পর্য্যন্ত উহার ভ্রূধনু নমিত হইতে বিরত হইয়া নয়ন-বাণ অপসারিত না করিবে, সে পর্য্যন্ত উহার চক্ষু আমাকে হৃৎকম্প-জনক ব্যথা দিতে নিরস্ত হইবে না।

৭। যে অম্বর ঐ ললনার মনোহর হৃদ্-দেশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা মত্ত মাতঙ্গের চক্ষুরাবরণ সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে। (১)

৮। রণাঙ্গনে আমার যে শৌর্য্য নির্ভীক শত্রুকেও সন্ত্রস্ত করে, তাহা কি এখন উহার ভ্রূর সম্মুখে ব্যর্থ হইল?

৯। যখন হরিণীর ন্যায় সসঙ্কোচ দৃষ্টি এবং লজ্জা-শীলতাই উহার বিশিষ্ট আভরণ, তখন ঐ অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যাপহারী অলঙ্কারগুলির আবশ্যকতা কি?

১০। মদ্যের আনন্দ পানে—দর্শনে নয়; কিন্তু প্রিয়ার দর্শনেও আনন্দ।

---

(১) যদি ঐরূপে আবৃত না থাকিত, তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য্য দ্বারা আহত হইয়া মনুষ্যগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কোনো হস্তীর মদমত্ত হইবার সম্ভাবনা হইলে মাহুতেরা তাহার চক্ষুর উপর ঠুলি লাগাইয়া দেয়।

দশাধিক শততম পরিচ্ছেদ

লক্ষণে হৃদয়ের পরিচয়

(নায়কের উক্তি)

১। উহার অঞ্জিত চক্ষুর দৃষ্টিতে দুইটী বিপরীত গুণ বিদ্যমান—একটী হৃদয়কে নিপীড়িত করে, অপরটী ঐ ব্যথা প্রশমিত করে।

২। প্রণয়ীর চক্ষু অপসারিত হইবা মাত্র সে অজ্ঞাতসারে তড়িৎবেগে প্রণয়ীর প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তদ্দ্বারা তাহার ভালবাসার অল্পমাত্রা প্রকাশ পায় না, তদপেক্ষা অনেক অধিক সূচিত হয়। (১)

৩। নয়ন-বিক্ষেপের পরেই সে মস্তক অবনত করিল। আমাদের মধ্যে যে প্রেমলতা অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহার উপর ইহা যেন জলসেক করিল।

৪। আমি যখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, সে তখন মাটীর দিকে চায়; আবার আমি যখন দৃষ্টি সরাইয়া লই, সে তখন আমার দিকে চায়, এবং তাহার মুখমণ্ডলে অস্ফুট হাস্যরেখা দেখা দেয়।

---

(১) কারণ, ইহা তাহার অপর সমস্ত কাপট্যের সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হর্ষপ্রদ।

৫। সে আমাকে দেখিয়াছে বলিয়া জানিতে দেয় না বটে, কিন্তু সে যখন অপাঙ্গ নয়নে দেখিয়া, না দেখার ভাণ করে, তখন বস্তুতঃই আমার প্রতীতি হয় যে, তাহার বক্ষোমধ্যে আনন্দ তরঙ্গায়িত হইয়া তাহার মুখে স্মিত হাস্য আনয়ন করে।

৬। অপরিচিতার ন্যায় রুক্ষ ভাব দেখাইলে কি হইবে? কথার ধরণেই অনুরাগীর মনের ভাব ফুটিয়া উঠে।

৭। আন্তরিকতাশূন্য পরুষ বাক্য এবং বিরক্তি-জনিত অপ্রসন্নতার ভাব—ইহা তাহাদেরই চিহ্ন, যাহারা প্রত্যাখ্যানের অভিনয় করে কিন্তু হৃদয়ে গভীর প্রেম পোষণ করে।

৮। আমার অনুনয়-ব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া তন্বী দ্রবী-ভূত হইয়া যায়, এবং মৃদু মৃদু হাস্য করে। ঐ মন্দ হাস্য দ্বারা তাহার শ্রীর অধিক বিকাশ হয়।

৯। যাহারা আমাদিগকে ভালবাসে, তাহাদেরই মুখে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের ভাব লক্ষিত হয়, যেন তাহারা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

১০। যখন চ'খে চ'খে সম্মতি ব্যক্ত হয়, তখন মুখের কথা অতিরিক্ত।

একাদশাধিক শততম পরিচ্ছেদ

মিলন-মাধুর্য্য

(নায়কের উক্তি)

১। দর্শনের, শ্রবণের, ঘ্রাণের, আস্বাদনের ও স্পর্শের সকল আনন্দই এই উজ্জ্বল-বলয়ালঙ্কৃতা তরুণী হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। রোগের ঔষধি রোগ হইতে ভিন্ন বস্তুতে থাকে ; কিন্তু এই তরুণী যে-ব্যথার কারণ, তাহা কেবল এই তরুণীই প্রশমিত করিতে সক্ষম।

৩। প্রণয়িনীর কোমল বাহু-পাশাপেক্ষা কি কমল-লোচনের আবাস-স্থান অধিক মনোরম ?

৪। সে কোথা হইতে এই অদ্‌ভুত অগ্নি পাইল, যাহা দ্বারা সে যখন আমা হইতে দূরে থাকে, তখন আমাকে দগ্ধ করে, আবার যখন নিকটে থাকে তখন শীতলতাগুণে আমাকে স্নিগ্ধ করে ?

৫। কুসুম-শোভিত অলকাবলী-যুক্তা আমার প্রিয়ার রূপের কি কুহুক ! আমার হৃদয় যে মাধুর্য্যেরই আকাঙ্ক্ষা করুক না কেন, তাহার মূর্ত্তিতে আমি তাহাই পাই।

৬। অব্যাজমনোহরা আমার প্রেয়সীর বাহু-যুগলের

অমিয় স্পর্শমাত্রেই আমার মুমূর্ষু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনরুজ্জীবিত হয়।

৭। অতিথি-সেবার পর স্বীয় অন্নের ভাগ ভোজনান্তে গৃহস্বামী গার্হস্থ্য-জীবনের যেরূপ আনন্দ উপভোগ করে, এই মোহিনী রূপসীর আলিঙ্গনও সেইরূপ আনন্দপ্রদ।

৮। প্রণয়ীদের যে-আলিঙ্গনের মধ্যে সামান্য সমীরণও প্রবেশাধিকার পায় না, তাহা অতি মধুর।

৯। বিরক্তিব্যঞ্জক ভ্রুকুটী, হৃদয়ের কোমলতার প্রত্যাবর্ত্তন এবং পরবর্ত্তী আলিঙ্গনের অপূর্ব্বতা—এই সব মাধুর্য্যই প্রণয়ীরা উপভোগ করে।

১০। যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে মনুষ্য নিজ অজ্ঞতা তীব্রভাবে অনুভব করে, সেইরূপ তাহার সহিত আমার সংসর্গ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই আমার অনুরাগ গভীরতর হইতেছে।

দ্বাদশাধিক শততম পরিচ্ছেদ

নায়িকার সৌন্দর্য্য

(নায়কের উক্তি)

১। হে সুভগ অনিচ কুসুম, তুমি প্রকৃতি-কোমল। কিন্তু আমি আমার হৃদয় যাহাকে সমর্পণ করিয়াছি, সে তোমা হইতেও সুকুমার।

২। হৃদয়, তুমি ফুল দেখিলে উন্মত্ত হইয়া উঠ। নিশ্চয়ই তোমার এই বিশ্বাস যে, যে-সকল ফুল সর্ব্বসমক্ষে বিকশিত হইয়া থাকে, তাহারা প্রিয়ার চক্ষুর সমতা করিতে পারে।

৩। বংশসদৃশ তাহার সুগোল ও সুগঠিত বাহুদ্বয়, কোমল কিশলয়-সদৃশ তাহার মনোরম অঙ্গযষ্টি, উজ্জ্বল মুক্তাপংক্তির ন্যায় তাহার শোভন দন্তরাজি, অতি মনোহর গন্ধবাহী তাহার নিশ্বাস-বায়ু এবং শূলের ন্যায় মর্ম্মভেদী তাহার অঞ্জিত চক্ষু।

৪। নীলোৎপল সৌন্দর্য্যে কখনো তাহার চক্ষুর সমতা করিতে পারিবে না বলিয়া, তাহাকে দেখিলেই হতাশ হইয়া নিজ মস্তক অবনত করে।

৫। প্রিয়া সবৃন্ত অনিচ কুসুমে তাহার বরাঙ্গ

শোভিত করিয়াছে। হায়, তাহার ক্ষীণ কটিদেশ বুঝি বৃন্তভারে নমিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। (১)

৬। কোন্‌টী তাঁহার মুখ এবং কোন্‌টী চাঁদ স্থির করিতে না পারিয়া নক্ষত্রগণ কক্ষভ্রষ্ট হইয়া চন্দ্রকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

৭। এই সুন্দরীর বদনমণ্ডলে চন্দ্রের কলঙ্করেখার ন্যায় কি কোন কলঙ্কের চিহ্ন পাওয়া যায়? চন্দ্র আজ তাহার পূর্ব্বদিনের অঙ্গবৈকল্য সংশোধন করিয়াছে।

৮। হে চন্দ্র, যদি তুমি এই সুন্দরীর মুখ-রুচির ন্যায় শোভা বিকাশ করিতে পার, আমি সত্যই তোমাকে ভালবাসিব।

৯। হে চন্দ্র, যদি তুমি এই কুসুম-নয়না রমণীর সদৃশ হইতে চাহ, তবে সকলকে দেখা না দিয়া, কেবল আমারই কাছে তোমার শোভা-বিস্তার করিও।

১০। এই সুন্দরীর চরণ-যুগল এতই পেলব ও সুকুমার যে (এমন কি) অনিচ কুসুমের অথবা হংস-পক্ষের স্পর্শও তাহাদের কণ্টকস্পর্শ বলিয়া অনুভূত

(১) কবির কল্পনা এই—যে অনিচ পুষ্প সর্ব্বাপেক্ষা কোমল ও লঘু, তাহার বৃন্তগুলিও নায়িকার ক্ষীণ কটিদেশে গুরুভার অর্পণ করিবে।

ত্রয়োদশাধিক শততম পরিচ্ছেদ

প্রেমের মহিমা-কীর্ত্তন

(নায়কের উক্তি)

১। এই অস্ফুটবাক্ তন্বীর ওষ্ঠাধরের উপরিস্থ শিশিরবিন্দু মধুদুগ্ধের মিশ্রণের ন্যায় অপূর্ব্ব ও মধুর।

২। দেহের সহিত আত্মার সম্পর্ক কি নিগূঢ় ও মহান্। সরলতার মূর্ত্তি এই নারীর প্রতি আমার প্রেমও সেইরূপ অসীম ও উদার।

৩। হে আমার চক্ষু-তারকাস্থিত প্রতিবিম্ব, তুমি তোমার স্থান ত্যাগ করিয়া আমার বাসনারূপিনী এই তরুণীর আসন রচনা কর, কারণ এই কনকপ্রতিমার যোগ্যতর স্থান আর কোথায় আছে ?

৪। তাহার সহিত মিলনে আমার জীবন, বিরহে আমার মৃত্যু।

৫। এই তরুণীর দৃষ্টি অনঙ্গশরবর্ষিণী। সত্যই আমি ইহার গুণাবলী এক এক করিয়া স্মৃতিপথে জাগরূক করিতে পারি, অবশ্য উহাদিগকে বিস্মৃত হওয়া যদি আদৌ সম্ভব হয়। জানি না, উহাদিগকে কেমন করিয়া ভোলা যায়।

(নায়িকার উক্তি)

৬। তিনি কখনো আমার চক্ষুর বাহির হইবেন না ;

নিমেষপাতে তাঁহার অঙ্গে আঘাত লাগিবে না ; আমার প্রিয়ের আকৃতি এতই লঘু ও সুকুমার। (১)

৭। আমার প্রিয়তম অহরহঃ আমার নয়নের মধ্যে বাস করিতেছেন ; আমি নয়নে কজ্জল লেপন করিতেও ভয় পাই, পাছে মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আমার নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হন। (২)

৮। আমার দয়িত আমার হৃদয়-মন্দিরে নিয়ত অধিষ্ঠিত। পাছে তাঁহার শরীরে তাপ লাগে এই আশঙ্কায় আমি উষ্ণ খাদ্য গ্রহণ করি না।

৯। আমি আমার নয়নকে নির্নিমিষ করিয়া রাখি, পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনোজ্ঞ মূর্ত্তি আমার নয়নের অন্তরাল হয়। ইহা দেখিয়া জনপদ-বধূরা তাঁহাকে নির্ম্মম বলিয়া দোষ দেয়। (৩)

১০। আমার মনোমন্দিরে প্রেমের সিংহাসনে তিনি চিরবিরাজিত। তবুও গ্রামের লোকে বলে—'তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন,' তিনি নির্দ্দয়।

(১) কল্পনা এই যে, নায়ক তাহার অক্ষিমধ্যে বাস করে।

(২) কজ্জল লেপন করিবার সময় চক্ষের পাতা আপনা-আপনিই বন্ধ হইয়া যায়।

(৩) জনপদ-বধূদের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, নায়িকাকে নায়ক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার নিদ্রা হয় না।

চতুর্দশাধিক শততম পরিচ্ছেদ

ভদ্রতার সীমার বহির্ভূত

(নায়কের উক্তি)

১। প্রিয়া হইতে যে সকল প্রণয়ী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং বিরহের তুষানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের পক্ষে কৃচ্ছ্র-জ্ঞাপক তীক্ষ্ণধার তালবৃন্তের উপর আরোহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। (১)

২। শরীর ও মন এই দুর্বিবহ দুঃখ সহ্য করিতে অক্ষম, কাজেই তাহাদিগকে তালপত্রে আরোহণ-রূপ কষ্টকেও বরণ করিয়া লইতে হইতেছে। তাহারা সকল শালীনতাকে পদদলিত করিয়াছে।

৩। পূর্ব্বে চিত্তের দৃঢ়তা ও শালীনতার জ্ঞান আমার যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু এখন আমার সহায় কেবল এই তালপত্র, যাহা আর্ত্ত বিরহীর একমাত্র আশ্রয়।

৪। দৃঢ়তা ও শিষ্টতার ভেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ভাসিয়াছিলাম এতদিন, কিন্তু বাসনার দুর্নিবার আবেগ তাহাকে আপন পথেই টানিয়া লইয়াছে।

৫। চারু-কঙ্কণ-শোভিতা, কুসুমকোমলা তরুণীর জন্যই আমি তালপত্রে আরোহণের ক্লেশ স্বীকার

---

(১) ইহার ব্যাখ্যার জন্য ভূমিকা দেখুন।

করিয়াছি ; সন্ধ্যাকালীন বেদনাকেও বরণ করিয়া লইয়াছি।

৬। আমার সেই ছলনাহীনা প্রিয়ার কথা চিন্তা করিয়া আমি নয়নে নিদ্রা আনিতে পারি না ; অতএব এই নিবিড় নিশিথেও আমি তালবৃন্তে আরোহণ করিয়া রহিব।

৭। হৃদয়ে সমুদ্রসম গভীর প্রেম পোষণ করিয়াও নারী তালবৃন্তে আরোহণ করিতে বিরত থাকে। তাহার সেই অপূর্ব্ব আত্ম-সংযম অপেক্ষা মহনীয় ও প্রশস্য আর কি আছে ?

(নায়িকার উক্তি)

৮। কামনার তীব্র আবেগ আমার কুমারী-সুলভ ব্রীড়া ও দেহের প্রতি মমত্ব-বোধকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং হৃদয়ের গুপ্ত প্রেমকে নানাভাবে নিয়ত অভিব্যক্ত করিতেছে।

৯। কিন্তু কেহ তো আমার এই উদগ্র প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না ; তাই সে পথে পথে সততই আপনাকে প্রকাশিত করিয়া ফিরিতেছে।

১০। নির্ব্বোধেরা আমার মুখের উপর বক্র হাস্য করিতেছে, কারণ আমার ন্যায় তাহারা (বিরহের) তীব্র যাতনা অনুভব করে নাই।

পঞ্চদশাধিক শততম পরিচ্ছেদ

জনশ্রুতি

(নায়কের উক্তি)

১। গ্রামের পথে পথে যখন কোলাহল উত্থিত হয়, তখন আমার মৃত দেহে পুনরায় জীবন-সঞ্চার হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অনেকেই এই নিগূঢ় কথা জানে না। (১)

২। গ্রামবাসীরা আমার কঞ্জাক্ষী প্রিয়তমার হৃদয়-সম্পদের কথা অবগত নয়; তাই তাহারা এই কোলাহল উৎপাদন করিয়া সুলভে আমাকে এই অমূল্য বস্তু দিয়াছে।

৩। গ্রামের এই জল্পনা কি আমার নিকট একটী মহামূল্য সম্পদ নয়? কারণ, তাহাকে না পাইয়াও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।

৪। এই লোকাপবাদ হইতে তাহার প্রতি আমার আবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা না থাকিলে সমস্তই নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

(১) জানিলে হয়তো তাহারা এই কোলাহল বন্ধ করিয়া দিত, এবং তাহার ফলে আমার জীবন-নাশ হইত।

৫। যেমন একপাত্র আসব পান করিলে, আসবের পিপাসা বাড়িয়াই যায়, সেইরূপ প্রেমের স্বরূপ অপরের নিকট যতই প্রকট হয়, প্রেমের মাধুর্য্য ততই বর্দ্ধিত হয়।

(নায়িকার উক্তি)

৬। কেবল একটী মধুরাত্রির জন্য আমাদের মিলন হইয়াছিল, কিন্তু এই ক্ষণকালীন মিলনকে কেন্দ্র করিয়া যে কলকোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের নিরীক্ষণ-কালে যেমন হইয়া থাকে সেইরূপ। (২)

৭। সাধারণের নিন্দা-রূপ সার এবং মাতার গঞ্জনা-রূপ জল-সেক দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া আমার বিরহ-দিগ্ধ হৃদয়ের বেদনা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

৮। যেমন ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপন অসম্ভব, তেমনই লোকনিন্দা দ্বারা আমার বাসনার নিরোধও সম্ভব নহে।

৯। যখন আমার দয়িতই "মা ভৈঃ" বলিয়া আমাকে পার্শ্ববর্ত্তী পথিকের নিন্দার অধীন করিয়া গিয়াছেন, তখন এই লোকাপবাদে আমার কি লজ্জা অনুভব করা উচিত ?

১০। অজ্ঞ জনগণের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত এই পরিবাদ আমি ভালবাসি। নিশ্চয়ই প্রিয়তমের নিকট ইহার জন্য আমার প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না।

---

(২) চন্দ্রের গ্রহণ দেখিবার জন্য ভারতবাসীরা বাটীর বাহির হইয়া আসে।

দ্বিতীয় খণ্ড

পতি-পরায়ণতা

ষোড়শাধিক শততম পরিচ্ছেদ

বিরহ-বেদনা

(নায়িকার উক্তি)

১। 'বিয়োগ হইবে না' এরূপ কোনো কথা যদি বলিবার থাকে তবে তাহাই আমাকে বল। কিন্তু তোমার আশু-প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তবে সে কথা তাহাকে বলিলেই ভাল হয়, যে ততদিন জীবিত থাকিবার আশা করে।

২। তাঁহার দর্শনই এক কালে আমাকে আত্মহারা করিত, কিন্তু তাঁহার আলিঙ্গনও এখন আমাকে বিষাদ-পূর্ণ করে, কারণ ভয় হয় যে, তিনি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন।

৩। কাহাকেও বিশ্বাস করিতে ভরসা হয় না, কারণ যিনি আমার হৃদয়ের সন্ধান জানেন, তাঁহার অন্তরের কোন্ গোপন কোণে আসন্ন বিচ্ছেদের ভাবনা লুকাইয়া আছে।

৪। যিনি আমাকে সাহস দিয়া নিজেই সরিয়া পড়িবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহার সুনিশ্চিত আশা-বাণীর উপর আস্থা স্থাপন করাতে কি আমার অন্যায় হইয়াছে?

৫। হে সখি, যদি আমাকে বাঁচাইতে চাও, তবে আমার জীবনবল্লভকে যাইতে বারণ কর, কারণ যদি তিনি চলিয়া যান, আমার ভয় হয় যে, ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না।

৬। যখন প্রিয় নির্ম্মম হইয়া আমার মুখের উপর বলিবেন, "আমি চলিলাম" তখন যে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করিবেন, সে আশা আমার নাই।

৭। যে বলয় একদা আমার প্রকোষ্ঠে দৃঢ়-সংলগ্ন থাকিত, তাহা আজ আপনি স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতে কি আমার প্রিয়তমের বিদায়-বার্ত্তা ঘোষিত হইবে না? (১)

৮। অন্তরঙ্গ আত্মীয়গণ যেখানে নাই, সেস্থান বিষময়; কিন্তু দয়িতের বিচ্ছেদ তদপেক্ষাও মর্ম্মভিদ্।

৯। অগ্নিকে স্পর্শ করিলে তবে সে দগ্ধ করে, কিন্তু দূর হইতে দগ্ধ করে প্রেম।

১০। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বিচ্ছেদ ও বিদায়-দুঃখের মধ্যেও জীবিত থাকেন এবং বল্লভের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করেন।

(১) কল্পনা এই যে—নায়কের বিচ্ছেদের চিন্তামাত্রেই নায়িকার শোক এত তীব্র হইয়াছে যে, তাহার ভুজলতা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে বলয় খসিয়া পড়িয়াছে।

সপ্তদশাধিক শততম পরিচ্ছেদ

প্রিয়-বিচ্ছেদ-দুঃখে বিলাপ

(নায়িকার উক্তি)

১। দেখ, এখনো আমি আমার অন্তরের অসীম দুঃখের কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু প্রবহমান নির্ঝরের জলধারা যেমন অবিরাম শোষণেও নিঃশেষ হয় না, সেইরূপ আমার শোকাশ্রু-নির্ঝর শত প্রয়াস সত্ত্বেও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

২। আমার দুঃখকে গোপন রাখা এখন আমার সাধ্যের অতীত, কিন্তু ইহা এমন যে আমার বাঞ্ছিতের নিকট প্রকাশ করিতেও আমাকে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হইবে।

৩। আমার প্রাণ-যষ্টির দুই প্রান্তে অনুরাগ ও সঙ্কোচের বোঝা বাঁধিয়া আমি বহন করা বেড়াইতেছি, এবং আমার এই আর্ত্ত ও অসহায় দেহ দুঃসহ (দুঃখের) ভারে সতত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। (১)

---

(১) গুরুভার বহন করিতে হইলে লোকে তাহা দুই সমান ভাগে ভাগ করিয়া একটী দণ্ডের দুই প্রান্তে তাহাদিগকে সংলগ্ন করে এবং দণ্ডটী উঠাইয়া তাহার মধ্যভাগ স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যায়।

৪। আমার অনুরাগ ও প্রিয়তমের মধ্যে দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান। এমন একখানি নির্ভরযোগ্য ভেলাও নাই যে, তাহার সাহায্যে এই বিশাল বারিধি উত্তীর্ণ হইতে পারি।

৫। যাহারা বন্ধু হইয়াও বন্ধুগণকে দুঃখের দাহে শুকাইয়া মরিতে দেয়, তাহারা শত্রু হইলে না জানি আরো কত নির্ম্মম হইতে পারে?

৬। ভালবাসার যে-আনন্দ, তাহা অম্বুধির মতই অনন্ত। কিন্তু প্রিয়জনের অভাবে বিরহের যে-বেদনা, তাহার গভীরতা অধিকতর।

৭। আমি বাত্যাক্ষুব্ধ অকূল প্রেমসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছি। নিশীথ রাত্রিতেও আমি একাকিনী—আমাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই।

৮। যামিনীর মায়াদণ্ডের স্পর্শে নিখিল জগৎ নিদ্রায় অচেতন। কেবল আমিই জাগ্রত থাকিয়া তাহার সাহচর্য্য করিতেছি।

৯। রাত্রির গতি অতিশয় শ্লথ ও মন্থর। আমার প্রতি তাহার আচরণ আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর; কঠোরতায় সে আজ আমার নির্ম্মম প্রিয়তমকেও পরাজিত করিয়াছে।

১০। আমার হৃদয়ের মত আমার চক্ষুও যদি দৌড়াইয়া বাঞ্ছিতের কাছে পৌঁছিতে পারিত, তবে তাহাকে আজ অশ্রুসাগরে সাঁতার দিতে হইত না।

অষ্টাদশাধিক শততম পরিচ্ছেদ

সাগ্রহ প্রতীক্ষায় চক্ষুর ক্ষয়

(নায়িকার উক্তি)

১। আমার চক্ষুর্দ্বয় আজ আমার নিকট অভিযোগ করিতেছে কেন? তাহাদেরই নিমিত্ত আমি সান্ত্বনার অতীত এই সন্তাপ ভোগ করিতেছি; কারণ তাহারাই আমার বল্লভকে দেখাইয়াছে।

২। আমার নয়নদ্বয় কামনায় অন্ধ হইয়া দয়িতের প্রতি তাকাইয়া আজ অনুশোচনা করিতেছে কেন? এই অবিবেকিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের গ্রহণ করা উচিত।

৩। সেদিন তাহারা স্বেচ্ছায় ও অবাধে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াছিল; আজও তাহারা বিলাপ করিতেছে আপন ইচ্ছায়। দেখ, তাহারা নিজেদের কিরূপ হাস্যাস্পদ করিতেছে!

৪। যে অশমনীয় দুঃখের ভার আমাকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে, তাহা আমার উপর চাপাইয়া, আমার নয়ন দুইটী, স্বীয় অশ্রুভাণ্ডার রিক্ত হওয়াতে এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

৫। সমুদ্র অপেক্ষাও অপরিমেয় দুঃখরাশি আনিয়াছে আমার চক্ষুই। আজ তাহারা অরুন্তুদ বেদনা পাইয়া শুকাইয়া যাইতেছে, এবং নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

৬। যে-চক্ষুর্দ্বয় আমার এই অসহনীয় দুঃখের হেতু, আজ তাহারা একই যাতনায় অধীর। এই প্রতিহিংসা কি মধুর!

৭। যে নয়ন দুইটী প্রিয়তমের মূর্ত্তির প্রতি সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া তাকাইয়া ছিল, তাহাদিগকে আমি অভিসম্পাত করি। দীর্ঘ দুঃখের দাহে যেন তাহাদের মূল পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়।

৮। এমন লোকও সংসারে আছে যাহারা প্রতিদান না পাইয়াও প্রেম নিবেদন করে। প্রমাণ আমার এই চক্ষুদুটী—দয়িতকে না দেখা পর্য্যন্ত ইহাদের বিরাম নাই।

৯। দয়িত দূরে থাকিলে আমার চক্ষুতে নিদ্রা থাকে না; কাছে আসিলেও নয়ন নিদ্রাহীন। যেমন করিয়াই হউক, চিরন্তন দুঃখভোগই তাহাদের ভাগ্যলিপি।

১০। যখন আমার চক্ষুর মত কাহারও চক্ষুই তাহার মনোভাব জ্ঞাপন করে, তখন মনের যে-ভাব সে গোপন করিতে চেষ্টিত, অন্যের পক্ষে তাহা পাঠ করা কিছুই কঠিন নহে।

ঊনবিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

দহ্যমান প্রেমজনিত বিবর্ণতায় দুঃখ

(নায়িকার উক্তি)

১। আমার প্রিয়তমের বিদায়ে সম্মতি দিয়াছিলাম আমি নিজেই; এখন আমার মলিনতার জন্য কাহাকে দোষী করিব ?

২। তাঁহার বিরহ-সমুথ বলিয়াই আমার বিবর্ণতার এত স্পর্দ্ধা। তাই সে রঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গে লীলা করিতেছে।

৩। সেই তরুণ তস্কর আমার ব্রীড়া ও কমনীয়তা সকলই হরণ করিয়া লইয়াছেন, বিনিময়ে দিয়াছেন শুধু অসহ বিরহ ও পাণ্ডুর বর্ণ।

৪। আমার বল্লভই আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান, রসনা শুধু তাঁহারই প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করে। অথচ কি আশ্চর্য্য, আমার দেহলতা পাণ্ডুর ও বিবর্ণ। (১)

---

(১) ভগবানকে স্মরণ করিলে ও তাঁহার নাম লইলে যেমন অপদেবতা দূরে পলায়ন করে, সেইরূপে আমার বল্লভের চিন্তা ও প্রশংসা-বাক্যের উচ্চারণে আমার বিবর্ণতা-ব্যাধি দূর হওয়া উচিত ছিল।

৫। সখি, তুমি বলিতেছ তিনি দূরে যান নাই। সেদিনও তো তিনি অধিক দূরে ছিলেন না, তবু আমি শুকাইয়া উঠিতেছিলাম কেন ?

৬। যেমন অন্ধকার আলোকের অন্তর্ধানের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তেমনই মলিনতা আমার প্রিয় বিরহের অপেক্ষা করিয়া ছিল।

৭। আমি তাঁহার আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিলাম, তাহার পর অতি অল্পকালের জন্য কর্ম্মান্তরে গিয়াছিলাম। তবুও অহেতুক বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আমার সমস্ত দেহ যেন পাণ্ডুরতায় ছাইয়া গেল।

৮। জানি, অনেকে আমার নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকে "দেখ, ও কেমন কৃশ ও মলিন হইয়া গিয়াছে"; কিন্তু হায়, যে নিষ্ঠুর প্রিয়তম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁহার নিন্দা তো কেহ করে না।

৯। দোহাই সখি, তাঁহাকে সকল অসদিচ্ছার অভিযোগ হইতে মুক্ত কর। আমার দেহ মৃত্যুচ্ছায়া-মলিন হইলে তোমার কি আসে যায় ?

১০। আমার দেহের মসিমলিনতার জন্য আমার সহস্র নিন্দা হউক; আমার দয়িতকে নির্দ্দয় বলিয়া যেন কেহ দোষারোপ না করে।

বিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

প্রিয়তমের সহানুভূতির অভাবে হৃদয়ের দারুণ যাতনা

(নায়িকার উক্তি)

১। অস্থিহীন মধুর প্রেমফলের আস্বাদন তাহাদেরই ভাগ্যে ঘটে, যাহারা প্রিয়ের প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হয়।

২। আকাশের বারিধারা যেমন ধরণীকে সঞ্জীবিত করে, তেমনই প্রিয়তমের প্রেমধারা আর্ত্ত দয়িতাকে নবজীবন দান করে।

৩। সুখী তাহারাই, যাহারা প্রেমের বিনিময়ে লাভ করে প্রেম।

৪। অপরের স্নেহ পাইয়া নারীর কি লাভ ? প্রিয়ের প্রেম বিহনে নারী-জীবনের সুখ কোথা ?

৫। আমি যেমন তাঁহাকে ভালবাসি, তিনিও যদি আমাকে সেইরূপ ভাল না বাসেন, তবে কেমন করিয়া আমি তাঁহার নিকট কোনো অনুগ্রহের প্রত্যাশা করিতে পারি ?

৬। দণ্ডের উভয় প্রান্তস্থ ভারদ্বয়ের ন্যায় উভয় পক্ষের প্রেম যদি সমভাবে ন্যস্ত হয়, তবেই প্রেমের

মাধুর্য্য অনুভূত হয়; কিন্তু উহা যদি একপক্ষে অবস্থিত হয়, তবে তাহা হইতে অপ্রীতিকর আর কিছুই হইতে পারে না।

৭। প্রেমের অধিদেবতা কেবল আমাকেই আহত করেন। আমার দুঃখ বেদনার প্রতি কি তাঁহার কিছু-মাত্র লক্ষ্য নাই?

৮। প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া পাষাণ-দেবতার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া যে নারী জীবিত থাকে, তাহা অপেক্ষা কঠিন-প্রাণ জীব পৃথিবীতে আর কে আছে?

৯। দয়িত যদি আমাদের প্রতি অকরুণ হন, তবুও তাঁহার প্রেরিত বার্ত্তা আমাদের কর্ণে সুধা বর্ষণ করে।

১০। হে হৃদয়, ধিক্ তোমাকে! যে তোমাকে ভালবাসে না, তাহাকে তুমি তোমার বেদনা নিবেদন করিতে চাহ? জানিও, সমুদ্রের বারি-শোষণের (প্রয়াসের) ন্যায়ই ইহা অসম্ভব।

একবিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

প্রোষিত প্রণয়ি-যুগলের পরস্পরের জন্য হা-হুতাশ

(নায়কের উক্তি)

১। কেবল স্মরণেও প্রেম অপূর্ব্ব মধুর—অনন্ত আনন্দের অফুরাণ উৎস। আসবাপেক্ষাও প্রেম মধুরতর।

২। যে মুহূর্ত্তে আমার প্রিয়ার মুখচ্ছবি আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, আমার সকল বেদনা তিরোহিত হয়।

(নায়িকার উক্তি)

৩। হাঁচি আসিয়াছিল, কিন্তু সহসা থামিয়া গেল। বুঝি আমার জীবনসর্ব্বস্ব আমাকে স্মরণ করিতে করিতে ভুলিয়া গেলেন।

৪। তাঁহার হৃদয়ে আমার কি কোনো স্থান আছে? তবে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই যে, তিনি আমার মনোমন্দিরে চিরবিরাজিত।

৫। তাঁহার স্মৃতিপট হইতে তিনি আমার ছবি সযত্নে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। আমার মানসপটে আপনাকে এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত করিতে কি তিনি বিন্দু-মাত্রও লজ্জিত নহেন?

৬। আমাদের প্রথম মিলনের স্মৃতিই আমাকে আজও সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। সেই সান্দ্র স্মৃতিখানি ছাড়া আমার জীবনের আর কিই বা অবশিষ্ট আছে? (১)

৭। তাঁহার স্মৃতিতে পূর্ণ আমার চিত্ত দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি মন হইতে অন্তর্হিত হইলে আমার দশা কি হইবে?

৮। মনে মনে যতই তাঁহাকে স্মরণ করি, তিনি বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হইবেন না; অভাগিনীর প্রতি প্রিয়তমের এতই অনুগ্রহ।

৯। যে জন আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা অভিন্ন, আমাদের একই জীবন, একই আত্মা," তাঁহার নির্দ্দয়তার কথা যখন মনে হয়, তখন দেহ হইতে প্রাণ যেন লুকাইয়া যায়।

১০। হে শশাঙ্ক, তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার দেখা না পাই,--যিনি আমা হইতে বিযুক্ত হইয়াও আমার হৃদয়ে অহরহঃ বিরাজ করিতেছেন----ততক্ষণ অস্তমিত হইও না।

---

(১) সহচরি যেন তাহাকে বলিয়াছিল, "যখন তাঁহার স্মরণে এত ক্লেশ হয়, তখন তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা কর না কেন?" নায়িকার উক্তি তদুত্তরে বলা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নাবস্থার প্রশংসা

(নায়িকার উক্তি)

১। যে স্বপ্ন আমার নিকট আমার প্রিয়তমের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, আমি তাহাকে কিরূপে সম্মানিত করিব ?

২। নয়নে যদি নিদ্রা আনিতে পারিতাম, তবে স্বপ্নে আমি দয়িতের নিকট উড়িয়া গিয়া জানাইতাম, কেমন করিয়া আজও আমি জীবন ধারণ করিয়া আছি।

৩। আজও যে বাঁছিয়া আছি, তাহার কারণ জাগরণে যাঁহাকে কখনো পাই না, স্বপ্নের সম্মোহে মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শন পাই।

৪। স্বপ্নজালের মধ্য দিয়া আমি প্রেমের অপার আনন্দ অনুভব করি ; কারণ আমার প্রবুদ্ধ অবস্থায় যিনি ক্ষণিকের দেখা দিতেও কৃপণতা করেন, সুষুপ্তির কালে তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হন।

৫। স্বপ্ন ততক্ষণই আনন্দময় বোধ হয়, যতক্ষণ আমাব সম্মুখে দয়িতের মূর্ত্তি বিরাজ করে। জাগরণের অবস্থার কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

৬। এই বেদনাময় জাগরণের অবস্থা যদি না থাকিত, তাহা হইলে শাশ্বত স্বপ্নলোকে প্রিয়তমের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনের অক্ষয় আনন্দ অনুভব করিতে পারিতাম।

৭। যে নির্ম্মম বন্ধু জাগরণে একবার দেখা দিতেও কুণ্ঠিত, স্বপ্নে তিনি এমন করিয়া আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া থাকেন কেন?

৮। আমার নিদ্রাকালে তিনি আমায় বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া রাখেন এবং আমি নয়ন উন্মীলন করিতে না করিতে তিনি আমার হৃদয়মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন।

৯। প্রিয়তম সকলের সমক্ষে আমাকে দেখা দেন না বলিয়া লোকে তাঁহার নিন্দা করে. কিন্তু তাহারা তো স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

১০। জানপদগণ বলে, তিনি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন; তাহারা তো জানে না যে, স্বপ্নে আমি নিত্য তাঁহার দেখা পাই।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাসমাগমে বিলাপ

(নায়িকার উক্তি)

১। সন্ধ্যা, তোমায় বলিহারি! তোমায় সন্ধ্যা নাম কে দিলে ? যথার্থ কথা বলিতে গেলে, তুমি বিয়োগ-বিধুর পরিণীত ব্যক্তিগণের জীবিতাপহ মুহূর্ত্ত।

২। হে সন্ধ্যা, তোমাকে ম্লান ও বিষণ্ণ মনে হইতেছে ; মিনতি করি, বল সখি, তোমারও দয়িত কি আমার প্রিয়তমের মতই নির্ম্মম ?

৩। শিশিরসিক্তা সন্ধ্যাবধূ একদা বেপথু ও দীর্ঘ-শ্বাস-সহকারে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইত। এখন সে সাহসিকার বেশে আমার নিকট উপস্থিত হয় এবং আমার বক্ষে কেবল বেদনা ও হাহাকার তুলিয়া দেয়।

৪। দয়িত যখন দূরে থাকেন, সন্ধ্যা তখন আসে বধ্যভূমিস্থ জল্লাদের বেশে।

৫। উষা-সতীরই বা আমি কি উপকার করিয়াছি, এবং সন্ধ্যা-সুন্দরীর চরণেই বা আমার কি অপরাধ হইয়াছে (যে, রাত্রি প্রভাতে আমার বেদনার উপশম হয় এবং সন্ধ্যাগমে উহার বৃদ্ধি হয়) ?

৬। হায়, হায়, প্রিয়তম যতদিন নিকটে ছিলেন, আমি সন্ধ্যার দংশন অনুভব করি নাই।

৭। এই বেদনা আমার হৃদয়বৃন্তে প্রভাতে কোরকের আকারে উৎপন্ন হয়, সারাদিন ধরিয়া উহার দলগুলি বিস্তার করিতে থাকে, এবং সন্ধ্যাগমে পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় বিরাজ করে।

৮। লোকে বলে ইহা রাখালের বাঁশী, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা নারীবধের শাণিত আয়ুধ, কারণ মর্ম্মদাহী প্রদোষের সূচনা করে এই বেণুধ্বনি।

৯। ইতিমধ্যেই সন্ধ্যা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে; সে যদি আর এক মুহূর্ত্তও অগ্রসর হয়, তবে সমগ্র নগর শোকের আস্তরণে আচ্ছাদিত হইবে, কারণ তাহা হইলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত।

১০। জীবনের শেষ রেশটুকু যাহা আমার দেহে সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহা শীঘ্রই বিলীন হইবে, কারণ সন্ধ্যা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয় সেই নির্ম্মম প্রিয়তমের মুখচ্ছবি, যিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া অর্থের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছেন।

চতুর্বিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

মনোজ্ঞ মূর্ত্তির পরিক্ষীণতা

(নায়িকার উক্তি)

১। আমার সুখবর্দ্ধনের জন্যই, চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া যিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার চক্ষু নিয়ত তাঁহারই ধ্যান করিতেছে এবং পুষ্পের সমক্ষে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিতেছে। (১)

২। আমার দীপ্তিহীন নয়ন অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; ভয় হয়, বুঝি-বা আমার দয়িতের নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়া ফেলে।

৩। বিবাহের দিন যে বাহুদ্বয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা বিশ্বের সম্মুখে প্রিয়তমের বিদায়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ফেলিবে।

৪। প্রিয়-বিচ্ছেদে যে বাহুদ্বয় তাহাদের স্বাভাবিক কমনীয়তা হারাইয়াছিল, তাহারা ক্রমশঃ এত কৃশ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকোষ্ঠ হইতে কনক-বলয় ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

৫। প্রকোষ্ঠ-শোভী বলয়-সহ স্বাভাবিক লাবণ্য

(১) এরূপ স্পষ্টতঃ অসঙ্গত কথায় বিশ্বাস করার জন্য।

হারাইয়া আমার বাহু সেই নিষ্ঠুর শঠের হৃদয়হীনতা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে।

৬। লোকে তাঁহাকে হৃদয়হীন বলিয়া নিন্দা করিতেছে, তাই আমি আমার বাহুদ্বয়কে তাহাদের কৃশতা নিবন্ধন, এবং প্রকোষ্ঠ হইতে বলয় বিচ্যুত হইতে দেওয়ার জন্য, ভর্ৎসনা করি।

৭। হে হৃদয়, আবার তুমি কি তোমার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে চাও? তবে ছুটিয়া যাও সেই নিষ্ঠুর দয়িতের নিকট, এবং জানাও তাঁহাকে আমার ভুজলতার পরিক্ষীণতায় গ্রামের মধ্যে কি বিপুল জনবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

(নায়কের উক্তি)

৮। একদিন আমরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ ছিলাম। সহসা আমি আমার বাহুবন্ধন ঈষৎ শিথিল করিলাম, অমনি সেই সরলা ললনার ললাট আশঙ্কায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

৯। বাতাসের একটী মাত্র নিঃশ্বাস-তরঙ্গ আলিঙ্গন-কালে আমাদের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল; অমনি জলভরা মেঘের মত অশ্রুগর্ভ তাহার আয়ত নেত্র হইতে রক্তিমা একেবারে বিলুপ্ত হইল।

১০। তাহার চক্ষুর্দ্বয় কি কেবল নিষ্প্রভই হইল! উপরিস্থ রক্তশূন্য ললাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

স্বীয় হৃদয়কে সম্বোধন

(নায়িকার উক্তি)

১। হে হৃদয়! তুমি কি আমার এই দুরারোগ্য রোগের প্রতীকারের কোনো উপায় চিন্তা করিবে না?

২। হে দগ্ধ হৃদয়! তিনি তোমাকে যখন ভালবাসেন না, তখন তাঁহার জন্য শোক করিয়া ফল কি?

৩। হৃদয়! এখানে বসিয়া বসিয়া তাঁহার কথা চিন্তা করিয়া শুকাইয়া মরিয়াই বা কি লাভ? দুঃখ দিয়াছেন যিনি, তিনি তো আমাদের কথা মনে করেন না।

৪। হে হৃদয়! যদি তুমি তাঁহার কাছে যাও, আমার এই চক্ষু দুটীকেও তোমার সঙ্গে লইও। ইহারা তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিরন্তর আমাকে পীড়াপীড়ি করে।

৫। তাঁহার প্রতি আমাদের অচপল অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রতি বীতরাগ। তাই বলিয়া আমরা কি তাঁহাকে আততায়ী বলিয়া মনে করিতে পারি?

৬। প্রসাধন-নিপুণ সেই প্রেমাস্পদের প্রতি যখন নিরীক্ষণ কর, তখন, হে আমার হৃদয়! তুমি ইতস্ততঃ না করিয়া সব ভুলিয়া তাঁহার উদ্যত আলিঙ্গনের মধ্যে

ঝাঁপাইয়া পড়। আমার মনে হয়, তোমার এখনকার বিরাগও কৃত্রিম।

৭। হে হৃদয়! সরম অথবা প্রেম—দুইয়ের একটী ত্যাগ কর। আমি দুইটীর ভাব যুগপৎ বহন করিতে অক্ষম।

৮। হে হৃদয়! আত্মসম্মানে তুমি জলাঞ্জলি দিয়াছ; যেহেতু নির্ম্মম চিত্তে যিনি তোমাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি আসিলেন না বলিয়া তুমি হাহাকার করিতেছ এবং তাঁহারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছ!

৯। কাহার মিলন-কামনা করিতেছ, হে হৃদয়! তিনি যে তোমার অন্তরাসনে চির বিরাজিত।

১০। যে কঠোর কান্ত আমাদিগকে পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার আরতি করার অর্থ আত্মক্ষয়ের পথে আরো অগ্রসর হওয়া।

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

আত্মসম্মানজনিত তুষ্ণীম্ভাবের অভাব

(নায়িকার উক্তি)

১। লজ্জাশীলতার অর্গল দ্বারা হৃদয়দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও, অনিরোধ্য প্রেমের কুঠারাঘাতে উন্মোচিত হইয়া যায়।

২। হৃদীয়হীন এই প্রেম বস্তুটী, যেহেতু ইহা নিশীথের নিস্তব্ধতার মধ্যেও আমাকে উদ্বেলিত করে।

৩। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে আমি এই প্রেমকে অবরুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করি, কিন্তু অতর্কিত ক্ষুতের (হাঁচির) ন্যায় ইহা আমার অজ্ঞাতসারে সহসা বাহির হইয়া পড়ে।

৪। লোকসমাজে আমার আচরণ মর্য্যাদাপূর্ণ ও অনিন্দ্য, ইহাই আমার চিরদিনের গর্ব্ব ছিল, কিন্তু হায়! সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রেমের দুর্নিবার আবেগ আত্ম-প্রকাশ করে।

৫। আত্মসম্ভ্রম যেরূপ নির্ম্মমভাবে প্রণয়িণীর তত্ত্ব লইতে অনিচ্ছুক, নায়িকার পক্ষে সেরূপ কঠোর আত্ম-মর্য্যাদা দেখান নূতন বস্তু।

৬। হে দুঃখ! আমার প্রতি তোমার কি বিষম প্রেম! যে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে, তুমি তাহারই অনুসরণ করিতে আমাকে প্ররোচিত কর?

৭। দয়িতের প্রেমের কণামাত্র পাইলেও তো আমরা আমাদের বাক্-সংযম হারাইয়া ফেলি।

৮। নানা চাতুরি-নিপুণ সেই শঠ-শিরোমণির মৃদুভাষ শ্রবণ করিলে আমাদের মর্য্যাদার বাঁধ স্বতঃই শিথিল হইয়া যায়।

৯। ভাবিয়াছিলাম উপেক্ষাভরে চলিয়া যাইব। কিন্তু তাঁহারই নিকট গিয়া তাঁহার বাহুসংলগ্ন হইলাম, কারণ, দেখিলাম বহু পূর্ব্বেই আমার চিত্তধারা সেই প্রেম-সঙ্গমে উপনীত হইয়াছে।

১০। অগ্নিতে ঘৃতের ন্যায় যাহাদের চিত্ত প্রেমের উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহারা কি প্রিয়তমের সহিত মনোবাদ ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে?

সপ্তবিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

মিলনের আকাঙ্ক্ষা

(নায়িকার উক্তি)

১। আমার নেত্র তাহার জ্যোতি হারাইয়াছে এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়াছে। দয়িতের আগমন-প্রতীক্ষায় গৃহ-গাত্রে অঙ্কিত রেখাসকল গণিয়া গণিয়া আমার অঙ্গুলিগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছ। (১)

২। হে সখি, আজিকার দিন যদি ভুলিয়া যাই তাহাতে কি ক্ষতি? আমার সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত ও বলয় প্রকোষ্ঠচ্যুত হইয়াছে।

৩। জিগীষু হইয়া তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আজিও যে বাঁচিয়া আছি, সে কেবল তাঁহার প্রত্যাগমনের আশায়।

৪। তিনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমার হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে পদদলিত করিয়াছেন। তথাপি

---

(১) কল্পনা এই যে, নায়িকা গণিতে পারদর্শী নয়। সেই হেতু যেমন যেমন দিন গত হইতেছে, তেমনি তেমনি কক্ষ-ভিত্তি-গাত্রে এক একটী দাগ দিয়া যাইতেছে, এবং নায়কের ফিরিবার আর কতদিন বাকী আছে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে ঐ দাগগুলি অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা গণিতেছে।

অচিরে তিনি আবার আসিবেন—এই চিন্তায় আমার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠে।

৫। প্রিয়তমের রূপসুধা পান করিয়া আমার নেত্র তৃপ্ত হউক। এইরূপে আমার ক্ষীয়মান বাহুর বিবর্ণতা দূর হইবে।

৬। একবার শুধু তিনি গৃহে ফিরিয়া আসুন, আমি তাঁহার কমনীয় রূপসুধা পান করিয়া আমার ক্ষীণতা-ব্যাধিকে বিদায় করি।

৭। আমার নয়নের মণি হৃদয়-দেবতা যখন ফিরিয়া আসিবেন, আমি কি দীর্ঘ অদর্শনের জন্য মানভরে বসিয়া থাকিব? না তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিব? না (একে একে) দুইয়েরই অনুষ্ঠান করিব?

(নায়কের উক্তি)

৮। যুবরাজ সত্বর সমর আরম্ভ করিয়া জয়লাভ করুন। আমি যেন আজই সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া আমার প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া আনন্দোৎসব করিতে পারি।

৯। যাহারা দিন গণিয়া প্রিয়ের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, একটী দিন তাহাদের নিকট এক সপ্তাহের মত দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়।

১০। আমার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই যদি প্রিয়ার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে গৃহে ফিরিয়া, তাহাকে দেখিয়া বা তাহাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া কি ফল হইবে?

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত মনোভাব পাঠ

(নায়কের উক্তি)

১। হে প্রিয়ে, তুমি গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তোমার নয়নের চঞ্চলতা বলিয়া দিতেছে, তোমার বক্ষে কোন্ বিচিত্র চিন্তা তরঙ্গায়িত হইতেছে। (১)

(নায়িকা নীরব। সহচরীকে সম্বোধন করিয়া নায়ক)

২। আহা! আমার সরলা বনিতার বাক্-সংযম ললনাকুলের মধ্যেও অতুলনীয়; তাহার সৌন্দর্য্য আমার নয়নের আনন্দ; বংশসদৃশ সুগোল ও সুগঠিত তাহার ভুজদ্বয় কি লোভনীয়!

৩। মুক্তা মধ্যস্থ সূত্রের মত একটী মাত্র চিন্তা দ্বারা তাহার চিত্ত অনুস্যূত, (অথচ) তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

৪। অস্ফুট কোরকের সৌরভের মত আমার ছলনা-হীনা প্রিয়ার অস্ফুট হাস্যের মধ্যে একটী প্রচ্ছন্ন অর্থ নিহিত আছে।

৫। যেরূপ চতুরতার সহিত সে তাহার উপচীয়মান চিন্তাকে গোপন করিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে আমার হৃদয়-বেদনার উপশমের ঔষধ আছে।

---

(১) পাছে আমি আবার চলিয়া যাই।

(নির্জ্জন অবস্থায় সহচরীকে সম্বোধন করিয়া নায়িকা)

৬। আমার প্রতি তাঁহার দয়া ও মাধুর্য্যের সীমা নাই। তাঁহার মনোভাব তিনি গোপন করিতে অক্ষম এবং আমার আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি বিদায়ের পালা আবার আসিল।

৭। তাঁহার চিত্তের উদাসীনতা আমা অপেক্ষা আমার মণিবন্ধচ্যুত কঙ্কণ অগ্রে অনুভব করিয়াছে। (কারণ প্রিয়-বিরহের চিন্তা মাত্রই তাহা প্রকোষ্ঠ-ভ্রষ্ট হইয়াছে।)

৮। মাত্র কল্য আমার প্রিয়তম বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই আসন্ন বিরহের সংবেদনায় আমার তনুলতা তাহার কোমলতা হারাইয়াছে। (২)

(নির্জ্জনে নায়ককে সম্বোধন করিয়া সহচরী)

৯। সখী একবার কঙ্কণের দিকে তাকাইল, পরে তাহার সুকুমার বাহুর প্রতি ও সর্ব্বশেষে স্বীয় চরণের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। মাত্র এই কয়টী সঙ্কেত সে আমাকে করিয়াছে।

(সহচরীকে নায়ক)

১০। প্রিয়া বিরহ-বেদনার তীব্রতার কথা বলিয়াছে এবং সহগামিনী হইবার প্রার্থনা জানাইয়াছে। শুদ্ধ নয়নের ভাষা দিয়া তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যগুণে সে রমণী মাত্রকেই অতিক্রম করিয়াছে।

---

(২) বিয়োগের পূর্ব্বাভাসেই আমার শোক এত তীব্র।

ঊনত্রিংশদধিক শততম পরিচ্ছেদ

মিলনের জন্য অধীরতা

(নায়িকার উক্তি)

১। আসবের চিন্তা অথবা দর্শন মাত্রই মানুষকে আত্মহারা করিতে পারে না। সে শক্তি আছে কেবল প্রেমের।

২। যখন প্রেমের পরিমাণ তালতরুর দীর্ঘতাকেও অতিক্রম করে, তখন বিরাগভাব চিত্তে কণামাত্রও উদিত হইতে পারে না।

৩। যদিও তিনি আমার প্রতি উদাসীন এবং যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, তবুও আমার নয়ন তাঁহাকে না দেখিয়া শান্তি মানে না।

৪। হে সখি, মনে করিয়াছিলাম মানভরে চলিয়া যাইব, কিন্তু আমার হৃদয় সে কথা ভুলিয়া গেল এবং প্রিয় সঙ্গমের জন্য উৎকণ্ঠিত রহিল।

৫। যেমন চিত্রণকালে চক্ষু তুলিকার কৃষ্ণত্ব দেখিতে পায় না, তেমনই দয়িত নিকটে থাকিলে তাঁহার কোনো দোষই আমার চোখে ধরা পড়ে না।

৬। যখন তিনি আমার সম্মুখে থাকেন, তাঁহার

কোনো ত্রুটিই আমি দেখিতে পাই না, কিন্তু তিনি দূরে থাকিলে সকলই তাঁহার দোষ বলিয়া বোধ হয়।

৭। নদীগর্ভস্থ বিপজ্জনক অন্তঃপ্রবাহ ভাসাইয়া লইয়া যাইবে জানিয়াও কে তাহাতে ঝাঁপ দেয়? তাঁহার প্রতি কোপ দেখাইয়া কি করিব? কারণ, আমি তো জানি, তাঁহার সান্নিধ্যে সে কোপ কোথায় ভাসিয়া যাইবে।

৮। মদ্যপের নিকট মদ্যের অনাদর কখনই হয় না, যদিও তাহাকে এই কারণে লোকের নিকট সদাই মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হয়। হে কপট, তোমার বক্ষও আমার নিকট সেইরূপ।

(নায়কের উক্তি)

৯। কুসুম অপেক্ষাও কোমল এই প্রেম। অতি অল্প লোকেই জানে ইহা কত সুকুমার এবং কত যত্নে ইহাকে লালন করিতে হয়। (১)

১০। আমার প্রথম দর্শনে তাহার চক্ষুতে মন্যু প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু যেমন আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, অমনি, আমা অপেক্ষাও দ্রুত, সে আমার উদ্যত আলিঙ্গনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

(১) যাহারা জানে, তাহাদের মধ্যে তুমি নও, কারণ তুমি তোমার রোষের দ্বারা আমাকে আহত করিতেছ।

ত্রিংশদধিক শততম পরিচ্ছেদ

হৃদয়কে তিরস্কার

(নায়িকার উক্তি)

১। তাঁহার হৃদয় তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তন করে; হে হৃদয়, তুমি আমার ইচ্ছাকে অনুসরণ করিয়া চল না কেন?

২। হে হৃদয়, তুমি তো দেখিয়াছ তিনি আমার প্রতি কত উদাসীন। তবুও তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হও, যেন তুমি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু!

৩। হে হৃদয়, তুমি নিজের খেয়াল ও খুশী অনুসারে তাঁহার অনুবর্ত্তন কর। হতভাগ্যদের বন্ধু নাই, তুমি কি আমাকে এই শিক্ষা দাও?

৪। তাঁহার সাহচর্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে একটু অভিমান দেখাইতেও তুমি অস্বীকৃত! এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া কে আর তোমার উপর নির্ভর করিবে?

৫। হয় তো তাঁহাকে পাইব না, অথবা পাইয়াও হারাইব, এইরূপ বেদনাময় চেতনায় আমার চিত্ত নিয়ত চঞ্চল।

৬। হৃদয় থাকাতে আমার কি উপকার? নির্জ্জনে আমি যখন চিন্তারত থাকি, তখন আমাকে গ্রাস করাই ইহার (হৃদয়ের) একমাত্র কার্য্য।

৭। তাঁহাকে ভুলিয়া কি প্রকারে নিজ মর্য্যাদা বজায় রাখিতে হয়, ইহা যাহার জানা নাই, এরূপ সম্ভ্রমজ্ঞানহীন হৃদয়ের হাতে পড়িয়া আমিও আত্মসম্মান হারাইয়া ফেলিয়াছি।

৮। দয়িতের অপমানে আমাদের নিজেদের অপমান, ইহাই আমার হৃদয়ের বিশ্বাস। সেইজন্য ইহা চিরদিনই তাঁহার পক্ষপাতী।

(নায়কের উক্তি)

৯। দুঃখদিগ্ধ জীবনকে বহনীয় করিবে কে, যদি দয়িতা তাহাকে দয়া করিতে অস্বীকৃত হয়?

১০। যখন আমার নিজ হৃদয়ই আমার অভিমানিনী প্রিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে, তখন অপরে (অর্থাৎ প্রিয়া) যে আমাকে উপেক্ষা করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

একত্রিংশদধিক শততম পরিচ্ছেদ

মান

(নায়িকার প্রতি সহচরী)

১। সখি, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিও না, ক্রোধের ভাণ করিয়া বসিয়া থাক। দেখা যাক্, এই ব্যাপারে কিরূপ বিব্রত হন তিনি।

২। মানই প্রেমের লবণ; কিন্তু দীর্ঘকাল মান ধরিয়া থাকা খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ-সংযোগের ন্যায় অপ্রীতিকর।

(নায়ককে সম্বোধন করিয়া সন্দিগ্ধা নায়িকা)

৩। যে মানিনীকে তুমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, তাহাকে আশ্লেষ না করিয়া যদি চলিয়া আসিয়া থাক, তবে তাহা আহতকে পুনরাঘাত করার মতই অকরুণ।

৪। দারুণ অভিমানে যে রোষ দেখাইতেছে, তাহাকে সান্ত্বনা না দিয়া ফিরিয়া আসা আর উপোষিত ব্রততীর মূল ছেদন একই কথা।

(নায়ক স্বগত)

৫। বিশুদ্ধ-চরিত্র পুরুষের নিকটও প্রিয়ার অভিমানের মাধুর্য্য নিতান্ত অল্প নহে।

৬। প্রিয়ার মধ্যে ভ্রূকুটি ও অভিমানের লীলা যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রেম তাহার পরিণত ও অর্দ্ধ-পরিণত ফলগুলি হইতে বঞ্চিত হইত।

৭। অভিমানের মধ্যে একটি বেদনাময় অনুভূতি থাকে, কারণ, প্রতিক্ষণেই মনোমধ্যে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয়—"মিলন নিকটে, না এখনো দূরে?"

(নায়িকাকে শুনাইয়া অর্দ্ধ স্বগতভাবে নায়ক)

৮। শোক করিয়া কি ফল?' কারণ, আমি যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহা দেখিবার জন্য আমাকে ভালবাসে এমন কেহ নিকটে নাই।

৯। ছায়াবহুল নিকুঞ্জে (সুপেয়) বারি তৃপ্তি-দায়ক। মান করা তাহাকেই সাজে, যে ভালবাসে প্রাণ দিয়া।

১০। যদি আমার হৃদয় এখনো তাহাকেই আকাঙ্ক্ষা করে, যে আমার শান্তি বিধান করে না, তবে ইহা তাহার অহেতুক কামনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম পরিচ্ছেদ

(নায়িকার উক্তি)

১। হে কপট রসিক ! রমণী মাত্রেই অপাঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা তোমাকে গ্রাস করে (তোমার মনোহরণ করে)। তোমার আলিঙ্গনে আমার প্রয়োজন নাই।

২। আমি মানভরে বসিয়া ছিলাম, এমন সময়ে তিনি হাঁচিলেন ; মনে করিয়াছিলেন "দীর্ঘজীবি হও, প্রিয়তম," বলিয়া আমি শুভকামনা করিব।

(নায়কের উক্তি)

৩। আমি যদি কখনো মাল্য পরিধান করি, তবে "অন্য কোনো তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এরূপ সজ্জিত হইয়াছ" এই বলিয়া সে রোষভরে চলিয়া যায়।

৪। আমি তাহাকে বলিলাম, "প্রিয়ে, জগতে সকলের চেয়ে তোমাকেই আমি ভালবাসি।" সে ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কাহার চেয়ে বল তো।"

৫। আমি কহিলাম, "প্রাণাধিকে, জীবনে আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হইব না।" হায় হায় ! শ্রবণমাত্র তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুর ঝারি ঝরিয়া গেল (পর জীবনে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে এই কল্পনা করিয়া)।

৬। আমি তাহাকে কহিলাম, "প্রিয়ে, প্রবাসে আমি তোমায় নিত্য স্মরণ করিতাম" ; অমনি উদ্যত আলিঙ্গন সম্বরণ করিয়া সে এই বলিয়া মানভরে চলিয়া গেল, "তবে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে (কোনো দিন) ভুলিয়াছিলে।"

৭। আমি হাঁচিলাম এবং সে আমার আয়ুষ্কামনা করিল। ক্ষণপরেই শুভেচ্ছা প্রত্যাহার করিয়া সাশ্রু-নেত্রে কহিল, "এখন তোমাকে কে স্মরণ করিতেছে যে, তুমি হাঁচিতেছ ?"

৮। আমি আমার ক্ষুত দমন করিলাম, তথাপি সে বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিল, "কেহ যে তোমাকে স্মরণ করিতেছে, সে কথা তুমি আমার নিকট গোপন করিতে চাহ।"

৯। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও সে অধিকতর কটু কটাক্ষ করিয়া বলে, "অপরের মানভঙ্গ করিয়া করিয়া তুমি এ বিষয়ে বেশ নিপুণতা লাভ করিয়াছ দেখিতেছি।"

১০। তাহার মঞ্জু মূর্তির প্রতি আবেশময় দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সে তিরস্কার করিয়া বলে, "কাহার রূপের সহিত আমার অবয়বের তুলনা করিতেছ ?"

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম পরিচ্ছেদ

মান-মাধুর্য্য

(নায়িকার উক্তি)

১। তিনি দোষশূন্য হইলেও এই অভিমানই আমাকে তাঁহার মনোরঞ্জন-পটুতা-মাধুর্য্যের আস্বাদ দেয়।

২। যদিও প্রিয়তমের প্রসন্নতাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তথাপি অভিমান দেখাইতে আমরা যে ব্যথা অনুভব করি, তাহা সূচি-বেধ-তুল্য যৎসামান্য হইলেও, তাহারও একটী নিজস্ব মাধুর্য্য আছে।

৩। প্রবহমান বারির সহিত সংশ্লিষ্ট ভূমির যেরূপ সম্বন্ধ, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধও যদি সেইরূপ নিবিড় ও নিগূঢ় হয়, তাহা হইলে অভিমান অপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গ (আনন্দ) আর কোথায় আছে ?

৪। প্রিয়তমের সহিত আমার কলহের মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে, যাহা রক্ষা-প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার হৃদয়কে বলপূর্ব্বক অধিকার করে।

(নায়কের উক্তি)

৫। সম্পূর্ণ কলঙ্কশূন্য আমার দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গন হইতে যখন মানিনীর বাহুযুগল অপসারিত হয়, তখন এক প্রকারের আমোদ অনুভূত হয়।

৬। ভোজনাপেক্ষা পরিপাক মধুরতর; সেইরূপ আশ্লেষ অপেক্ষা প্রণয়-কলহ প্রিয়তর।

৭। প্রেম-কলহে অগ্রে যে নতি স্বীকার করে, তাহারই হয় জয়। মিলনকালে ইহার সত্যতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

৮। ক্ষণকালের জন্য কলহের ভাণ করিয়া প্রিয়া কি আমাদের আলিঙ্গনের আনন্দকে অধিকতর সরস করিতে চান?

৯। আহা, যেন মানময়ীর অপূর্ব্ব ভ্রূকুটির এবং রোষ-স্ফুরিত অধরোষ্ঠের ছবি আরো কিছুক্ষণ উপভোগ করিতে পারি! কেবল আমার প্রার্থনায় যামিনীর অধিকার যেন আরো কিছু দীর্ঘ হয়!

১০। প্রেমের মাধুর্য্য অভিমানে এবং অভিমানের চরম সার্থকতা কলহান্তে নিবিড়-মধুর আলিঙ্গনে।



পরিশিষ্ট

কুরলের পরিশিষ্ট

১। মনুষ্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার (১)

ভারত মাতার যুগ্মচরণ দক্ষিণে তিন দিক হইতে ভারত-মহাসাগর দ্বারা বিধৌত। ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভাগটি একটী উপদ্বীপ এবং এই উপদ্বীপটীর নাম দাক্ষিণাত্য। ইহা অতি প্রাচীন মালভূমি—ভূতত্ত্ববেত্তাগণের মতে ইহা হিমালয় হইতেও প্রাচীন। মনুষ্য জাতির বিস্তারের সময় দাক্ষিণাত্য মালভূমির সহিত মাদাগস্কর ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংযোগ থাকার কথাও তাঁহারা বলেন। তখন সুমাত্রা দ্বীপ, যব দ্বীপ, বোর্ণিও দ্বীপ ইত্যাদি ছোট বড় ভূভাগ দ্বীপে পরিণত হয় নাই এবং যে সকল স্থান তাহারা এখন অধিকার করিয়া আছে, সেখানে একটী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বিদ্যমান থাকিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত সংযুক্ত ছিল। তখন নিউগিনির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া অস্ট্রেলিয়া পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং নিউজীলণ্ডের আয়তন আরও বৃহৎ ছিল বলিয়া কথিত হয়। ভু-গোলকের উত্তরার্দ্ধে জিব্রাণ্টর এবং আরও দুই তিনটী স্থানে আফ্রিকার সহিত য়ুরোপের যোগ ছিল। ব্রিটেন য়ুরোপের সহিত সংযুক্ত থাকাতে এখান হইতে আইসলন্দ, গ্রীনলন্দ ইত্যাদি হইয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ড বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত হয়। এদিকে এশিয়ার পূর্ব্বোত্তরে সাইবিরিয়ার

(১) Wallace's article on Anthropology in the International Geography.

পূর্ব্বাংশের সহিত আমেরিকার পশ্চিমোত্তরস্থ আলাস্কার যোগ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগে এন্থ্রপইডী পরিবার-ভুক্ত জীবগণ দুইটী ধারায় বিভক্ত হওয়াতে, এক ধারার জীবগণ মনুষ্য জাতিতে পরিণত হয়। প্রত্নজীবতত্ত্ববিদ্‌গণ যবদ্বীপকেই মনুষ্যের আদি জন্মভূমি বলিয়া অনুমান করেন। এই জন্মভূমি হইতে মনুষ্য পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবস্থায় মনুষ্য ও তাহা হইতে নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে অধিক ব্যবধান ছিল না। অপরাপর জীবেরা যেভাবে জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, মনুষ্যও সেইরূপে জীবন সংগ্রাম চালাইত। প্রভেদের মধ্যে এই যে, অন্যান্য জীব অপেক্ষা মনুষ্যের অধিক বুদ্ধি থাকাতে, সে তাহাদের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপিত করিয়া এবং একটী মাত্র জাতিতে পরিণত হইয়া বহু প্রাচীন যুগেও সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব-বর্ণিত স্থলাংশগুলির সংযোগ থাকাতে অতি প্রাচীন যুগের মনুষ্যেরা ভারতের পূর্ব্বদক্ষিণ অংশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এখান হইতেই এসিয়া, আফ্রিকা, য়ুরোপ, আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে। সেই যুগের সব লোক সর্ব্বত্র একই প্রকারের ছিল। বিছিন্নভাবে আবদ্ধ হইয়া অতি দীর্ঘকাল এক একটী স্থানে বাস করায়, সেই সেই বাসস্থানোপযোগী কতকগুলি বিশেষত্ব স্বতঃ তাহাদের আকৃতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই কারণেই মনুষ্য জাতির উপজাতিগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বাসস্থান, জলবায়ু, আহার, বংশ-পরম্পরাগত গুণ ও কাল তাহাদিগকে যেরূপভাবে গঠিত করিয়াছে তাহারা সেইরূপই হইয়াছে।

প্রাচীন যুগের মনুষ্যেরা নিজ নিজ মনোমত বাসস্থান অধিকার করিবার পর হইতেই উপজাতির বিবর্ত্তনের এবং মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের যুগপৎ সূত্রপাত হইল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ ফলের বিভিন্নতা ঘটিল। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থানে, যথা নাতিশীতোষ্ণ উত্তর মণ্ডলে, মানুষ শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকিল। অন্যত্র মানুষ পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। অনেক স্থানের মানুষ এখনও বন্য ও অসভ্য রহিয়া গিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর উত্তরাংশে কয়েকবার বহুবর্ষব্যাপী হিমানী উৎপাত হইয়াছিল। এই সকল উৎপাতের সময় এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী কালগুলিতে মনুষ্যকে বাধ্য হইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন খাদ্যের অভাবই স্থান পরিবর্ত্তনের মুখ্য কারণ। দেশের অনুর্ব্বরতা বা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি বশতঃ এই অভাব ঘটিতে পারে। নৈসর্গিক কারণে এক-এক দেশ কখনও কখনও শুষ্ক ও অনুর্ব্বর হইয়া যায় এবং সেখানে মনুষ্য ও পশুর বাস অসম্ভব হইয়া পড়ে। মধ্য এশিয়ার জলশূন্যতার ফলে য়ুরোপ ও এশিয়াবাসী জাতিগণের ইতিহাসে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সভ্যতার তারতম্য হেতুও অনেক সময় জাতি সমূহ-মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সভ্যতায় অনেক সময় মানুষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। বলবান দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অসভ্য জাতিরা অপেক্ষাকৃত বলহীন জাতিগণের ধনলুণ্ঠন বা বাসস্থান অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে স্থানত্যাগ করে। ধর্ম্মোন্মাদ বশতঃ অথবা ধার্ম্মিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্যও মনুষ্যগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে।

মানব জাতির পর্য্যটনের প্রতিরোধকারী কতকগুলি বাধারও উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—সমুদ্র, পর্ব্বতমালা, গভীর অরণ্য, জলপূর্ণ নিম্নভূমি, মরুভূমি। এগুলি প্রাকৃতিক বাধা। কৃত্রিম বাধাও থাকিতে পারে, যথা—দুর্গ, প্রাচীর, মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র।

বিগত লক্ষ বৎসরের মধ্যে কত অসংখ্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং কত অসংখ্য স্থান ত্যাগ করিয়া, কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানবকুল বর্ত্তমান স্থান সমূহে উপনীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। (১) হয়তো এক একটী জাতি অর্দ্ধেক ভূপৃষ্ঠ পর্য্যটন করিয়া তাহাদের আধুনিক বাসভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিগণ দ্বারা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার কতকগুলি অংশের অধিকার ইহার উদাহরণ।

২। ভারতবর্ষের জাতি সমূহ (২)

এই নীতি অনুসারে বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে কত জাতিরই সমাগম হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে, এখন যে সকল জাতির বাস ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কখন বা কি প্রকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের আলোচনা অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সম্যক্ মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। অনেক জাতি দেশান্তর হইতে আসিয়া ভারতীয় জনসমূহ মধ্যে এরূপ ভাবে গ্রস্ত ও মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা-

(১) Haddon's Wanderings of peoples.

(২) V. Smith's Ancient History of India and Encyclopoedia Britannica.

দিগকে পৃথক্ করা এক প্রকার অসম্ভব। এসম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় ও মারওয়াড়ী জাতি এবং শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ উদাহরণ স্বরূপ। আধুনিককালে যে সকল জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছে —যথা, মুসলমান, পারসী, ইহুদী, ইংরাজ ইত্যাদি—তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বহুযুগ হইতে উত্তর ভারতে আর্য্য জাতির বংশধরগণ (অন্যান্য অনেক জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া), দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় জাতি (অপর কয়েক জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া), এবং কোনো কোনো পার্ব্বত্য ও অরণ্যময় স্থানে কতকগুলি অসভ্য জাতি বাস করিয়া আসিতেছে। এই সকল জাতিরা কোন্ সময়ে ও কি প্রকারে এদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল? আর্য্যজাতির ভারতে আগমন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতমালার উত্তর-পশ্চিম ভাগ-সংলগ্ন কোনো স্থান হইতে আসিয়া খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ ছয়-সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দক্ষিণে এবং সিন্ধুনদের পশ্চিমে আফগানিস্থান ইত্যাদি লইয়া যে ভূভাগ, তাহা অধিকার করিয়াছিলেন এবং আনুমানিক খৃষ্টের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতে ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা কোন্ কোন্ জাতিকে বিতাড়িত করিয়া প্রথমে পঞ্চনদ, তৎপরে মধ্যদেশ এবং আরো পরে মগধ ইত্যাদি অধিকার করিয়াছিলেন? যাহারা এখন দ্রাবিড়ী বলিয়া পরিচিত তাহাদের সহিত কি তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল? না, তাঁহারা এখনকার অরণ্যবাসী কোল ইত্যাদি জাতিকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, স্মরণাতীত যুগ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষ একটী খর্ব্বশির (brachycephal) কৃষ্ণকায় জাতি

দ্বারা অধিকৃত ছিল। তখন ভারতবর্ষের ভৌগলিক অবস্থা সম্ভবতঃ অন্য প্রকারের ছিল। প্রথম অবস্থায় হয়তো গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল এসময় অপেক্ষা আরো উত্তর পশ্চিমে ছিল এবং সমগ্র দেশ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। উপরি-উক্ত জাতিই অনেকের মতে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী ছিল এবং পুরাণ ইত্যাদিতে ইহারাই নাগ নামে কথিত হইয়াছে। পরে কোনো কোনো স্থানে ইহারা, সভ্যতায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই বন্য ও অতি অসভ্য ছিল। মুণ্ডা, কোল, হো ইত্যাদিরা ইহাদেরই অবশেষ। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই জাতিকে প্রাগ্‌দ্রাবিড়ী (pre-Dravidian) জাতি বলা হয়। হয়তো শেষ হিমানী যুগের পর হইতেই প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীরা ভারতবর্ষের অধিবাসী। হিমানী যুগের পর ভারতবর্ষের ভৌগলিক সংস্থানের অনেক ইতর বিশেষ হইয়াছে। কতকগুলি প্রাকৃতিক বাধা বশতঃ প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীরা ভারতবর্ষে আবদ্ধ থাকায়, তাহাদের মধ্যে সভ্যতার অধিক বিকাশ হইতে পায় নাই। ঈরাণের অধিবাসীরা খর্ব্বশির আল্পাইন (অর্থাৎ উচ্চ উপত্যকাবাসী) জাতির অন্তর্গত একটী জাতি ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তাহাদেরও পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে ঐ দেশে একটী কৃষ্ণবর্ণ জাতির অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের সহিত প্রাগ্‌দ্রাবিড়ী জাতির সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। মলয় উপদ্বীপের সাকাই জাতি এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব অধিবাসীরা এই জাতির অন্তর্গত। সম্ভবতঃ স্মরণাতীত যুগে ইহারাই মলয় উপদ্বীপ হইতে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ইহাদের একদল ভারত-বাসী হইয়া ঈরাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

৩। দ্রাবিড়ী জাতি (১)

খর্ব্বশির মানব ব্যতীত আর এক প্রকার মানব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগকে দীর্ঘশির (Dolichocephal) মানব বলে। আর্য্যেরা দীর্ঘশির মানবের উদাহরণ। এই দুই শ্রেণীর মানবের সংমিশ্রণে একটী তৃতীয় শ্রেণীর মানবেরও উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং এক সময়ে পশ্চিম এশিয়া (এশিয়া মাইনর ইত্যাদি) এই মিশ্রজাতির বাসস্থান ছিল। ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মোঙ্গোলীয় রক্তেরও চিহ্ন পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, দ্রাবিড়ীরা এই জাতীয় মানব। এই মতে ইহারাই পশ্চিম এসিয়া হইতে বেলুচিস্থানের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, কারণ বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির সহিত দ্রাবিড়ীগণের জাতিগত ও ভাষাগত সম্বন্ধ আছে। ব্রাহুই ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার লক্ষণাক্রান্ত। অনেকে আবার বলেন যে, দ্রাবিড়ীরা প্রথম হইতেই ভারতবাসী এবং ব্রাহুইরা বাণিজ্য সম্বন্ধে বা অন্য কোনো কারণে দ্রাবিড়ীদের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দ্রাবিড়ীদের সহিত ব্রাহুইদের আকারগত সাদৃশ্যও আছে।

৪। দ্রাবিড়ীগণের দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ (১)

যাহা হউক, প্রথম দলের দ্রাবিড়ীরা প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীগণের সহিত অধিক মিশ্রণের পূর্ব্বেই গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের পথে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে উপনীত হয়। গুজরাতী ও মহারাষ্ট্রী ভাষায় দ্রাবিড়ী

(১) V. Smith's Ancient History of India and Encyclopoedia Britannica.

ভাষার অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান। দ্রাবিড়ীরা দাক্ষিণাত্যে আসিয়া এখানকার বহু প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীকে বিতাড়িত করে এবং পরে তাহাদের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিতও হয়। ইহাদিগকে আদি-দ্রাবিড়ী বলা যাইতে পারে। দ্রাবিড়ীদের অবশিষ্টাংশ পঞ্চনদে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত হইয়া বসবাস করিতে থাকে। যে সকল প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীরা আদি-দ্রাবিড়ীদের সহিত মিশ্রিত হইতে ইচ্ছা করে নাই বা সুবিধা পায় নাই, তাহারা নিরাপদ্ পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। কতকগুলি আদি-দ্রাবিড়ীও মিশ্রণের সুবিধা না পাইয়া ঐরূপ করিয়াছিল, যেমন ওরাওঁ জাতি।

সম্ভবতঃ এই মিশ্রজাতির সহিতই আর্য্য জাতির সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল এবং মিশ্রজাতির লোকেরা দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছিল। দ্রাবিড়ীদের সহিত শক জাতির এবং শক ভাষার কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়া কথিত হয়। কোনো কোনো প্রত্নতত্ত্ব-বিদের মতে আদি-দ্রাবিড়ীরা শকজাতির দ্বারা দাক্ষিণাত্যে বিতাড়িত হয় এবং আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এই শক জাতিকে পরাভূত করেন। আর একশ্রেণীর পণ্ডিতদের মত এই যে, দ্রাবিড়ীরা আফ্রিকার এক কৃষ্ণবর্ণজাতি কর্ত্তৃক উত্তর ভারত হইতে বিতাড়িত হয়। যাহা হউক, অনেকের মতে আর্য্যদের সহিত আদি দ্রাবিড়ীদের কোনো সঙ্ঘর্ষ ঘটে নাই এবং আর্য্যদের দ্বারা তাহারা দাক্ষিণাত্যে বিতাড়িত হয় নাই। ঘটনাপরম্পরা হইতে অনুমান হয় যে, দাক্ষিণী দ্রাবিড়ীদের সহিত আর্য্যদের শত্রুভাব ছিল না, প্রত্যুত পরে উভয়ের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিকদের দ্বারা আদি-দ্রাবিড়ীরা

অনেক 'পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের সংস্কৃতি বা কৃষ্টি (culture) অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রথমভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমান্ত যখন আর্য্যোপনিবেশের অন্তর্ভূত ছিল না, তখন অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ মিথিলা প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্ব্ব-সীমান্ত স্থিত প্রদেশ সমূহ কোন্ জাতির অবস্থান ছিল? ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধবাসিগণের সহিত চেরদেশবাসিগণের অথবা চেরজাতির উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, আর্য্যগণ যাহাদিগকে পক্ষিজাতীয় মনুষ্য মনে করিতেন, তাহারা একই বংশসম্ভূত জাতি। মধ্যপ্রদেশের পার্ব্বত্য উপত্যকা সমূহে যে সমস্ত বর্ব্বর জাতি অত্যাবধি আপনাদিগকে চেরো বা চেরুবংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা আর্য্যবংশসম্ভূত নহে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তাহারা দ্রাবিড় জাতীয়।

দ্রাবিড়জাতি বহু প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে তাহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া থাকে। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিশারদ এচ্, আর, হল স্থির করিয়াছেন যে, এই দ্রাবিড়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন, এবং ইহারাই খৃষ্টজন্মের চারিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বাবিরুষের (Babyloniaর) সেমেটিক জাতীয় আদিম অধিবাসীগণকে পরাজিত করিয়া সুমেরীয় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুমেরীয়-গণ প্রাচীন কীলকাক্ষরের (cuneiform scriptএর) সৃষ্টিকর্ত্তা। পরে মেসোপটেমিয়াতে ক্রমান্বয়ে আসুর ও বাবিরুষ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাদের সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতার ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত। বাবিরুষের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাচীন সুমেরীয় জাতির যে সকল প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহা দেখিলে বোধ হয় যে, তাহারা সেমেটিক বা আর্য্যবংশ সম্ভূত ছিল না। হল অনুমান করেন যে, এই প্রাচীন সুমেরীয় জাতির অবয়ব ও মুখ বর্ত্তমান কালের দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড়ীগণের ন্যায়।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে মধ্য ভারতের উপত্যকাসমূহের কোনো স্থানে একটী ক্ষুদ্র গোলাকার প্রস্তর নির্ম্মিত কীলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কীলকটীর গাত্রে কতকগুলি মনুষ্য মূর্ত্তি ও কতকগুলি অক্ষর আছে। একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, ঐ অক্ষরগুলি কীলকাক্ষর (cuneiform letters) এবং কীলকটী বাবিরুষের একটী প্রাচীন মুদ্রা (cylindoical seal) এবং অনুমান দুই হাজার খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে খোদিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালে বাবিরুষে এই জাতীয় মুদ্রার (সীল মোহরের) বহু প্রচলন ছিল এবং এই জাতীয় সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রাচীন আসুরে, বাবিরুষে, এমন কি প্রাচীন মিসরে পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীন সমাধিস্থান খননকালে মৃন্ময়-শবাধারে মনুষ্যের শব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় শবাধার প্রাচীন বাবিরুষের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। (১)

এই সকল আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন বাবিরুষবাসিগণের সহিত ভারতবাসী দ্রাবিড় জাতির অতি নিকট সম্পর্ক ছিল এবং উত্তরাপথের পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিস্থানে ব্রাহুই

(১) Anderson's Catalogue and Handbook of Archeological Collections in the Indian Museum, Calcutta, Part II. P. 426.

জাতি ও তাহাদের ভাষা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হয় দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষ হইতে গিয়া মেসোপটেমিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, না হয় দ্রাবিড়ীগণ পশ্চিম এসিয়া হইতে আসিয়া বাবিরুষ অধিকার করিয়াছিল এবং পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বে একটী বৃহৎ জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল এবং তাহারাই ভারতবর্ষে দ্রাবিড় জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মগধে এবং বঙ্গে বাস করিয়াছিল, তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক পক্ষিনামে অভিহিত হইয়াছে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহারা মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। [তবে কতকগুলি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিদিগের মুখের অবয়ব দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহাদের ধমনীতে আর্য্যশোণিতও বিদ্যমান।—লেখক]

৫। দ্রাবিড়ী সভ্যতা (১)

পঞ্চনদ অধিকার করিবার পর আর্য্যেরা পূর্ব্বদিকে প্রথমে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। মধ্যদেশের নিবিড় অরণ্য দ্বারা তাঁহাদের গতি প্রতিহত হইয়াছিল। পরে তাঁহারা বন পরিষ্কার করিয়া গঙ্গা যমুনার সংগমস্থল পর্য্যন্ত বসোপযোগী করিতে

(১) V. Smith's Ancient History of India and Encyclopoedia Britannica

সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক পরিমাণে সভ্য ছিলেন, বৃহৎ বৃহৎ নদীসঙ্কুল বিস্তীর্ণ সমতলদেশের অধিকারী হইয়া ক্রমান্বয়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে থাকিলেন। তাই বলিয়া সেই সময়ের সাগরবেষ্টিত দাক্ষিণাত্য-মালভূমির অধিবাসীরা সভ্যতায় নিতান্ত হীন ছিল না। খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের যথেষ্ট সংস্কৃতি বা কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এইকালেই দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি প্রবল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যের অধিবাসীরা পশ্চিম এসিয়া ও ও মিসরের সহিত এবং গ্রীক ও রোমানদের সহিত বাণিজ্য করিত। তাহারা সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিত এবং ভারতমহাসাগরের কয়েকটী দ্বীপে ও উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। শিল্পকলায়ও তাহারা আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। মাদুরার বস্ত্রশিল্প ভারত-বিখ্যাত ছিল। তাহাদের সঙ্গীত প্রণালী আর্য্য-সঙ্গীত-প্রণালী হইতে ভিন্ন হইলেও তাহারা নিজেদের সঙ্গীত পদ্ধতির সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুশীলন করিয়া তাহাকে এমন একটী রূপ দিয়াছিল, যাহা আয়ত্ব করা সুগম নয়। গৃহনির্ম্মাণ-কলাতেও তাহারা অপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদের দেবালয়গুলি এত সুদৃঢ় ও বিশাল যে প্রত্যেকটী ছোট খাট দুর্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

৬। তামিল জাতি (১)

তামিল শব্দ দ্রাবিড় শব্দ হইতে উৎপন্ন—দ্রাবিড়, দাবিড়, দামিল, তামিল। কিন্তু দ্রাবিড় ও তামিল শব্দ একার্থ-বাচক

(১) V. Smith's Ancient History of India and Encyclopoedea Britannics.

নহে। সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমিটী দ্রাবিড় দেশ, কিন্তু তামিল দেশ দ্রাবিড় দেশের সর্ব্বদক্ষিণ অংশটী। এই অংশের ভাষাকে তামিল ভাষা বলে। মাদ্রাজের কয়েক মাইল উত্তর হইতে পূর্ব্ব উপকূলের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পুলিকাট হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম ঘাট হইতে বঙ্গোপসার পর্য্যন্ত এবং ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণভাগ লইয়া যে ভূখণ্ড, তাহাতেই তামিল ভাষা কথিত হয়। এই ভূভাগে তামিল জাতির প্রায় পনেরো লক্ষ লোকের বাস। মোটামুটি বলিতে গেলে তামিল দেশের উত্তরে তেলেগু বা অন্ধ্রদেশ। অন্ধ্রদেশ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড। এখন সেখানে হাইদ্রাবাদ করদ রাজ্য।

৭। তামিল চরিত্র (১)

তামিলেরা খর্ব্বাকৃতি এবং তাহাদের গঠনে তত বলের ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাহাদের অনেকগুলি সদ্‌গুণ আছে—তাহারা বিনয়ী, প্রিয়ম্বদ, অনাড়ম্বর, সরল, মিতব্যয়ী, কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন। তাহাদের স্মরণশক্তির ও গণিতে তীক্ষ্ণতার প্রসিদ্ধি আছে। তাহারা অনলস ও কার্য্যপ্রিয়। যেখানে উপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে, সেখানে যাইতে তাহারা পশ্চাৎপদ নহে।

তামিলেরা ধর্ম্মপরায়ণ ও ভক্তিপ্রবণ। পর্ব্বদিনে ও উৎসবকালে তাহারা ভক্তিরসে নিমজ্জিত থাকে। দলবদ্ধ হইয়া ভক্তি-

(১) V. Smith's Ancient History of India and Encyclopoedea Britannica.

রসাশ্রিত গান গাহিতে গাহিতে পথে গমনকালে তাহারা মত্ত হইয়া যায়।

তাহাদের আহরের 'প্রধান দ্রব্য ভাত—প্রায়ই জল দেওয়া ভাত। তাহারা তরকারীর বড় ধার ধারে না। লঙ্কা মরিচ ও তেঁতুল---ভাতের প্রধান উপকরণ। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দধি ও ঘোলের ব্যবহারই অধিক। গমের অভাবে চূর্ণ তণ্ডুল দ্বারা নানাপ্রকার পিষ্টক নির্ম্মিত হয়। তাহারা কদলী পত্রে "অন্নম্" খাইতে ভালবাসে। মস্তকে প্রকাণ্ড শিখা রাখিয়া পাশের চুল চারিদিকে ছোট ছোট করিয়া কাটে এবং মস্তক ও দেহ অনাবৃত রাখিয়া প্রায়ই নগ্নপদে বাটীর বাহির হয়।

৮। তামিল বর্ণমালা ও ভাষা (১)

ভারতবর্ষের অন্যান্য বর্ণমালা যেমন ব্রাহ্মী বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন, তামিল বর্ণমালাও তেমনি উহা হইতে উৎপন্ন। দ্রাবিড়-দেশের যে কয়টী বর্ণমালা দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেরই টানের একটী বিশেষত্ব আছে। ইহা উত্তর ভারতের বর্ণমালা সমূহের টান হইতে ভিন্ন। তামিল বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণের প্রত্যেক বর্গের কেবল প্রথম ও পঞ্চম বর্ণ আছে এবং মহাপ্রাণ উচ্চারণগুলি নাই। তৃতীয় বর্ণের কাজ প্রথম বর্ণের দ্বারাই হইয়া থাকে। শব্দের আদিতে প্রথম বর্ণের উচ্চারণ ব্যতীত অন্য বর্ণের উচ্চারণ নাই। বর্ণ অভ্যস্ত হইলেও এই নিয়ম। শব্দমধ্যস্থ অসংযুক্ত বর্গীয় বর্ণ গ, ড, দ, ব-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত 'দন্ত' শব্দ তামিলে

(১) Bishop Calderwood's Comparative Grammar of the Dravedean Language.

'তন্দ' এবং 'ভাগ্য' তামিলে 'পক্কিয়' হইয়া যায়। সমস্ত-পদেও এই নিয়ম রক্ষিত হয়—'কোট্টপডু' সমাসের পর 'কোট্ট বডু' হইয়া যায়। 'চ'য়ের উচ্চারণের একটু বিশেষত্ব আছে—ইহা একক থাকিলে, ইহার উচ্চারণ 'চ' ও 'শ'য়ের মধ্যবর্ত্তী। শব্দের আদিতেই থাকুক আর মধ্যেই থাকুক 'চ'য়ের উচ্চারণ 'শ'য়ের নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অভ্যস্ত হইলে সংস্কৃত 'চ্চ'য়ের ন্যায়। শব্দের আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকিতে পারে না। শ, ষ, স ও হ বর্ণ নাই। প্রথম তিনটীর কাজ 'চ'দ্বারা হয় এবং 'হ'এর কাজ অনেক সময় 'ক'য়ের দ্বারা হয়। এই বর্ণমালায় কতকগুলি বিশেষ ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, যথা মূর্দ্ধন্য 'র' ও 'ল' এবং আর একটী বর্ণ যাহার উচ্চারণ 'ল' ও 'ড়'য়ের মধ্যবর্ত্তী।

ইহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার সকল স্বরেরই উচ্চারণ আছে, অধিকন্তু হ্রস্ব একার ও হ্রস্ব ওকারও আছে। সংস্কৃত শব্দ তামিল বর্ণমালাদ্বারা লিখিতে যে সকল বর্ণের অভাব পড়ে, তাহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইলে গ্রন্থলিপির বর্ণমালার সাহায্য লওয়া হয়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ মধ্যে মধ্যে তামিল ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের আকার ও উচ্চারণের অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে, যথা 'লোক' স্থানে 'উলগ', 'রূপ' স্থানে 'উরুবম্', 'অদ্‌ভূতম্' স্থানে 'অর্পূতম্', 'ঋষি' স্থানে 'ইরুদি', 'দীর্ঘম্' স্থানে 'তির্কম্', 'রাজন্ স্থানে 'অরসেন্'।

৯। তামিল দেশে ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিক (১)

তামিল দেশের উচ্চ অঙ্গের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ পদ্ধতি

(১) Bishop Calderwood's Comparative Grammar of the Dravedean Language.

এবং সাহিত্যক সংস্কৃতি বা কৃষ্টি ঐ দেশস্থ ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিক-দিগের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। যদিও তামিল জাতির কোনো ইতিহাস ঐ ভাষায় লিপিবদ্ধ নাই, তথাপি কতকগুলি প্রাচীন তামিল কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন রাজাদের বীরত্বের ও শাসন-প্রণালীর বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে তিনটী প্রধান তামিল রাজ্য—পাণ্ড্য, চোল ও চের (কেরল)—বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে পাণ্ড্য-রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রবল ছিল, এবং উহার রাজধানী মাদুরা ছিল।

মহাভারতে পাণ্ড্যরাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের অনুশাসনেও তামিল জাতির নাম পাওয়া যায়। প্লিনী তাঁহার ভৌগলিক বিবরণেও তামিল ও তেলেগু জাতির বর্ণনা করিয়াছেন। ম্যাগাস্থিনিসের ভারত বর্ণনায় পাণ্ড্যদেশের নাম পাওয়া যায়। চোল-রাজ্যের নাম অশোকের অনুশাসনে ও চালুক্য রাজাদের অনুশাসনে পাওয়া যায়। চোলরাজ্য পূর্ব্বতীরবর্ত্তী এবং সমগ্র কাবেরী উপত্যকার উত্তরাংশ, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী প্রদেশ-ব্যাপী ছিল। উহার রাজধানী ত্রিচিনপল্লী ছিল। ঐ রাজ্যে পুগার ও কাঞ্চী নামক দুইটী বড় নগর ছিল। করোমণ্ডল শব্দটী চোলমণ্ডল শব্দের অপভ্রংশ। চের বা কেরল-রাজ্যের নাম হরিবংশে ও অনেকগুলি পুরাণে পাওয়া যায়। এই রাজ্য কালিকাটের দক্ষিণে। ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত সমগ্র মালাবার উপকূল এবং কোইম্বাটুর, সালেম ও মহীশূরের দক্ষিণ ভাগ লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল। এই রাজ্যে পূর্ব্বে তামিল ভাষাই প্রচলিত ছিল; তখন মালয়ালম ভাষা তামিল ভাষা হইতে পৃথক্ হয়

নাই। মালাবার শব্দ সংস্কৃত মলয়বার (মলয় দেশ) শব্দ হইতে উৎপন্ন।

১০। তামিল ভাষার অন্যান্য ভাষার সহিত সম্বন্ধ (১)

তামিল, মালয়ালম, কন্নাদ (ক্যানারীজ), তেলেগু, তুলু, কুড়গু (কুর্গ), তোড়া, গোন্দ, খোন্দ, ওরাওঁ, রাজমহালী, কৈকাদী এবং ব্রাহুই—এই ভাষাগুলিকে দ্রাবিড়ী ভাষা বলে। তামিল ভাষাই সর্ব্বপ্রাচীন, শব্দ সম্পদে পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ। অন্যান্য দ্রাবিড়ী ভাষাপেক্ষা ইহাতে সংস্কৃত শব্দের অনুপাত অনেক কম। সব দ্রাবিড়ী ভাষাগুলিই প্রত্যয়-সংযোগী (suffix-agglunating)। মুণ্ডারী, হো, সান্তালী ইত্যাদি কোল-ভাষা; তুর্কী, মোঙ্গোল, বুরিয়াত, তুঙ্গুস, মাঞ্চু ইত্যাদি য়ুরল-আল্তাই-ভাষা; হাঙ্গেরীয় ও ফিনিস ভাষা এবং জাপানী ভাষা এই শ্রেণীর। এই শ্রেণীর ভাষায় ধাতুর সহিত ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধসূচক এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-সূচক প্রত্যয় মিলিত হইয়া শব্দ নির্ম্মিত হয়, এবং শব্দের প্রত্যেক অংশ ধাতু হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি আর্য্য ভাষায় প্রত্যয়গুলি ধাতুর 'অঙ্গের' সহিত এরূপে সংযুক্ত হইয়া যায় যে, তাহাদিগকে পৃথক করা অনেক সময় কঠিন হয়, এবং পূর্ব্বে উহাদের কিরূপ আকার ছিল তাহাও নির্ণয় করা যায় না। এই সকল ভাষাকে পূর্ণসংযোগী (inflexional) ভাষা বলে। দ্রাবিড়ী ভাষাগুলি পূর্ণসংযোগী নয়। কিন্তু সংস্কৃতের ন্যায় বিভক্তি-প্রধান।

(১) Tucker's Introduction to the Natural History of Language.

১১। তামিল ভাষায় মূর্দ্ধন্য বর্ণের প্রাধান্য (১)

সমস্ত দ্রাবিড়ী ভাষায়, বিশেষতঃ তামিলে, মূর্দ্ধন্য বর্ণের অতিশয় প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যে কয়টী মূর্দ্ধন্য বর্ণ আছে তাহা তো ইহাতে আছেই, প্রত্যুত অতিরিক্ত কয়েকটী মূর্দ্ধন্য বর্ণ তামিল ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল মূর্দ্ধন্য 'ষ' টী ইহাতে নাই, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু মূর্দ্ধন্য 'র' ও 'ল' এবং 'ড়' আছে। মূর্দ্ধন্য বর্ণগুলি সংস্কৃত ভাষায় কোথা হইতে আসিল? গ্রীক, পারস্য ইত্যাদি অন্যান্য আর্য্য-ভাষায় তো মূর্দ্ধন্য বর্ণ নাই। য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, দ্রাবিড়ীদের সংস্পর্শে আসিয়া সিন্ধু নদ পার হওয়ার পূর্ব্বেই ভারতীয় আর্য্যদের ভাষায় এই সকল উচ্চারণ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ তাতার ও ফিনিস ভাষার একটী বিশেষত্ব। ইহাদের সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার উচ্চারণ-গত সম্বন্ধ আছে। লাপলাণ্ডের ও আইস্‌লণ্ডের ভাষায় এবং (যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয় হয়) ইংরাজী ভাষার উচ্চারণেও মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ লক্ষিত হয়।

১২। তামিল সাহিত্যের গৌরবের সময় (২)

এখন হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে মহানদী, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর উপত্যকাগুলি মগধ সাম্রাজ্যের

(১) Bishop Calderwoods Comparative Grammar of the Dravidian Languages,

(২) V. Smith's Ancient History of India.

অন্তর্গত ছিল এবং উহাদের দক্ষিণভাগ তামিল-দেশ-সংলগ্ন ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের তখন অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এবং অনার্য্য জাতিরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়টী ব্রাহ্মণদের বড়ই অগৌরবের সময় ছিল। ব্রাহ্মণগণ আপনাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। অতএব খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে সংস্কৃত সাহিত্যের অতি অল্প গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী রাজাদের সহায়তা পাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। গুপ্ত-রাজাদের সময় সংস্কৃত সাহিত্য পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। সংস্কৃত ভাষায় নানা বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। এই সময় পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল এবং অনেক কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচিত হইয়াছিল।

যে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অশেষ দুর্গতি, সেই সময়টী তামিল সাহিত্যের বিশেষ গৌরবের সময়। এই সময়ে তামিল ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীন তামিল গ্রন্থ হইতে শুধু যে তামিল জাতিরই বিবরণ পাওয়া যায় এমন নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ বহুদিন যাবৎ নিভৃত অন্ধকারে অবস্থান করিয়া রুদ্ধশ্বাস হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে আলোক ও বাতাসে আনীত হইয়া তাহাদের পুনর্জ্জীবন লাভ হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি অতি প্রাচীন তামিল ভাষায় লিখিত বলিয়া এবং ইহাদের মধ্যে বিজাতীয় ধর্ম্মের পোষকতা আছে বলিয়া তামিল অনুসন্ধানকারীদের নিকট আকর্ষক বলিয়া বোধ হয় নাই। এতদিন শৈব ও বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা তাঁহাদের ছাত্র-

দের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ স্পর্শ করা পাপ বলিয়া শিক্ষা দিতেন। শৈব ও বৈষ্ণব মঠের পুস্তকাগার মধ্যে থাকিয়া এই গ্রন্থ-সমূহ ধূলি রাশিতে পরিণত হইত। কেবল কতকগুলি উৎসাহী বিদ্বানের যত্নে ইহাদিগকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, এবং অনেক-গুলিকে মুদ্রিত করাও হইয়াছে।

১৩। তামিল সাহিত্যের প্রাচীনত্ব (১)

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লিখিত কোনো তামিল সাহিত্য নাই। এ ধারণা নিতান্ত অমূলক। তামিল সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজী নবম শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য মনো-যোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কতকগুলি গ্রন্থ খৃষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং ঐ প্রাচীন কালেই তামিল জাতি সমৃদ্ধ ও উচ্চ সভ্যতায় উপনীত হইয়াছিল। আরব, গ্রীক্ ও রোমান জাতির এবং যব-দ্বীপ-বাসীদের সহিত তাহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রচনা-প্রবৃত্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীকেই তামিল সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই পাণ্ড্যরাজা উগ্রের সময় মাদুরাতে তামিল কবিদের শেষ সঙ্ঘ বা পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। এই কালের অন্ততঃ পঞ্চাশ জন কবির গ্রন্থাবলী এখন হস্তগত হইয়াছে। এই কবিরা বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী

(১) V. Smith's Ancient History of India

এবং তামিল দেশের বিভিন্ন অংশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিগ্রন্থ, কেহ কেহ বৌদ্ধ এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং কবি-সংখ্যা মধ্যে রাজা, ধর্ম্মযাজক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, কৃষক ও শিল্পোপজীবী ছিলেন। এই সকল কাব্য পাঠে জানা যায় যে, তামিল দেশে সে সময়ে বৌদ্ধেরা ও ও জৈনেরা প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত তাহারা বুদ্ধের বা তীর্থঙ্কর-দের মূর্ত্তি স্থাপনা করে নাই। শিব, বিষ্ণু ও সুব্রহ্মণ্যের মন্দির ব্যতীত ইন্দ্র ও বলদেবের মন্দিরও ছিল। সে সময়ে তামিল দেশে ব্রাহ্মণ ছিল এবং তাহারা আপনাদিগকে দ্বিজ বলিত, কিন্তু রাজারা বা বণিক্‌রা দ্বিজ নামের প্রয়াসী ছিল না। তামিল দেশের অধিকাংশ লোক প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে বাস করিত বটে, কিন্তু উহার অংশ বিশেষে অনেকে গোপাল ও মেষপালের কার্য্য করিত এবং নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহ-বিহীন ছিল।

প্রাচীন তামিল কাব্য সমূহ হইতে প্রাপ্ত উপরি-উক্ত বিবরণের সহিত প্লিনী ও টলেমী লিখিত ভৌগলিক বিবরণের এবং পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থোক্ত বিবরণের মিল আছে। ইহা হইতে ঐ সকল গ্রন্থের প্রাচীনতার অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ৭৯খৃষ্টাব্দে প্লিনীর মৃত্যু হয়। পেরিপ্লাস ৮০ হইতে ৮৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ১৬৩ খৃষ্টাব্দে টলেমীর মৃত্যু হয়। টলেমী স্বকীয় গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের যে সকল বন্দরের সূচী দিয়াছেন, তাহাদের উল্লেখ প্রাচীন তামিল কাব্যগ্রন্থে আছে। কয়েকখানি পুরাণে, দীপবংশে ও মহাবংশে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার সহিত তামিল কাব্যবর্ণিত রাজাদের রাজত্বকালের সামঞ্জস্য আছে। পুরাণগুলি খুব সম্ভবতঃ গুপ্তবংশের রাজাদের সময় সংগৃহীত হইয়াছিল। মহাবংশ খৃষ্টীয়

পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল এবং দীপবংশ তাহারও পূর্ব্বে।

১৪। প্রাচীন তামিল সাহিত্য অনুসারে তামিল দেশের আদি অধিবাসী (১)

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে প্রাচীনকালের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিল্বর ও মিনবর এই দুইটী জাতিই তামিল দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী। বিল্ববরেরা (ধনুর্দ্ধর), পার্ব্বত্য প্রদেশে ও জঙ্গলে বাস করিত এবং ব্যাধবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিত, এবং মিনবরেরা (মৎস্যজীবী), উপত্যকা ও সমতলভূমিতে বা সমুদ্রতীরে বাস করিত এবং মৎস্য মারিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই দুইটী জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের ন্যায় মনুষ্য এখনও অনেক পরিমাণে রাজপুতানায় ও গুজরাটে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের আধুনিক নাম ভীল এবং মীনা।

১৫। পরবর্ত্তী নাগজাতি (১)

এই অসভ্য বর্ব্বরেরা নাগ জাতি দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। নাগদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল এবং তাহারা অনেক পরিমাণে সভ্য ছিল। তাহারা কোনো না কোনো সময়ে ভারতবর্ষের, সিংহলের ও ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ স্থানে রাজত্ব করিত। রামায়ণ ও মহাভারতে নাগদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। রামায়ণ হইতে

(১) V. Kanaksabhai.

জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের মধ্য-স্থলে নাগদের রাজধানী ছিল। মহাভারতে যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে খৃষ্টজন্মের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বের অনেকগুলি নাগরাজ্যের উল্লেখ আছে। যে স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই স্থানের নাগদিগকে বিতাড়িত করিতে হইয়াছিল। জন্মেজয় নাগ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন অর্থাৎ নাগদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। জরৎকারুমুনি নাগ-কন্যা মনসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক সময়ে খৃষ্টের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী শূদ্র বা নাগবংশ মগধে রাজত্ব করিয়াছিল। সিংহল দেশের ইতিহাসে প্রথমেই নাগবংশের বিবরণ আছে এবং সিংহলের আর একটী নাম নাগদ্বীপ। প্রাচীন সৌধে বা মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ মনুষ্য-মূর্ত্তির পৃষ্ঠদেশে সাপের ফণার আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তামিল কাব্যে নাগেরা অর্দ্ধ-মনুষ্য ও অর্দ্ধ-সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল তামিলেরা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল, তাহারা বলিত যে, নাগশাসিত রাজ্য সমূহ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন রাজ্যের কথা তাহাদের স্মরণ হয় না। এখনও নাগপুর ও ছোট নাগপুর এই নাম দুইটী ভারতবর্ষে নাগ জাতির প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চোল রাজবংশে নাগ-কন্যার বিবাহের কথা শুনা যায়।

নাগ জাতির কয়েকটী শাখা ছিল, যথা মারবার, এইনর, ওলিয়র, অরুবালুর এবং পরথবর। ইহাদের মধ্যে মারবারেরাই অধিক বলবান ও প্রতাপান্বিত ছিল। তাহারা তামিল রাজাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। নাগেরা তামিল রাজাদের সৈন্যে অনেক-সংখ্যায় প্রবেশ করিত এবং কখনো কখনো

সৈন্যাধ্যক্ষের পদেও উন্নীত হইত। তাহারা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীও হইত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে চোল রাজ্যের সাময়িক অধঃপতনের সময় নাগেরা চোলরাজ্যের রাজা হইয়াছিল। নাগেরা বয়নবিদ্যায় অত্যন্ত পরেদর্শী ছিল। কনকসভাই বলেন যে, আর্য্যেরা নাগদের নিকট লিপিবিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং এইজন্য সংস্কৃত বর্ণমালার নাম দেবনাগরী।

১৬। তামিল জাতির দাক্ষিণাত্যে আগমন (১)

যখন আর্য্যেরা প্রথমে কাবুল উপত্যকা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন একদল মোঙ্গোল জাতীয় পীতবর্ণ মনুষ্য উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তখন গঙ্গার উপত্যকা কৃষ্ণবর্ণ নাগ জাতি দ্বারা অধিকৃত ছিল। এই নূতন জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়। এই জাতি বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তি হইতে নৌকাযোগে দাক্ষিণাত্যে গিয়া উহা অধিকার করে, এই জন্যই এই জাতির নাম তামিল। তাম্মলিত্তি কথাটী সংক্ষিপ্ত হইয়া তামিল হইয়াছে (কনকসভাই)। অনেক প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায় এবং ঐ সকলে উহার নাম দামলিপ্তি, অর্থাৎ দামল জাতির একটী প্রধান নগর। বাঙ্গলায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়।

যে সকল মোঙ্গোলীয় উপজাতি দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করিয়া নাগদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, তন্মধ্যে মারবারেরাই সর্ব্বপ্রাচীন।

---

(১) V. Kanaksabhai

তাহারা পলয়ন (প্রাচীন) নামে অভিহিত হইত। তাহাদের রাজধানী কুমারিকা অন্তরীপের নিকট পোথীয় পর্ব্বতে ছিল। পাণ্ড্য-রাজারা মারণ বংশজ বলিয়া শ্লাঘা করিতেন। মারণ শব্দও মারন্মর শব্দ একই বলিয়া বোধ হয়। মারন্মরেরা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ জয় করিয়াছিল।

থেরিয়র নামক জাতি বঙ্গদেশবাসী ও নৌসাধন ছিল। তাহারা নিম্ন বঙ্গ হইতে সমুদ্রপথে ব্রহ্ম, কোচিন-চায়না, সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিল। এই বংশের থিরয়ণ নামক কাঞ্চীর রাজা, বিষ্ণুকে তাহার পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। প্রথম শতাব্দীর তামিল কাব্যোক্ত সর্ব্বপ্রাচীন চোল রাজার নাম মুচুকুন্ত।

আর একটী তামিল উপজাতির নাম 'বনবর' বা স্বর্গীয়। তাহারা বঙ্গদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী ছিল। তাহারা দক্ষিণ ভারতে আসিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে, যথা—সালেম প্রদেশের কোল্লী পর্ব্বতে, পশ্চিম ঘাটে ও নীলগিরিতে বাস করিয়াছিল। চের চেন-কুদ্দুবন নামক একজন চের-রাজা সিংহল-রাজ প্রথম গজবাহুর এবং মগধ-সম্রাটদের সমসাময়িক ছিল। কর্ণবংশীয়েরা খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মগধরাজ্য শাসন করিয়াছিল এবং ত্রিকলিঙ্গের অধীশ্বর ছিল।

তিনটী তামিল উপজাতি—মারন্মর, থিরয়র ও বনবর—দ্বারাই পাণ্ড্য, চোল ও চের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনে এই তিন রাজ্যের উল্লেখ আছে।

তামিল উপজাতি-সমূহ-মধ্যে কোশর উপজাতিই দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক আগন্তুক। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে তাহারা মারণ-পলয়ন রাজ্যের রাজধানী মোহুর অধিকার করিবার

চেষ্টায় মৌর্য্যদের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে তাহারা কোঙ্গো (কোইম্বাটোর) অধিকার করে। অতএব দাক্ষিণাত্যে তাহাদের বসবাস খৃঃ পূর্ব্বে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে হইয়াছিল। তাহারা বীর যোদ্ধা বলিয়া কথিত হয় এবং পাণ্ড্য রাজাদের সম্মানিত প্রজা বলিয়া গণ্য হইত। কোশরেরা সম্ভবতঃ কুশান বংশীয়।

তামিল আগন্তুকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যাও নাগদের ও দ্রাবিড়ীদের সংখ্যাপেক্ষা অনেক কম ছিল বলিয়া, তাহারা পুরাতন দ্রাবিড়ী ভাষাই গ্রহণ করিয়াছিল এবং কালক্রমে তাহারা ইহার পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়া লইয়া ইহাকে তামিল ভাষায় পরিণত করিয়াছিল। তামিল (ও মালায়ালম) ভাষার (rzha) বর্ণটী অন্য কোনো দ্রাবিড়ী ভাষায় বা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। এই বর্ণটী কতকগুলি তিব্বতীয় ভাষায় পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, তামিলেরা তিব্বত মালভূমির লোক। তাহারা যে আর্য্যবংশ-সম্ভূত নয় তাহা তাহাদের আর্য্য-বিদ্বেষ হইতে এবং সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে তাহারা বিদেশীয় বলিয়া উল্লিখিত হওয়াতে, বোঝা যায়।

১৭। তামিল ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ

তামিল ভাষার ভাবসমূহ ও শব্দসম্পদ এত প্রচুর যে, শুদ্ধ তামিল সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদের পদার্পণের পূর্ব্বেই তামিলেরা উচ্চ সভ্যতায় আরোহণ করিয়াছিল।

সঙ্গীতের, ব্যাকরণের, জ্যোতিষের, এমন কি দর্শন শাস্ত্রের অবচ্ছিন্ন শব্দগুলিও তামিল ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আর্য্যদের দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্ব্বেই এই সকল বিজ্ঞান তামিল দেশে অনুশীলিত হইয়াছিল। তামিল ভাষায় ঙ্গ, ঞ্জ, ন্ন ইত্যাদি সানুনাসিক বর্ণের প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা তাহাদের ব্রহ্মবাসী ও চীনবাসীদের সহিত সম্বন্ধ সূচিত করে। মালয়ালম অর্থাৎ প্রাথমিক তামিল ভাষায় সানুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া অনুমান হয় যে, তামিলেরা তখনও দ্রাবিড়ী ভাষায় পরিপক্ক হয় নাই। পরে দ্রাবিড়ী ভাষার সংমিশ্রণে তামিল ভাষা মালয়ালম ভাষা হইতে পৃথক্ হইয়া গেল। প্রাচীন মালয়ালমের সহিত মোঙ্গোলীয় ও মাঞ্চু ইত্যাদি ভাষার সাদৃশ্য আছে।

১৮। অগস্ত্য ঋষি (১)

তামিল কবিরা অগস্ত্যঋষি ও তাঁহার সহিত একদল আর্য্য ঔপনিবেশিকের দাক্ষিণাত্যে আগমনের কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিতেন। নাসিকের নিকট অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, রামায়ণের কালে অগস্ত্য গোদাবরী নদীর দক্ষিণে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যে ভূভাগে আজকাল মহারাষ্ট্র দেশ অবস্থিত, তখন তাহা দণ্ডকারণ্য দ্বারা অধিকৃত ছিল। ইহা রাক্ষস বা বন্যজাতি-সঙ্কুল নিবিড় বন ছিল। ইহারই পর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যে ভূখণ্ড, তাহার নাম ছিল জনস্থান, অর্থাৎ সভ্য মনুষ্য কর্তৃক অধ্যুষিত স্থান বা দেশ। রামকে জনস্থানে, অর্থাৎ অন্ধ্র, চের, চোল ও পাণ্ড্য দেশে, সীতার অন্বেষণে

(১) V. Kanaksabhai

যাইতে বলা হইয়াছিল। অতএব রামায়ণ রচনার সময়েও ঐ সকল দেশ জ্ঞাত ছিল। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত কাত্যায়নের 'পাণিনি' বার্ত্তিকেও পাণ্ড্যদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯। পাণ্ড্যরাজ্যের উৎপত্তি (১)

অতএব খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে পাণ্ড্যরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কে এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, অর্জ্জুন পাণ্ড্যরাজ মলয়ধ্বজের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রচলিত মহাভারতে এ গল্প নাই। অতএব ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য বিবরণে—যথা ম্যাগ্যাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া যায় যে, এই রাজ্য এক রাজকন্যা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্লিনী বলেন যে, হার্কুলিসের কন্যা পাণ্ডী এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত্রী। প্রাচীন তামিল কাব্য-সাহিত্যেও বলা হইযাছে যে, একজন স্ত্রীলোক দ্বারাই এই রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। চিলপ্পদিকারম্ গ্রন্থে তাঁহাকে মথুরাপথি (মথুরাপতি) বলা হইয়াছে। সেই রমণীর কোনো মারন-বংশীয় রাজার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। পাণ্ডু-রমণী দ্বারা স্থাপিত বলিয়া এই রাজ্যের নাম পাণ্ড্য। যদিও পাণ্ড্যবংশীয় তামিল রাজারা আপনাদিগকে পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া ঘোষণা করিত, তথাপি তাহারা আপনাদিগকে তামিল ছাড়া আর্য্য বলিত না।

(১) V. Kanaksabhai

২০। তামিল দেশে আর্য্য প্রভাব (১)

আর্য্যেরা শস্ত্রবলে তামিল দেশে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা শান্তভাবে এদেশে বসবাস করিতে আসিয়াছিলেন। পোথীয় পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অনেক ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, এইস্থানে অগস্ত্য ঋষি বাস করিতেন। তামিল রাজ্যের অনেক গ্রামে ও নগরে বহু ব্রাহ্মণের বাস।

আয়র জাতির লোকেরা গোপ। আ শব্দের অর্থ গো। পুরাণে ইহারা আভীর বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহারা বলে যে, পাণ্ড্যরাজ্যের স্থাপয়িতার সহিত তাহারা তামিল দেশে আসিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণের উপাসক।

২১। তামিল সামাজিক জীবন (১)

পাণ্ড্য, চোল ও চের বংশীয় রাজারা ও তাহাদের অধীনস্থ প্রধানেরা সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিত। এরূপ অশান্তির সময় শান্তিসুলভ সাহিত্য, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদির বিকাশ কিরূপে হইয়াছিল? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, সে সময়ে কেবল যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরাই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত। অন্যেরা প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে থাকিয়া নির্ব্বিরোধে স্ব স্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিত। যে সকল দরিদ্র লোক গ্রামে বাস করিত, তাহাদের উপর উপদ্রব হইত না। ব্যবসায়ীরা পণ্য লইয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে দলবদ্ধ হইয়া যাইত। তখন রাজ-সৈনিকেরা তাহাদিগকে রক্ষা করিত।

(১) V. Kanaksabhai

২২। তামিল রাজতন্ত্র (১)

বংশানুক্রমিক রাজারাই শাসনতন্ত্রের অধিনায়ক ছিল। কিন্তু তাহাদের ক্ষমতার যথেচ্ছ চালনা প্রতিরোধ করিবার জন্য পাঁচটী পরিষদ্ ছিল। দেশের প্রতিনিধি, ধর্ম্মযাজক, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, জ্যোতিষী এবং মন্ত্রীগণ দ্বারা এই সকল পরিষদ্ গঠিত হইত। এক একটী পরিষদের হস্তে এক একটী কার্য্যের ভার থাকিত। প্রতিনিধি নির্ম্মিত পরিষদ্ জনসাধারণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিত। ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মোৎসব ইত্যাদির পরিচালনা করিত। চিকিৎসকেরা রাজা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিত। জ্যোতিষীরা সাধারণ উৎসবের লগ্ন নির্ণয় করিত। এবং মন্ত্রীরা কর সংগ্রহ ও ব্যয়ের পরিদর্শনে এবং বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অধিক প্রয়োজনের সময় পাঁচটী পরিষদই রাজসভায় একত্রিত হইত। রাজ্যশাসন, রাজা ও তাঁহার পাঁচটী পরিষদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত ছিল। পাণ্ড্য, চোল ও চের—এই তিনটি রাজ্যে একই নিয়ম ছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনটীরই আদি রাজা মগধরাজ্য হইতে এখানে আসিয়াছিলেন।

২৩। তামিল রাজা (১)

রাজ-শরীর বহু সাজসজ্জায় এবং গৌরবে পরিবৃত থাকিত। রাজা অনেক পরিচারক দ্বারা সেবিত হইতেন—গন্ধদ্রব্য-বাহক, মালাকর, তাম্বুল-বাহক, পরিচ্ছদ-রক্ষক, আলোক-প্রদর্শক ও শরীর-রক্ষক।

---

(১) V. Kanaksabhai

রাজ-মস্তক সূচ্যাকার রত্ন-জড়িত রাজমুকুট দ্বারা শোভিত হইত। রাজা মণিবন্ধদ্বয়ে স্বর্ণ বলয়, দক্ষিণ পদে স্বর্ণবেষ্টনী (মল) এবং গলায় মুক্তাহার বা রত্নহার পরিধান করিতেন। যখন তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিতেন তখন তাঁহার মস্তকোপরি মুক্তার ঝালর যুক্ত ছত্র ধারণ করা হইত। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে বা ঘোটকোপরি বা রথমধ্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে দামামা নিনাদিত হইত। সময়-নিরূপক ঘটিকা যন্ত্র দ্বারা সময় ঘোষকেরা প্রত্যেক নালিকারই উত্তীর্ণ হওয়া ঘোষণা করিত।

রাজপ্রাসাদের এক অংশ রাণীর ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। রাণীর রাজমুকুট পরিবার অধিকার ছিল না। তবে উত্তরাধিকার স্বত্বে যদি তিনি রাণী হইতেন, তাহা হইলে রাজমুকুটে তাঁহার অধিকার থাকিত।

২৪। তামিল রাজকর্ম্মচারী (১)

প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে ছিলেন—প্রধান পুরোহিত, প্রধান জ্যোতিষী, মন্ত্রীগণ এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ। অপরাধীদের বিচারের এবং স্বত্বের বিচারের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারী থাকিত। কিন্তু সকল ব্যবহার-কার্য্যে (মামলাতে) রাজাই চরম বিচারক ছিলেন। প্রধান বিচারকের মস্তকে এক প্রকারের বিশেষ বেষ্টন থাকিত। বিচারের জন্য অর্থীদের নিকট হইতে কোনো অর্থ গৃহীত হইত না

---

(১) .V. Kanaksabhai

২৫। তামিল দণ্ড প্রণালী (১)

কিন্তু শাস্তি অতি কঠোর ছিল ; সেই কারণে অপরাধের সংখ্যা কম ছিল। প্রত্যক্ষ ধরা পড়িলে চোরের শিরশ্ছেদ হইত। কোনো লোক ব্যভিচার করিতেছে, এমন অবস্থায় ধরা পড়িলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইত। ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য পাদদ্বয় খণ্ডিত হইত। কুসংস্কারমূলক ভয় হেতুও রাজা কঠোর শাস্তি দিতে প্ররোচিত হইতেন। ঢেঁড়া দিয়া রাজপুরুষেরা রাজাজ্ঞা প্রচার কবিত।

২৬। তামিল রাজকর (১)

শুল্ক ও কর রাজার আয়ের মূল ভিত্তি ছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর হইতে মালের উপর শুল্ক আদায় হইত। মাল বন্দরে নামিতেই তাহার উপর রাজ-নামাঙ্কিত মোহর লাগান হইত এবং শুল্ক দিলে মালের ছাড় দেওযা হইত। বড় বড় রাজপথে এবং সীমান্ত প্রদেশেও মালের উপর শুল্ক আদায় হইত। রাজকর নগদ টাকায় অথবা শস্যের দ্বারা প্রদত্ত হইত। সামন্ত রাজারা ও প্রধানেরা যে কর দিত, তাহা হইতে এবং রাজার খাস অধিকারের বিষয় হইতে, যথা—মুক্তা-উত্তোলন, বন্য হস্তী ধরিয়া বিক্রয়, বনবিভাগের বস্তু সমূহের বিক্রয়—হইতে রাজার যথেষ্ট আয় হইত। ভূমির আয়ের ষষ্ঠ অংশের উপর রাজার ন্যায্য দাবী ছিল। জল সরবরাহের জন্যও চাষারা রাজাকে কর দিত।

---

(১) V. Kanaksabhai

২৭। তামিল সমাজের নেতা (১)

রাজা সমাজের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি শরীররক্ষক দ্বারা বেষ্টিত হইয়া প্রজাদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। রাজধানীতে তিনিই উৎসব ইত্যাদির নেতা হইতেন, এবং দুর্ভিক্ষ্যের বা মড়কের সময় তিনিই প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যে অগ্রণী হইতেন। তিনি প্রজাদের সুখ দুঃখের ভাগ লইতেন অথবা রাজসৌজন্য দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এরূপ করিতে বাধ্য হইতে হইত। রাজার প্রতি প্রজাদের যথেষ্ট ভক্তি ছিল। উৎসবের সময় সাধারণ দেবমন্দিরে রাজার জন্য প্রার্থনা করা হইত।

২৮। তামিল জাতি-বিভাগ (১)

তামিলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এরূপ জাতি-বিভাগ ছিল না। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে দ্বিজ শব্দ ব্রাহ্মণদের জন্যই প্রয়োগ করা হইত। বিশুদ্ধ তামিলদের মধ্যে আরিবর (ঋষি) শ্রেণীর ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ত্রিকালজ্ঞ বলিতেন। তাঁহারা নগরের বাহিরে নির্জ্জনে ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতেন।

ইহাদের নীচেই উলবর বা কৃষকশ্রেণী। সমাজে তাহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত। তাহারাই দেশের ভূম্যধিকারী অভিজাত বংশ। তাহাদিগকে বেল্লাল (প্লাবনপতি) বা করলার (মেঘপতি)ও বলা হইত। চের, চোল ও পাণ্ড্য বংশের রাজারা

(১) V. Kanaksabhai.

ও অধিকাংশ প্রধানেরা বেল্লাল বংশীয়। ইহারা কখনো কখনো গঙ্গা বংশীয় নামেও অভিহিত হইত।

আইয়ার (মেষপাল) এবং বেদ্দুবার (ব্যাধ) সম্প্রদায় উলবর সম্প্রদায়ের ঠিক পরবর্ত্তী। তাহাদের নীচে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার ইত্যাদি। যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা তৎপরবর্ত্তী। বালায়ার (মৎসজীবী) ও পুলায়ার (মেথর) এই দুই জাতির স্থান সর্ব্ব নিম্নে।

উচ্চজাতীয় ব্যক্তিদের পথ দিয়া গমন কালে, নিম্ন জাতীয় লোকেরা একপাশে সরিয়া দাঁড়াইত এবং মেথরেরা দণ্ডবৎ করিত। তামিল দেশের একটী বিশেষত্ব এই যে, সেখানে দাসত্ব প্রথা সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। ইহা তামিলদের উচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক।

উপরি উক্ত জাতি বিভাগ ম্যাগাস্থিনিস বর্ণিত মগধের জাতি বিভাগের অনেক পরিমাণে অনুরূপ। যে কাল সম্বন্ধে উপরি উক্ত বর্ণনা লিখিত হইল, অন্ততঃ তাহার ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণেরা তামিল্ দেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উত্তর ভারতের জাতিবিভাগ তামিল দেশে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তামিলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি না থাকায়, কৃতকার্য্য হন নাই। এখনও বেল্লালেরা পদৈয়দচিদের (যাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলে তাহাদের) বাটীতে জলগ্রহণ করে না।

২৯। তামিল পরিচ্ছদ (১)

সমাজে যাহারা যে স্তরের লোক তাহারা তদনুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান করিত। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ কার্পাস

(১) V. Kanaksabhai

বস্ত্রের জোড় (ধুতি চাদর) ব্যবহার করিত। ধুতিখানি হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িত এবং দোবজাখানি মাথায় জড়ান হইত। তাহারা মাথার চুল কাটিতনা এবং উহা জড়াইয়া মাথার উপর বা একপাশে বাঁধিয়া রখিত। ব্রাহ্মণেরা মোটা শিখা রাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিতেন। সৈনিক ও চৌকীদারেরা এক প্রকার কোট পরিত। কেবল সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই পরিচ্ছদ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিত। যে পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহাব কবিলে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, উচ্চবংশীয়েরা কেবল তাহাই ব্যবহার করিতেন।

৩০। তামিল রমণীদের বেশভূষা (১)

তামিল রমণীদের কেবল কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত অংশ বস্ত্রদ্বারা ঢাকা পড়িত। অন্যান্য অংশ অনাবৃত ও চন্দনলিপ্ত থাকিত। নাগা স্ত্রীলোকেরা প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিত। বার-বনিতারা কেবল কটি হইতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আবৃত করিত। তাহাতে তাহাদের শরীরের ঐ অংশ ভাল করিয়া ঢাকা পড়িত না। পার্ব্বত্য রমণীরা কোমরের চারিদিকে হরিত পত্রগুচ্ছ বাঁধিত। ভ্রমণকারী গায়কদের সঙ্গে যে সকল স্ত্রীলোক বেড়াইত, তাহারা সম্পূর্ণ নগ্ন থাকিত। মোটের উপর প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতে নগ্নতা অধিক লজ্জার বিষয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তামিল রমণীরা চুলের খুব পাট করিত। চুল পাঁচভাগে ভাগ করিয়া পাঁচটী গুচ্ছ বিশেষভাবে বিন্যস্ত করিয়া তাহা দ্বারা মস্তক শোভিত করিত। ব্রহ্মদেশে এই প্রথা এখনো দেখিতে

(১) V. Kanaksabhai.

পাওয়া যায়। আর্য্য রমণীরা এরূপ করিতেন না এবং তামিল দেশেও ইহা এখন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেরা কেশে তৈল লেপন করিত। স্ত্রীলোকেরা চুল বাঁধিবার সময় উহাতে গন্ধদ্রব্য লাগাইত এবং পুষ্পগুচ্ছ বা অলঙ্কার দ্বারা কবরীর শোভা বর্দ্ধন করিত।

স্ত্রী ও পুরুষেরা দেহে নানা প্রকারের গন্ধ তৈল মর্দ্দন করিত এবং নানা বর্ণের চূর্ণ দ্বারা উহা শোভিত করিত। স্ত্রীলোকেরা চক্ষে কাজল পরিত। উচ্চশ্রেণীর লোকদের বাটীতে ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুল্, লবান প্রভৃতি পোড়ান হইত। বস্ত্রের স্বল্পতা সত্ত্বেও কণ্ঠে, বাহুতে এবং কটিদেশে নানা প্রকারের অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়া দেহের শোভা বর্দ্ধন করা হইত। অভিজাতেরা বা ধনবান সর্দ্দারেরা কণ্ঠে মণিমুক্তাময় হার ও মণিবন্ধে ভারি ভারি স্বর্ণ বলয় ব্যবহার করিত। রাজবংশ-সম্ভূত ব্যক্তিরা এতদ্ব্যতীত এক পায়ে একগাছি সোণার মল পরিত।

নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা হস্তে শাঁখা এবং গলায় পলা বা পুঁতির মালা পরিত। দক্ষিণ ভারতে তখন রূপা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া সোণার ব্যবহার অধিক পরিমাণে হইত। অভিনেত্রীরা খুব সৌখিন অলঙ্কার ব্যবহার করিত এবং পরিপাটী করিয়া সজ্জিত হইত।

৩১। তামিল স্ত্রী-স্বাধীনতা (১)

স্ত্রীলোকেরা অবাধে অথচ স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ত্যাগ না করিয়া

(১) V. Kanaksabhai.

সমাজে মিশিতে পারিত। বড় বড় নগরে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা ফেরি করিয়া দ্রব্যাদি বেচিয়া বেড়াইত, দোকানে বসিয়া কেনা বেচা করিত এবং সম্পন্ন গৃহস্থদের বাটীতে দাসীর কার্য্য করিত। গ্রামে তাহারা পুরুষদের সহিত ক্ষেতের ও বাগানের কাজ করিত, এবং পুরুষদের ক্লেশের ভাগ লইত। বড় ঘরের মহিলারা অনেক সময় গৃহেই আবদ্ধ থাকিত কিন্তু তাই বলিয়া সমাজে তাহাদের গতিবিধি ছিল না এমন নহে। রাণী হইতে অধস্তন সকল রমণীই দেবমন্দিরে যাইত। উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার পর ছাদে উঠিয়া পথের জনতার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিত। উৎসবের সময় তাহারা শোভাযাত্রায় যোগদান করিত এবং আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ বা অভ্যর্থনা করিতে বাটীর বাহির হইত। এই স্বাধীনতা থাকাতেই তরুণ তরুণীরা পরস্পরকে বাছিয়া লইবার সুযোগ পাইত। কখনো কখনো তাহারা পরস্পরের সহিত পলাইয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া যদি বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহাদের আত্মীয়েরা কোনো আপত্তি করিত না। সেকালে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে আর্থিক লাভের দিকে দৃষ্টি ছিল না, তাহারা ভালবাসা দ্বারা চালিত হইত। যুবক যুবতীদের পরস্পরের মনোনয়ন একটী প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল। এই প্রথা এখনও তামিল দেশ হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীন কবিরা কি বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিজ কথাতেই নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

একটী বালিকা তাহার সখীর প্রশ্নের উত্তরে তাহার প্রেমাস্পদের ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিল—

তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি কি অমুক সুন্দর যুবককে

আমার হৃদয় অর্পণ করিয়াছি?—তিনি সেই যুবক, যিনি আমার নদীতে স্নান করার সময় আমার দিকে চাহিয়া থাকেন, আমার বাটীতে আমার সহিত দেখা করেন; যিনি আমার তুষ্টি বিধানে সদা যত্নবান্, আমার ভ্রষ্ট অলঙ্কার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করেন, আমার স্কন্ধদেশ চন্দন চর্চ্চিত করেন? আচ্ছা, আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শুন। আমি তাঁহার সহিত সমুদ্রকূলে বহুবার ভ্রমণ করিয়াছি, আর তীরস্থ তৃণাদি উৎপাটন করিতে করিতে আমার হস্ত রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিজন্য উৎপাটন করিয়াছিলাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি আমাকে ঐ তৃণ দিয়া একটী ক্রীড়নক নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। আমার সম্বন্ধে যে সকল নিন্দা না রটাইলে আমার প্রতিবেশিনীদের ঘুম হয় না, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি এতই সরলা যে সেই সকল কথায় বিশ্বাস কর? তোমার জিজ্ঞাসু চক্ষুর সম্মুখীন হইতে ভীত হইয়া আমি বাটী হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে সাগরতীরে প্রত্যাবৃত্তা দেখিয়া, তিনি কচ্ছভূমি হইতে পুষ্প আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা এক ছড়া মালা গাঁথিয়া আমার হস্তে দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রীতির এই সামান্য নিদর্শনের জন্য যাহারা মিথ্যা অপবাদ দিয়া তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে তিরস্কার করিবার পরিবর্ত্তে কেন তুমি প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিলে? তিনি একটী ইক্ষুদণ্ডের চিত্র চন্দন দিয়া আমার স্কন্ধদেশে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ চিত্রণ আমার জানা নাই বলিয়া তিনি এই চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সৌজন্যকে উপলক্ষ্য করিয়াই কি আমার ক্রীড়া-সহচরীরা আমার

নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং তুমি সেই সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছ ?

ইহা ভাণের একটী সুন্দর ক্ষুদ্র উদাহরণ।

এখন একটী দুষ্টমতি দুর্ললিত যুবকের উদ্দণ্ড প্রেম প্রদর্শনের চিত্র দেখুন। তাহার সম্বন্ধে একটী বালিকা তাহার সখীকে বলিতেছে—সখী, শুন। তুমি কি সেই দুষ্ট যুবককে জান, যে আমাদের খেলাঘর ভাঙ্গিয়া দেয়, আমাদের কেশের মালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, আমাদের খেলিবার কন্দুক কাড়িয়া লয় এবং আমাদিগকে নানা উপায়ে বিরক্ত করে ? একদিন যখন আমার মাতা ও আমি গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলাম, সে আমাদের বাটীতে আসিয়াই বলিল যে, তাহার অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছে। আমার মা আমাকে বলিলেন, "উহাকে একপাত্র জল দাও।" আমি তাহার দুষ্টতা ভুলিয়া গিয়া তাহার নিকট একপাত্র জল লইয়া গেলাম। হঠাৎ সে আমার বাহু ধরিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "দেখ, মা, এই যুবকটী কি করিল।" চীৎকার শুনিয়া আমার মা, যেখানে আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম, বেগে সেই স্থানে আসিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম (মিথ্যা),—"যুবকটী বিষম খাইয়াছে।" তখন মা তাহার পীঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই চোরের বেটা, যেন আমাকে বিঁধিয়া ফেলিবে এইভাবে আমার দিকে তাকাইয়া আমাকে হাসাইয়া দিল।

পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রেম-দৃশ্য ইহাপেক্ষা অধিক ঘটনা-বৈচিত্র্য-পূর্ণ। "একদিন আমি ও একটী বালিকা, যাহাকে আমি মনে

মনে ভালবাসিতাম, এক বন্যাস্ফীত পার্ব্বত্য নদীতে স্নান করিতে-ছিলাম। হঠাৎ সে পদস্খলিত হইয়া মাঝধারে পড়িয়া গেল এবং বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে-সময়ে সেইস্থানে এক বীর যুবক উপস্থিত ছিল। বিপদ দেখিয়া গলার মালা ইত্যাদি না খুলিয়াই সে স্রোতে ঝাঁপ দিল এবং বালিকাটীকে নিরাপদে তীরে টানিয়া আনিল। তীরস্থ দর্শকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তাহারা যুবতীর উত্থান-পতনশীল বক্ষ বীর-যুবকের বিশাল স্কন্ধে সংলগ্ন হইতে দেখিয়াছে। এই কথা যুবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল এবং শ্রদ্ধাভরে সে তৎক্ষণাৎ বীরযুবককে তাহার আন্তরিক প্রেম উৎসর্গ করিল এবং বলিল "যাহাই ঘটুক না কেন, আমি প্রেমে চিরদিন অটল থাকিব।" যুবকটী এক আরণ্য উপজাতির নায়ক-পুত্র ছিল। আমি বলিলাম "কুরব রমণী কখনো প্রেমে বিশ্বাসঘাতিনী হয় না, এবং 'কুরব' বাণও কখনো ব্যর্থ হয় না। হে পর্ব্বতবাসীরা, তোমরা যদি কখনো অবিশ্বাসের পাত্র হও, বল্লীলতা কখনো কন্দ প্রদান করিবে না, এবং তোমাদের পার্ব্বত্য শস্যক্ষেত্রও শস্যদান করিবে না।" এই কথা বালিকার মাতার কাণে পৌছিল, এবং মাতা এই কথা তাহার পিতা ও পিতৃব্যগণকে জানাইল। তাহারা অন্যত্র সেই বালিকার বিবাহ স্থির করিবে ভাবিয়াছিল। ক্রোধে তাহাদের নেত্র রক্তবর্ণ হইল এবং তাহারা ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া প্রতিহিংসার চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল যে, উভয় পক্ষের কাহারো দোষ নাই, তখন তাহারা ঠাণ্ডা হইল এবং বালিকার ঐ মনোনীত বরের সহিত তাহার বিবাহে সম্মত হইল। তখন আমরা হাত ধরাধরি করিয়া "কুরবাই" নৃত্য

জুড়িয়া দিলাম। কিছুদিন পরে ঐ দলের প্রবীণেরা আমাদের গ্রামে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে একত্রিত হইল।

আর একটী চিত্র দেখুন—

অনেক সময় সুন্দর মাল্যশোভিত এক ধনুর্ব্বাণধারী যুবক যেন শিকার অনুসরণ কবিতে করিতে আমার সম্মুখীন হইত এবং আমাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নেহ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত, কিন্তু কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া যাইত। তাহাকে চিন্তা করিতে করিতে রাত্রিতে প্রায় আমার চক্ষ হইতে নিদ্রা লোপ পাইয়াছিল এবং আমি তাহার বিরহে খিন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। চক্ষু দ্বারা ভিন্ন অন্য কোন্ প্রকারে সে কখনো তাহার ভাব ব্যক্ত করে নাই। আমি নারীস্বভাব-সুলভ সঙ্কোচ বশতঃ আমার ভাল-বাসা ব্যক্ত করিতে পারি নাই। কিন্তু লুকান প্রীতির তীব্র জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি হঠাৎ একদিন একটা লজ্জার কাজ করিয়া ফেলিলাম। একদিন আমি আমাদের খামারের পাশের এক স্থলে একটা দোলায় বসিয়া আছি এমন সময় সে তাহার অভ্যাসমত আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম "আমাকে একটু দোল দিন না।" "মধুময়ী বালা, এই আমি দোল দিতেছি" বলিয়া সে দোল দিতে লাগিল। আমি যেন সুখে সন্তরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি ছল করিয়া পিছলাইয়া গিয়া তাহার কাঁধের উপর পড়িলাম। সে আমাকে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিল এবং আমি মূর্চ্ছিতের মত তাহার স্কন্ধের উপর কিছুক্ষণ থাকিলাম। সে আমাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ছিল। অবশেষে আমি যখন চেতনা পাইয়াছি এইরূপ ভাব দেখাইলাম, সে আমাকে নামাইয়া দিল, এবং স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া

বলিল, "আমি তোমাকে যথার্থ ভালবাসি।" এই সত্য করিয়া সে আমাকে ঘরে পাঠাইয়া দিল।

৩২। তামিল বিবাহ পদ্ধতি (১)

বালকেরা ১৬ বৎসর বয়সে এবং বালিকারা ১২ বৎসর বয়সে বিবাহ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। উচ্চবংশগুলিতে ব্রাহ্মণদের নিয়মানুসারে বিবাহ হইত। যাহারা ব্রাহ্মণদের প্রভাবে পড়ে নাই, যেমন নিম্ন শ্রেণীর নগরবাসী ও পার্ব্বত্য জাতিরা, তাহাদের বিবাহ আরিবর বা তামিল পুরোহিতদের দ্বারা সম্পন্ন হইত।

৩৩। তামিল আহার (১)

তামিলদের আহার অতি সাদাসিধা ধরণের ছিল। ভাতই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল, এবং দুগ্ধ, মাখন ও মধুও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত।

৩৪। তামিল আমোদ প্রমোদ

প্রাচীন তামিল দেশে আমোদ প্রমোদের মধ্যে ছিল কোকিলের লড়াই, নৃত্য, সঙ্গীত, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসবে যোগদান। ঘরে স্ত্রীলোকেরা পাখী পড়াইত, বল্লাই বা অথনাই গান করিত, দোলায় দুলিত এবং পাশা খেলিত।

---

(১) V. Kanaksabhai.

৩৫। তামিল শিল্প ও কলা (১)

প্রাচীন কালে তামিল দেশে যথেষ্ট শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল। সঙ্গীত উচ্চ শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে সঙ্গীতের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল। নৃত্যও উচ্চ কলার মধ্যে পরিগণিত ছিল। 'কুরবাই' নৃত্যে ৮।১০ জন লোক গোল হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইত এবং পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা উভয়েই যোগ দিত।

অভিনেত্রীদের শিক্ষা পাঁচ বৎসর বয়সেই আরম্ভ হইত। নাটকের মধ্যে কতকগুলি দেবতাদের ও রাজাদের প্রশংসাসূচক, কতকগুলি উপহাসাত্মক, কতকগুলি জীবজন্তুর অনুকরণাত্মক এবং কতকগুলি প্রণয়-মূলক।

চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যেও প্রাচীন তামিলেরা অনেক উন্নতি করিয়াছিল। দেবতাদের, মনুষ্যের ও জীবজন্তুদের চিত্র সাধারণ গৃহস্থদের বাটীর দেওয়ালে চিত্রিত হইত। কাষ্ঠের দ্বারা নানারূপ সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈয়ার হইত। মঠে ও মন্দিরে নানাস্থানে চূণ ইত্যাদি মসলা জমাইয়া দেবতাদের মূর্ত্তি গঠিত হইত। এই কার্য্যে ধাতু বা প্রস্তর ব্যবহৃত হইত না। এই কারণে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বের কোনো ভাস্কর্য্য তামিল দেশে বিদ্যমান নাই।

৩৬। তামিল গৃহ (১)

দরিদ্র ব্যক্তিদের গৃহ মাটীর দেওয়ালের উপর চাল দিয়া নির্ম্মিত হইত। নগরের গৃহগুলির দেওয়াল ইষ্টক দ্বারা এবং ছাদ টালি

(১) V. Kanaksabhai.

দ্বারা নির্ম্মিত হইত। দেওয়ালে চূণ বালির আস্তরণ দেওয়া হইত এবং তাহাতে গোলাকার গবাক্ষ থাকিত। সদর দরজা, বাটীতে সংলগ্ন না হইয়া, আবেষ্টনকারী প্রাচীরের একাংশে বৃহৎ ও আড়ম্বর-যুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইত। নগর ও বড় বড় গ্রামগুলি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকিত। মাতুরা, করুর ও কাঞ্চীর দুর্গের প্রাচীরের উপরিস্থ সছিদ্র প্রাকারের ছিদ্রমুখে নানা প্রকারের যন্ত্র রক্ষিত হইত এবং তদ্দ্বারা আক্রমণ-কারীদের উপর প্রস্তর খণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত।

৩৭। তামিল সৈনিক রমণীর বীরহৃদয় (১)

সৈনিকেরা রাজার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। সৈনিক রমণীরা পর্য্যন্ত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিত। এক চারণের গাথায় পাওয়া যায় যে কোনো বীর প্রৌঢ়া বলিতেছে—গত পরশ্ব আমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে একটী হস্তীকে খণ্ডিত করিবার পর শত্রুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধরাশায়ী হন, কাল আমার স্বামী একটী বিপক্ষ-সেনাদল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার পর হত হইয়াছেন। তথাপি আজ প্রাতে রণবাদ্য শুনিবামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমি আমার একমাত্র পুত্রকে শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত করিয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া এবং তাহার হস্তে একটী ভল্ল দিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে যাইতে আদেশ করিলাম।

আর একজন গাথা রচয়িতা বলিতেছে—অপর একটী যোদ্ধ-বংশীয়া বৃদ্ধার কথা শুন। সেই শীর্ণদেহা কম্পান্বিত-হৃদয়া বৃদ্ধা

(১) V. Kanaksabhai.

যখন শুনিল যে, তাহার পুত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক হইয়াছে, তখনই শপথ করিল যে, যদি সত্য সত্যই সে শত্রুগণকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্তনদ্বয় তাহার পুত্র পান করিয়াছে তাহা সে ছেদন করিয়া ফেলিবে। এই বলিয়া সে হস্তে একখানি তরবারি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইল এবং এখানে সেখানে খুঁজিয়া যখন সে এক মৃতদেহের স্তূপে তাহার পুত্রের ক্ষত বিক্ষত শরীর দেখিতে পাইল, তখন উহার জন্ম সময়ে যত আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ প্রকাশ করিল। (১)

৩৮। তামিল যোদ্ধৃগণের ধর্ম্মবিশ্বাস (২)

যোদ্ধগণের এই ধারণা ছিল যে, যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। অতএব তাহারা প্রাণ দিতে পারিত। স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু আসন্ন দেখিলে রাজারা ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহাদের দেহ ঘাসের উপর শায়িত করাইয়া ঘাতককে তাহা ছেদন করিতে আদেশ দিত, এই বিশ্বাসে যে, যোদ্ধার ন্যায় তাহাদের মৃত্যু হইল।

---

(১) রাজস্থানের এক বীরপত্নী বলিয়াছিলেন, "নাইন, আজ ন মাও পগ, কাল সুনা জে জঙ্গ। ধারালাগে সো ধনী, তব দীজে ঘন রঙ্গ।" হে নাপিতানী, শুনিতেছি কাল যুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে আজ আর আলতা পরাইও না। যখন আমার পতিদেব যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন এবং তাঁহার দেহ হইতে লাল শোণিত-ধারা ছুটিবে, তখন তুমিও উল্লাসের সহিত খুব লাল আলতা আমার পায়ে পরাইও।

(২) V. Kanaksabhai.

৩৯। মাদুরার একটী প্রাচীন চিত্র (১)

প্রাচীন তামিল কবিদের কাব্য পাঠ করিলে, মাদুরার একটী জ্বলন্ত ছবি মানস-নেত্রে উদিত হয়—

ঊষার অনেক পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গীতানুশীলন-কারীরা স্ব স্ব যন্ত্রে সুর বাঁধিয়া স্বর সাধন করিতেছে। পিষ্টক প্রস্তুত-কারীরা তাহাদের পণ্যশালা সম্মার্জ্জনে ব্যস্ত হইয়াছে। তাড়ী বিক্রেতারা তাহাদের পানশালার দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছে। বৈতালিকেরা পথে পথে বিচরণ করিয়া মাঙ্গলিক স্তোত্র শুনাইতেছে। দেবালয়ের, মঠের ও রাজপ্রাসাদের শঙ্খধ্বনিতে ও দুন্দুভি-নিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। কিছু পরেই বাল-সূর্য্য-কিরণচ্ছটায় দুর্গশিখর স্বর্ণাভ হইয়া গেল এবং নগরায়তন লোকলোচনে উদ্ঘাটিত হইল। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নদীর অনুরূপ প্রধান প্রধান নগর-সরণীর উভয় পার্শ্বস্থ বহু-বাতায়নযুক্ত দ্বিতল ত্রিতল উচ্চ ভবনগুলিতে ও প্রত্যেক দেবমন্দিরে পতাকা উড়িতেছে। প্রত্যেক শৌণ্ডিকালয়ের উপর ভাসমান তরীর প্রতিকৃতি আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর পণ্যশালার উপর বিশেষ বিশেষ পতাকা উড়িতেছে। প্রত্যেক বিজয়ান্তে রাজ-সৈন্য দলে এত অধিক সংখ্যায় উজ্জ্বল বর্ণের পতাকা-শ্রেণী প্রসারিত হইত যেন নগর কোনো উৎসবের জন্য সজ্জীকৃত হইয়াছে। বিজয়ান্তে অশ্ব, হস্তী এবং শত্রুদুর্গের কারুকার্য্য-মণ্ডিত বিশাল তোরণদ্বার ইত্যাদি লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া রাজ-সৈন্য শোভাযাত্রা করিয়া নগরে প্রবেশ

---

(১) V. Kanaksabhai.

করিত। প্রজ্জ্বলিত শত্রু-গৃহ সমূহ হইতে উত্থিত অগ্নি-শিখার আলোক-সাহায্যে ভল্লদ্বারা তাড়িত মেষের পাল সম্মুখে করিয়া সেনাদল নগরে ফিরিত। সামন্ত রাজারা স্ব স্ব উপঢৌকনের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া পাণ্ড্য রাজাকে তাহা উপহার দিত।

পরবর্ত্তী কালে—পুষ্পবিক্রেতারা ডালায় অগ্রথিত পুষ্প সাজাইয়া, বাহুতে পুষ্পমাল্য ঝুলাইয়া, এবং সুগন্ধ-দ্রব্য-চূর্ণ ও পান-শুপারি-বিক্রেতারা পথে পথে ঐ সকল দ্রব্য ফেরী করিয়া বেড়াইতেছে অথবা কোন সৌধছায়ায় বসিয়া গ্রাহক আহ্বান করিতেছে। ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রৌঢ় রমণীরা সুস্বাদু ফল ও খাবার এবং সুগন্ধি পুষ্প লইয়া দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ক্রেতার অনুসন্ধান করিতেছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্বোঢ় রথে বা ললিত-গতি তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে এক-স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে। পদব্রজে গমনকারীরা, ফেরীওয়ালারা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মত্ত হস্তীর আগমন সংবাদে প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। মাতাল সিপাহিরা পথ দিয়া গমন কালে চীৎকার দ্বারা পথের ও পল্লীর শান্তিভঙ্গ করিতেছে। সন্ধ্যার শীতলতায় অভিজাতগণ রথারূঢ় হইয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহাদের রমণীরা রুনুঝুনু-নিনাদী মল পরিয়া প্রাসাদ-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে এবং শরীরের সুগন্ধে নিকটস্থ বায়ুমণ্ডল সুরভিত করিতেছে।

কল্পনার চক্ষে দেখুন—নগর মধ্যস্থ এক বিস্তীর্ণ চতুষ্কে যে হাট বসিয়াছে, তাহাতে নানা প্রকারের পণ্য বিক্রীত হইতেছে—শকট, রথ, অলঙ্কার, বর্ম্ম, লৌহ-কোমরবন্ধ, চর্ম্ম-পাদুকা, চামর, বর্শা, গদা, ঢাল, হস্তীর অঙ্কুশ; তামা ও পিতলের বাসন; করাত,

কুঁদিবার যন্ত্র, শ্রমশিল্পের নানা উপকরণ; সুরভী পুষ্প ও চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য; মণিকার-পটিতে হীরা, চুনি, পান্না ইত্যাদি এবং বহুমূল্য রত্ন, মুক্তা ও প্রবাল; সোণা-পটীতে স্বর্ণ; বস্ত্র-বীথিতে, নানা প্রকারের, নানা উপাদানের ও নানা আদর্শের (পাট করা সাজান) তুলার, রেশমের ও পশমের বস্ত্র; বস্তা বস্তা ধান, ছোলা, মটর, তিল, ধনে, গোলমরিচ ইত্যাদি। দালালেরা দাঁড়িপাল্লা হাতে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকেরা রাগ বা বিরক্তি বর্জ্জন করিয়া অবিচলিত চিত্তে বিচারকার্য্য করিতেছেন। মন্ত্রীসভার সদস্যেরা নিবিষ্টচিত্তে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। রাজপথে নানা বর্ণের লোক বিচরণ করিতেছে—শঙ্খবণিক, স্বর্ণকার, তাম্রকার, সীবনকার, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, চিত্রকর, মালাকর ইত্যাদি।

হোটেলে ও বিশ্রামাগারে গ্রাহকেরা স্বাদু কাঁটাল, আম, কলা, নারিকেল, কন্দ, মিছ্রী, পিষ্টক ও সুপাচিত মাংস, খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

ইতিমধ্যে সঙ্গীতের ও বাদ্যের মধুর ধ্বনি কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিয়া জনসাধারণকে সান্ধ্য-উপাসনায় আহ্বান করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা বেশভূষা করিয়া স্ব স্ব পুত্রকন্যা ও স্বামীর সহিত বৌদ্ধ-মঠে ধুপ, ধুনা, অগুরু ইত্যাদি লইয়া যাইতেছে। নিগ্রন্থরা তাহাদের সম্প্রদায়ের আচার্য্যের মঠে একত্রিত হইতেছে। অন্যেরা ব্রাহ্মণদের দেব-মন্দিরে আসিয়া দেবোদ্দেশে, ফল, মূল, পিষ্টক নিবেদন করিতেছে।

রাজপ্রাসাদের নানাভাগ নানারূপে ব্যবহৃত হইত। সিংহ-অপূ দ্বারের ঐশ্বর্য্যর্ব্ব। প্রাসাদের একদিকে এক প্রশস্ত বালুকা-

স্তীর্ণ প্রাঙ্গণে, চমরী, রাজহংস ইত্যাদি বিচরণ করিতেছে। আর এক অংশে অশ্বশালায় নানাজাতীয় অশ্ব রাজ-ব্যবহারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। রাণীর কক্ষ সমূহ নানা সাজে সজ্জিত। কক্ষ-ভিত্তিগুলি মার্জ্জিত কাঁচা পিতলের কান্তিবিশিষ্ট এবং লতাপাতার চিত্রে শোভিত।

দরবারগৃহে রূপবান, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পাণ্ড্যরাজা উপবিষ্ট; তাঁহার কটিদেশ পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ, তদুপরি মণিময় কোমরবন্ধ, উপর বাহুতে কারুকার্য্যময় সোণার তাগা; তাঁহার চন্দন লিপ্ত বক্ষোদেশে মণিময় কণ্ঠহার। বলবান্ রক্ষিদ্বারা তাঁহার শরীর সুরক্ষিত। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অভিনেতৃগণ, গায়কগণ, বৈনবিকগণ স্ব স্ব চাতুর্য্য দেখাইতে ব্যস্ত।

৪০। তামিল সাহিত্যের বিবরণ (১)

প্রাচীন কালের অনেক কাব্যগ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ আকারে বিদ্যমান আছে। তাহাদের নাম, রচনাকাল, ও পংক্তিসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রথম খানির বিশেষ বিবরণ ভূমিকাতে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়খানিও কুরলের ন্যায় অতি প্রসিদ্ধ। তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। তামিল দেশের সামাজিক ইতিহাস এই দুইখানি গ্রন্থে সবিস্তারে ও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এই হিসাবে কুরল অপেক্ষাও ইহাদের মহত্ত্ব অধিক। অপরাপর কাব্যের বিবরণ দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

(১) V. Kanaksabhai.

গ্রন্থের নাম	পংক্তিসংখ্যা	গ্রন্থকার	রচনা কাল
কুরল বা মপ্পাল	২৬৬০	তিরুবল্লুবর	১০০—১৩০
মণিমেগলই	৪৮৫৭	চিত্তলৈচ্-চাত্তনর	১১০—১৪০
চিলপ্পদিকরম্	৪৯৪৭	ইলঙ্কোআদিকশ	১১০—১৪০
কলিত-তোকই	৪৩০৪	নল্লন্থু বনর	
ইন্নই-নারপতু	১৬০	পুথন-চেন্থনর	১১০—১৩০
পেরুঙ্ক-কুরিঞ্চি	২৬১	কবিলর	৯০—১৩০
কুরিঞ্চি-পদ্দই	৪০০		
তিনু-মুর্কর্প-পদ্দই	৩১৭	নক্কিবর	১০০—১৩০
নেদু-নল্-বদই	১৮৮		
পোকনর্-অর্প-পদ্দই	২৪৮	মুদুত-তামক কন্নিয়র	৬০—৯০
পেরুম্-পান-অকপ্-পদ্দই	৫০০	উরুত-তিয়ঙ্ক কন্ননর	৪০—৭০
পদ্দিনপ্-পালই	৩০১		
মাদুরৈক-কাঞ্চি	৭৮২	মঙ্কদি-মক-তানর	৯০—১৩০
মলই-পদু-কদাম্	৫৮৩	পেরুঙ্ক-কৌশিক-নর	১০০—১৩০
পতিরুপ্-পতু	৬০০		১১০—১৪০
পুর-নানূরু-অকন্-নানূরু কুরুন্তোকই ও নর্রিনই গ্রন্থে প্রাপ্ত ৩০০ শ্লোক	৪০০০		১০০—১৪০

চিলপ্পদিকরম্—যেখানে কাবেরী নদী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে পুগার নামক একটী মহাসমৃদ্ধ বন্দর ছিল। ঐ নগরে এক ধনী ও বদান্য বণিকের পরমাসুন্দরী ও অশেষগুণ-

সম্পন্না কন্নকী নামে একটী কন্যা ছিল। সেই নগরের আর এক ধনী বণিকের কোবিলন নামে কার্ত্তিকের ন্যায় রূপবান ও নানাগুণে গুণান্বিত এক পুত্র ছিল। কোবিলনের সহিত কন্নকীর বিবাহ হইলে কোবিলনের পিতা এক প্রশস্ত উদ্যান মধ্যস্থ দাসদাসী পরিবৃত সুসজ্জিত অট্টালিকাতে তাহাদের বাসভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গৃহে উভয়ে অতি আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। দম্পতি পরস্পরের প্রেমে সর্ব্বদা বিহ্বল থাকিত। এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর রাজসভায় মাধবী নামক এক নর্ত্তকীর গান শুনিয়া ও রূপলাবণ্য দেখিয়া কোবিলন মোহিত হইয়া গেল এবং তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইল। কোবিলন আর গৃহে যায় না ও স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করে না, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য হারাইয়া বসিল। তাহার সাধ্বী স্ত্রী তাহার সমস্ত অলঙ্কার একে একে খুলিয়া দিল। অবশিষ্ট থাকিল তাহার পায়ের দুগাছি সোণার মল। একদিন মাধবীর একটী গান শুনিয়া কোবিলনের মনে সন্দেহ হইল যে, সে আর তাহাকে ভালবাসে না। সে মাধবীর গৃহে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিল। ইহার পূর্ব্বেই মাধবীর গর্ভে কোবিলনের একটী কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম মণিমেখলই। একদিন কোবিলন কন্নকীর নিকট তাহার গত দুষ্কর্ম্মের জন্য পরিতাপ করিল এবং বলিল যে, সে বিশ্বাসঘাতিনী বেশ্যার কুহকে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন তাহার এমন কিছু নাই যাহা দ্বারা তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কন্নকী বলিল, "কেন, এখনও আমার মণিময় সোণার মল আছে; তুমি তাহা লও।" কোবিলন বলিল—"আমি মাদুরা নগরে গিয়া তোমার সোণার মল বেচিয়া

যাহা পাইব তাহাকে মূলধন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিব এবং নষ্ট সম্পদের পুনরুদ্ধার করিব। তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে।”

কন্নকী অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং পরদিন প্রত্যূষে কাহাকেও না বলিয়া তাহারা পদব্রজে মাদুরাভিমুখে যাত্রা করিল। কোমলাঙ্গী কন্নকীর পক্ষে এই পথশ্রম অতি কষ্টকর হইয়াছিল। যাহা হউক কোনোক্রমে তাহারা মাদুরায় উপস্থিত হইল এবং গোপপল্লীতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট কবিল। একদিন কন্নকীর পায়ের একগাছি মল লইয়া বাজারে বেচিতে গিয়া কোবিলন চোর বলিয়া ধরা পড়িল, কাবণ ইহাব কয়েকদিন পূর্ব্বে রাণীর ঠিক ঐরূপ একগাছি মল চুরি গিয়াছিল। কোবিলনের বিরুদ্ধে চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাহার শিরশ্ছেদ হইল। কন্নকী এই সংবাদ শুনিয়া ক্ষিপ্তার ন্যায় বাহির হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার অপর মল গাছটী দেখাইয়া বিচার প্রার্থনা করিল। রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভুল হইয়াছে এবং অনেক পরিতাপ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কন্নকীর শাপে রাজপুরী অগ্নিসাৎ হইল। কন্নকী শোকে এতই অধীর হইয়াছিল যে, চৌদ্দদিন পরে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুর পর তামিল দেশে সে দেবীর ন্যায় সম্মান পাইয়াছিল এবং তাহার মূর্ত্তি গঠিত হইয়া মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মণিমেখলই।—ইহা পাঁচখানি তামিল মহাকাব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে লিখিত হইয়াছিল। রচনা-নৈপুণ্যে ইহার স্থান অতি উচ্চ এবং ইহার অনেক স্থল অতি সরস। ইহার ভাষা সরস এবং সুললিত। প্রকৃতি-বর্ণনায় কবি অতিশয় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। চিলপ্পদিকরমে যে নর্ত্তকী-কন্যা মণিমেখলইর উল্লেখ হইয়াছে, সেই এই কাব্যের নায়িকা। তাহার চরিত্র অতি নিপুণভাবে বর্ণিত

হইয়াছে। নর্ত্তকী-কন্যা হইয়াও এবং রূপলাবণ্য ও যৌবনের অধিকারিণী হইয়াও সে বৌদ্ধভিক্ষুণী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। সে-দেশের রূপযৌবনসম্পন্ন রাজপুত্র তাহার প্রণয়প্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু সে তাহার ব্রতে অটল ছিল। সে রাজপুত্রকে অবজ্ঞা না দেখাইয়া প্রকৃত রমণীর ন্যায় তাঁহার অন্তরের বেদনা অনুভব করিত এবং তাঁহাকে মাংস চর্ম্মের বিকার হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে এবং পবিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিত। এই কাব্যের শেষের চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রধান প্রধান্ দর্শনশাস্ত্রের বিবরণ দিয়া তাঁহার অসীম কুশাগ্রীয় বুদ্ধির ও জটিলতায় প্রবেশের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থ সমাপনান্তে তিনি কেরল রাজা চেঙ্কখুদ্দিরণ ও তাঁহার বিদ্বান্ ভ্রাতা ইলঙ্কো-আদিকলনের অতিথি হইয়াছিলেন। রাজভ্রাতা আদিকলন যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করিয়া নিগ্রন্থ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিতেন। বহু বৎসর পরে যখন মণিমেখলই-প্রণেতা চীত্তলৈচ্ চাত্তনর কেরল রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার কাব্যের আবৃত্তি করিয়াছিলেন তখন এই রাজসন্ন্যাসী মণিমেখলইর মাতাপিতার জীবন অবলম্বন করিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি চিলপ্পদিকরম্ গ্রন্থ রচনা করেন, যাহার বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

সমাপ্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম,এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন মহাশয়ের পরিচয় :—

নিবাস শান্তিপুর (নদীয়া)। পিতার নাম ৺হরিমোহন সান্যাল।

জন্ম ৩রা কার্ত্তিক, ১২৬৮ (ইং ১৯এ অক্টোবর, ১৮৬১)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে উত্তীর্ণ হওয়ার কাল—

এণ্ট্রান্স, আগরা কলেজ হইতে, নবেম্বর, ১৮৭৭।

এফ্. এ., পাটনা কলেজ হইতে, নবেম্বর, ১৮৮০।

বি. এ., কলিকাতা মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে, জানুয়ারী, ১৮৮৪।

এম. এ., (প্রথমবার) উপরিউক্ত ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে, ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫।

বিষয়, বটানী—দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয়।

(দ্বিতীয়বার) নন্‌কলেজিয়েট, সেপ্টেম্বর, ১৯২১, বিষয় হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য—প্রথম শ্রেণী (গোল্ড মেডালিষ্ট)

গবর্ণমেণ্ট হাই, জিলা, কলিজিয়েট ও ট্রেনিং স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ১৮ বৎসর। স্কুল সমূহের ডেপুটী, এসিষ্টাণ্ট, এডিশনাল ও ডিভিসনাল ইন্‌স্‌পেক্টর—১৪ বৎসর। গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ নভেম্বর, ১৯১৮।

তৎপরে কলিকাতা শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর হেড্‌মাষ্টার এবং ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ৭ বৎসর। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট লেক্‌চারার—হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের।

তিন পুত্র (১) মনসিজ সান্যাল এম.এ। (২) বিনায়ক সান্যাল এম.এ (৩) গঙ্গেশ সান্যাল।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল-লিখিত পুস্তকাবলী—

বাঙ্গলা

১। ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

২। সৃষ্টিরহস্য

৩। বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা

৪। আলোচনা ও কল্পনা

৫। ভক্তপ্রবর মহাকবি সূরদাস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

৬। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়— জীবনী, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও বিশ্বমানবতা

৭। যোগ—প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ

৮। সুভদ্রাঙ্গী—ঐতিহাসিক উপন্যাস। ডি,এম, লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। কুরল—তিরুবল্লুবরের নীতি বিষয়ক সরস প্রাচীন তামিল কাব্যের বঙ্গানুবাদ—গবেষণাপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১০। বিবিধ প্রসঙ্গ (যন্ত্রস্থ)

ইংরাজী

1. MIRA BAI—Her Life with a Discourse on her *Bhajans.*

হিন্দী

(মুদ্রিত)

১। তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান কী উপক্রমণিকা

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

প্রকাশক—লালা রামনারায়ণ লাল (প্রয়াগ)

এই পুস্তক কলিকাতা, পাটনা, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা হিন্দীতে এম.এ. পরীক্ষার্থীগণের জন্য পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য—বাঁধাই ৩৷৹

২। সমালোচনা-তত্ত্ব, কাব্য-রহস্য, কলা-তত্ত্ব ও রহস্যবাদ-তত্ত্ব।

প্রকাশক—লালা রামনারায়ণ লাল (প্রয়াগ)

মূল্য—বাঁধাই ১৷৷৹।

৩। মোহন মালা (ছোটী গল্পেঁ)

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ (প্রয়াগ)

মূল্য—৷৵৹

(মুদ্রিত হইতেছে)

১। ভক্ত শিরোমণি মহাকবি সূরদাস—

জীবনী, কাব্যালোচনা ঔর চুনে হুয়ে পদ।

প্রকাশক—লালা রামনারায়ণ লাল (প্রয়াগ)

(ক্রমশঃ ছাপা হইবে)—

১। দার্শনিক লেখমালা।

(১) সত্য-প্রতিষ্ঠা, (২) ঈশ্বরকে অস্তিত্ব বিষয়ক সহজ জ্ঞান, (৩) মনুষ্য কা চরম লক্ষ্য, (৪) যোগ—প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ ঔর প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ, (৫) বৌদ্ধ ধর্ম্মকা স্বরূপ ঔর পরিণাম।

২। কঈ দর্শনোঁ কী উৎপত্তি বিষয়ক লেখমালা—

(১) রামানুজ, (২) মাধ্ব-সম্প্রদায়, (৩) নবদ্বীপ, (৪) নদীয়া-গৌরব।

৩। বৈদিক ঔর পৌরাণিক লেখমালা—

(১) "গঙ্গা"কে বেদাঙ্ক পর দো বাঁতেঁ, (২) বৈদিক সাহিত্য কী উৎপত্তি, (৪) "কল্যাণ"কা শিবাঙ্ক।

৪। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কী উৎপত্তি ঔর বিকাশ।

৫। উপদেশ মূলক লেখমালা—

(১) রমা কা গৌনা, (২) চরিত্র, (৩) আশাবাদ।

৬। বিহারী ভাষাওঁ কী উৎপত্তি ঔর বিকাস।

৭। ভাষা-তত্ত্ব-বিষয়ক লেখমালা—

(১) প্রাকৃত-ভাষা, (২) সংস্কৃত-ভাষা।

(৩) হিন্দী ভাষা পর ফারসী ঔর আরবী শব্দোঁ কা প্রভাব।

৮। বিদ্যাপতি-বিষয়ক লেখমালা—

(১) কীর্ত্তিলতা, (২) বিদ্যাপতি, ('মাধুরী'),

(৩) বিদ্যাপতি ("লেখমালা", মুজঃফরপুর)

৯। ধর্ম্ম বিষয়ক সরস লেখমালা।

[১] লুকাছিপী, [২] আবাহন।

১০। বৈজ্ঞানিক লেখমালা—

[১] জীবোঁ কা বিবর্ত্তন, [২] জীব কী নিত্যতা,

[৩] নৃ-বিজ্ঞান। [৪] জড় বিজ্ঞান কা নবীন রূপ।

১১। বিবিধ বিষয়ক লেখমালা—

[১] কুরল, [২] রবীন্দ্রনাথকে কাব্যোঁ মেঁ অতীন্দ্রিয়তা

[৩] সমস্যা-মূলক সরস সাহিত্য, [৪] শক্তি পরিচয়।

১২। [১] কাশী নাগরী-প্রচারিণী সভাকে কেশোৎসব-সংগ্রহ মেঁ "রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর"।

[২] দ্বিবেদী-অভিনন্দন-গ্রন্থ মেঁ "সূরদাস কা কাব্য ওর সিদ্ধান্ত"।



সুভদ্রাঙ্গী

—ঐতিহাসিক উপন্যাস—

ডি,এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা।

"সুভদ্রাঙ্গী" সম্বন্ধে সাহিত্য-মহারথিগণের মত—

১। কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি.এ. লিখিয়াছেন—

নানা কারণে উপন্যাসখানি খুব ভাল লাগিল। একটি কারণ—ইহার ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনী। মৌর্য্যযুগের প্রাচীন ভারতের পরিবেষ্টনীর অবিকল চিত্র এই পুস্তকের পাত্র পাত্রীগণকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঐতিহাসিক জ্ঞান কিরূপে রসে পরিণত হইতে পারে তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই উপন্যাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের আখ্যানবস্তু প্রাচীন,—ভাষা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী। প্রাচীন ও নবীনের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে এই উপন্যাসে।

সুভদ্রাঙ্গীর উপাখ্যান খুব দীর্ঘ নয়—ইহাকে উপন্যাসে পরিণত করিতে আপনার বহু উপাদান ও উপকরণ যোগান দিতে হইয়াছে। ঐ উপাদান ও উপকরণগুলির যথাযোগ্য সংযোগ, ও প্রাচীন যুগের বহু নব নব চরিত্রের সৃষ্টি ও সমাবেশে উপন্যাসখানি উপাদেয় হইয়া

উঠিয়াছে। আখ্যানবস্তুর স্থান ও কালগত দূরত্ব আপনার রচনাকে যে Romantic সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে, তাহা বিদগ্ধজনের উপভোগ্য। * * *

এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী। আপনার এই প্রয়াস রাখালদার প্রয়াসের মতই সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

২। রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট্ লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের 'সুভদ্রাঙ্গী' নামক গল্পটি পড়িলাম। ইহা ছোটখাট একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। অশোক রাজার মাতা সুভদ্রাঙ্গীর নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রের নিকট সুপরিচিত। মৌর্য্যবংশে শূদ্র-সংস্পর্শ দোষ আছে, তাহা ছাড়া পৌরাণিকেরা ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াও স্বীকার করেন না, তাঁহারা ইঁহাদিগকে একেবারে শূদ্রের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন।

কিন্তু এই সামাজিক হীনতাপ্রাপ্ত রাজা বিন্দুসার কিভাবে যে হিন্দুমতে এক সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এই গল্পে সে সমস্যাটীর এমন সরল ও সুন্দর সমাধান করা হইয়াছে—যাহাতে পাঠক লেখকের কৃতিত্ব ও বিরুদ্ধ-অবস্থা-সমন্বয়ের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। লেখার ভঙ্গীটি হৃদয়গ্রাহী—আমার মত প্রাচীনদের ভাল লাগিবেই, কারণ যদিও এই গল্পে গভীর ও সহজ-মধুর প্রেমবর্ণনা আছে তথাপি ইহাতে একালের প্রচ্ছন্ন লালসার লুকোচুরী খেলা নাই—সমাজ-দ্রোহী লজ্জাশূন্যতার কুৎসিত ইঙ্গিত নাই। এই গল্প একান্ত নিরাপদ—ছেলে, তরুণ ও বৃদ্ধ

একসঙ্গে পড়িয়া উপভোগ করিবেন। যদিও ইহাতে দারিদ্র্য-কষ্ট, বন্দিনী-জীবনের দুঃসহ ব্যথা, আত্মহত্যার সঙ্কল্প ও হত্যার ষড়যন্ত্র আছে, তথাপি ইহার মূল সুরটি হইতেছে আনন্দের। নির্ঝর যেরূপ কঠোর উপল খণ্ড লাফাইয়া লাফাইয়া উত্তীর্ণ হয়, এই আখ্যায়িকার প্রধান নায়িকা সেইরূপ নানা অবস্থার প্রতিকূলতা স্বীয় অন্তঃকরণের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের বেগে অতিক্রম করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। যে সকল সামাজিক চিত্র ও স্বভাব বর্ণনা গল্পটি পরিশোভিত করিতেছে, তাহা বিদেশের কথা হইলেও তাহাতে বাঙ্গলার ছায়াই বেশী পড়িয়াছে। আমি এই পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি।

* * * *

বহিখানি আমার ভাল লাগিয়াছে, কারণ আপনার লেখায় সাবেকী সরলতার ছন্দটি আছে—রচনা-চাতুর্য্যের কারতপ দেখাইবার জন্য আপনি লেখা জটিল করেন নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনা, সামাজিক চিত্র—এ সকল অল্প কথার মধ্যে বেশ ফুটিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে কবিতা-মণ্ডিত হইয়াছে।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম.এ. লিখিয়াছেন—

সুভদ্রাঙ্গীর আখ্যানভাগ সুন্দর, এবং সুন্দর ভাষায় আপনি তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস আজকাল বড় দেখা যায় না। আমার বোধ হয় আপনার গ্রন্থখানি সে অভাব পূরণ করিবে, এবং পাঠকের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইবে।

"বিচিত্রা" সম্পাদক

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি. এল. লিখিয়াছেন—

সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বের এই আখ্যায়িকাটি সেই বহু পুরাতন দিবসের একটা চিত্র জাগিয়ে তুলে পাঠকদিগকে একটি মুখরোচক নূতন আস্বাদ দেবে বলে ভরসা করি।



কুরল

বা

তামিল বেদ

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কবি
তিরুবল্লুবরের সরস নীতিমূলক কাব্যের বঙ্গানুবাদ—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্,
১৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি.লিট্. লিখিয়াছেন—

দুই হাজার বৎসর যাবৎ এই গ্রন্থখানি তামিল ভাষা-ভাষী জাতির নিকট বেদের সম্মান পাইয়া আসিয়াছে। ইহাতে ভগবৎভক্তির কথা আছে, কিন্তু স্তবস্তুতি এবং বাহিরের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটী কথাও নাই। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, চরিত্রনীতি, দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ব্বাবস্থা ও পরিণতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে কুরলের রচয়িতা বল্লুবর উপদেশ ও বিবৃতি দিয়াছেন। বইখানি একটি কবিত্ব ও জ্ঞানের খনি। এই পুস্তক ইংরাজী, জার্ম্মান, ফরাসী, লাটিন, হিন্দী ও তেলেগু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার শ্রমসাধ্য কাজ প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয় করিয়া আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এইভাবে বৌদ্ধ জাতকগুলিও কিছু দিন

পূর্ব্বে অপর একজন পরিণত বয়স্ক প্রবীন বিরাট সাহিত্যিক অনুবাদ করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন। এই সকল প্রচেষ্টা কি বিগত যুগের পাণ্ডিত্যের বিদায় ধ্বনি? আমাদের সবুজেরা কি শুধুই হাত পা গুটাইয়া গল্প রচনা ও পঠনে ব্যাপৃত থাকিবেন?

শ্রীযুক্ত এ, সত্তনাথন এম.এ. লিখিয়াছেন—

What the Bible is to the Christian world, the Kural has been and is to the Tamils. It is a unique literary work in as much as the whole realm of knowledge of the ancients was traversed by the 3330 aphorisms—the greatest masterpiece of literary brevity.

My friend Srijukta Nalinimohan Sanyal has undertaken this work of translating the Kural as a labour of love. Tho Bengali language rich as it is for the great works of its modern authors, will be the richer for this beautiful translation of a great classic. Mr Sanyal has taken great pains to understand the meaning of the author, and appears to have given more attention to the ideas than to literary form. This is as it should be. In many chapters he has

succeeded in producing epigrams as full of meaning as in the original. Where the ideas are too elaborate, he has contented himself in expressing them in clear crisp Bengali. Throughout he has been true to the literary ideal of the Tamil classic, brevity in expression.

I trust Mr. Sanyal's very laudable enterprise will meet with the reception it really deserves from the great literary public of Bengal. Mr. Sanyal has performed his task ably.